দুনিয়াদারী

দুনিয়াদারী

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

দুনিয়াদারী

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল

মূল্য—১৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভুমিকা

আজব জায়গা এই দুনিয়া। আজব চীজ দুনিয়াদারী। শুধু, চোখে দেখে যাও, ধরা দিও না।

গ্রন্থকার

দুনিয়াদারী

চিড়িয়াখানা

জগতের সেরা দেশ এই আর্য্যভূমি। আর এই আর্য্যভূমির মাথার মুকুট আমাদের সোনার বাঙ্গলা। বাঙ্গলার আবার সেরা শহর কলকাতা। সেই কলকাতার সেরা রাস্তা, যাকে ফরাসীরা বলে creme de la cremé, চৌরঙ্গী। এককালে এই চৌরঙ্গী ছিল তীর্থযাত্রীর মার্গ। লোকে চিত্তেশ্বরী দর্শন করে কালীঘাটে পূজা দিতে যেত এই পথ ধরে। পথ বিপদসঙ্কুল, কেন না দুধারের জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, তথা মানুষ-বাঘের উপদ্রব ভয়ানক ছিল। লোকে বলে, গৃহস্থ এই দুই মন্দির দর্শন করে নিরাপদে বাড়ী ফিরলে পাঁচ আনার হরির লুট তুলসীতলায় দেওয়া হত।

এই ত গেল সেকালের কথা। কিন্তু বিশেষ কিছু তফাৎ

হয়েছে কি? চৌরঙ্গী আজও ত তীর্থ-যাত্রীর পথ! তবে যাত্রীরা এখন আর কালীঘাট পর্য্যন্ত ধাওয়া করে না। অর্দ্ধ পথেই দেবদেবী দর্শন সেরে নেয়। মন্দিরও অসংখ্য। আর নানা প্রকারের মন্দির। কোন কোন মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ নিষেধ। তারা চৌরঙ্গীর একপ্রান্তে নিজেদের মন্দির তুলেছে। কোথাও কোথাও বা গান্ধীজীর প্রভাবে হরিজনরা মন্দির-প্রবেশের অধিকার লাভ করেছে। তবে সে সব জায়গায় প্রণামী অসম্ভব রকম বেশী, তাই দু দশজন পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া কেউ পূজা দিতে যেতে পারে না। সাধারণ হরিজনের দৌড় ফুটপাথ পর্য্যন্ত। তবে চৌরঙ্গী আজও বিপদসঙ্কুল, যদি চ চতুষ্পদ বাঘ ভালুক সব আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আটকে রাখা হয়েছে। দ্বিপদ ব্যাঘ্র কিন্তু চারিদিকে টহল দিচ্ছে। তাদের মাঝখান দিয়ে যেতে ভীরুজনের হৃদ্‌কম্প হয়। ঠিকে ভুল হয়ে যায়। কে রক্ষক, কে ভক্ষক, ঠিক থাকে না।

একদিন সেই চৌরঙ্গী বেয়ে দুই যুবক যাত্রী চলেছেন। দুজনেই যবন বেশী। যাবনিক ভাষায় কথা কইতে কইতে যাচ্ছেন। কৃষ্ণকায় পথিক্ তাঁদের সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। তাঁরাও ততোঽধিক সম্ভ্রম করে শ্বেতকায় যাত্রীদের রাস্তা ছাড়ছেন। জগতের এই ত গতিক! ইঁদুর বেড়ালকে দেখলে কাঁপে, বেড়াল কুকুরকে দেখলে পালায়, কুকুর বাঘের গন্ধ পেলে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ে। সে কথা যাক্। বন্ধু দুটী দেখতে একেবারে বিপরীত রকমের। একজন খর্ব্বকায়, লম্বোদর, শ্যামবর্ণ।

অন্যজন দীর্ঘকায়, হয়-গ্রীব, গৌরবর্ণ। প্রথম ভদ্রলোকের নাম ও পরিচয়, Otter Ray Esq., I. C. S., দ্বিতীয়ের Badger Bose Esq., Bar-at-law। বাঙ্গলা করে বলি। প্রথম জনের পৈতৃক নাম অটলকুমার রায়, পেশা সিবিলিয়ানী। দ্বিতীয় জনের নাম ব্রজকিশোর বসু, পেশা কৌঁসুলী। এঁরা দুজনেই বিলেতের এক প্রাচীন বিদ্যাপীঠে পড়েছিলেন, আর সেই খানেই প্রাণীতত্ত্ব-ঘটিত এই নাম দুটী সঞ্চয় করেছিলেন। নয় ত সত্যি কিছু ব্যারিষ্টার সাহেব লোককে বেজার করে বেড়াতেন না, আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভোঁদড়ের মত লোকের পুকুরে পুকুরে মাছ খেয়ে বেড়াতেন না। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই ভাবে। বিলেত রওয়ানা হওয়ার সময় ব্রজকিশোর অটলকুমারকে বললেন, "ভাই অটা, সে দেশের লোক আমাদের এত বড বড় নাম উচ্চারণ করবে কি করে! নানা রকম ঠাট্টা তামাশা করবে। মুখ দেখান দুষ্কর হবে। নামের খানিকটা খানিকটা ছেঁটে ফেলে দিলেই ত দিব্যি শোনাবে!"

"তা ঠিক বলেছিস, বেজা। মনে কর, কোন নীলনয়না সুন্দরী তোকে চিঠি লিখছেন। আরম্ভ করলেন, মাই ডিয়ার ব্রজকিশোর। কি ভয়ানক! কিন্তু তোর কিশোর আর আমার কুমারটা কেটে নিলেই থাকবে ব্রজ আর অটল। ঐটে একটু কারচুপী করে বানান করতে পারলেই ত কেল্লা ফতে!" তাই করা হল। কেটে-ছেঁটে যা দাঁড়াল তা এই, Otol Ray, Brojo Bose। কার্ড সেই মত ছাপালে।

বিলেতে দুজনে একই কলেজে ঢুকল। পুরানো কলেজ, অনেক ছাত্রই বড় ঘরের ছেলে, সেখানে আদব-কায়দার খুব কদর। অথচ এ বেচারারা দেশে অজ-নেটিব ভাবে মানুষ হয়েছে। দুজনে খুব মন দিয়ে লেগে গেল ইংরেজী আদব-কায়দা রপ্ত করতে। দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রকম ব্যাপারে যোগ দিতে ছুটল। আনকোরা ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলের এই আগ্রহ সকলে ভাল চোখে দেখলে না। অনেকে বললে, ছেলে দুটো ভয়ানক ডেঁপো। বিদ্যাপীঠের একটা প্রাচীন প্রথা ছিল যে যাকে অন্য ছেলেরা দেখতে পারত না তাকে ভয়ানক rag করত, অশেষ রকমের যন্ত্রণা দিত। আমাদের অটল ও ব্রজের এত মোটা চামড়া, যে তারা মৃদু মন্দ ragging গায়েও মাখত না। হয়ত বা বুঝতেও পারত না! শেষ হল কি, Boat-race-এর রাত্রে Empire নাচঘরের বাইরে জনা কুড়িক under-grad (ছাত্র) ঈষৎ মত্ত অবস্থায় এই দুই বন্ধুকে ঘিরে নৃত্য করতে আরম্ভ করলে। নাচতে নাচতে একবার চাঁটি মারে অটলকে, একবার মারে ব্রজকে। যখন নাচ বেশ জমে এল, তখন একজন গান ধরলে;—

"Oh! You rotter Otter!"

আর একজন জবাব দিলে,

"Oh! You blooming Badger!"

সকলে মিলে কোরাস্ গাইলে,

"Otter and Badger,
Rotter and cadger,
Give them all they want."

গেয়ে দুজনের মাথায় দু বোতল বিয়ার ঢেলে দিলে। নামাকরণ হয়ে গেল। কাছে দুজন পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। তারা মিনিট পনের এই রকম গান, নাচ, তবলায় চাঁটি, চলতে দিলে। তার পর গম্ভীর স্বরে হাঁকলে, "That will do, gentle-men. Move on, please." (ঢের হয়েছে, এইবার মহাশয়েরা সরে পড়ুন।)

বন্ধুদ্বয়ের মাথার খুলি দুটো বেঁচে গেল। দুজনে কাছের সরকারী বাগানে গিয়ে বসল ঠাণ্ডা হতে। একটু চুপ করে থেকে ব্রজ বললে, "অটলা, খুব lucky (নসীবদার) আমরা। এই ত কলেজে কটা মাস হল এসেছি! এরই মধ্যে আমরা এমনই popular (লোকপ্রিয়) হয়ে উঠেছি যে আমাদের নামে গান বাঁধা হয়ে গেল।"

অটল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, বললে, "আমার এখনও টন্ টন্ করছে মাথা। ড্যাম ইওর চমৎকার নসীব! তোর কি বেজা, কেবল নিজের ধান্দাই বুঝিস।"

"ভাই, পেটে খেলে পিঠে সয়। কেমন দুটো clever ইংরেজী নাম লাভ হয়ে গেল। তোর মাথায় ঢুকত কি ও বুদ্ধি?"

"ভারী নাম! শেষকালে জানোয়ারের নাম ধরে লোকে ডাকবে!"

"আরে, হলেই বা, তাতে কি এসে যায়। ইংরেজী নাম ত!"

ব্রজর কথাই রইল। সহপাঠীদের দেওয়া নাম দুজনে মাথায় তুলে নিলে। নূতন কার্ড ছাপান হল, অটার রে, বেজার বোস। এর পর বছর খানেক ভালয় মন্দয় কেটে গেল। কিন্তু যখন বন্ধুদ্বয় থার্ড ইয়ারের ছাত্র হল, তখন তারা ভার্সিটির জীবনটা পুরো দমে উপভোগ করতে লাগল। এমন কি, নাচ গানেও দুজনে মুরুব্বী হয়ে উঠল। তবে অটার বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা, ট্যাঙ্গো ওয়াল্‌সে সুবিধা করতে পারত না। সত্যিকার অটারের (ভোঁদড়ের) মতই দেখাত। মনে হত যেন জলে সাঁতরাচ্ছে। বেজারের গড়ন সব সময়েই জিরেফের মত। সে যখন নাচত, মনে হত যেন নৃত্য-সঙ্গিনীকে গলায় ঝুলিয়ে লাফাচ্ছে। মোটের উপর দুজনকারই পছন্দ ছিল Fox-trot। অত লোকের তাণ্ডবের মাঝে একরকম চালিয়ে নিত। একটা জিনিস থেকে এরা সর্ব্বদা দূরে থাকত। সেটা হচ্ছে খেলা-ধূলো, কুস্তি-কসরৎ। শরীর-চর্চ্চাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, আর কথায় বার্ত্তায় সকলকে জানিয়ে দিত যে তাদের জীবনের লক্ষ্য মানসিক উৎকর্ষ সাধন, শারীরিক নয়। বাক্‌সর্ব্বস্ব জাতের ছেলে, ইউনিয়নে খুব জমিয়ে তুলেছিল। থার্ড ইয়ারে ত এক রকম পাণ্ডাই হল। স্ত্রীজাতি, বিবাহ, প্রেম সম্বন্ধে এদের মতামত ছিল খুব আধুনিক, এত আধুনিক যে ইংরেজ ছেলেরা অবধি লজ্জা পেত। বিবাহ হলেও চলে, না

হলেও চলে, মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, প্রেম মনের ক্রিয়া নয় glands-এর অবস্থা বিশেষ, এই সব মত খুব সজোরে উচ্চৈঃস্বরে দুই বন্ধুতে জাহির করত। এ ত অন্য লোকের সামনে। কিন্তু দুজনে নিরিবিলি বসে দেশের জন্য অনেক দুঃখ করত। দেশে ত ফিরে যেতেই হবে! চিরদিন আর তাদের পয়সা দিয়ে বিলেতে উড়ে বেড়াতে কে দেবে! কিন্তু দেশে তারা বাঁচবে কি করে! ভারতবর্ষে যথার্থ স্ত্রীলোকই নেই, স্বাধীন প্রেমের মর্ম্ম সেখানে লোকে বুঝবে কি করে! সেখানে একটা সহজ সজীবতা নেই, সব যেন মরে পড়ে রয়েছে। বিধাতার কি নিষ্ঠুর বিধান যে অটার বেজারের মত সমজদার মানুষকে সেই দেশে ফিরে যেতে হবে! অটার একদিন বললে, "দেখ বেজা, যতটা খারাপ ভাবিস তা নয়। আজকাল নেটীবদের কলকাতার বড বড় সাহেবী ভেটেরাখানাতে ঢুকতে দেয়। আর সেখানে চায়ের সঙ্গে নাচ, খানা খেতে খেতে নাচ, এ সবেরও ব্যবস্থা আছে। কাজেই একেবারে আসল জিনিসটা না হলেও কতকটা relaxation, আমোদ-প্রমোদ, পাওয়া যাবে বই কি!"

"তাহলেই বাঁচব, ভাই! নইলে, বাড়িতে থেকে এক-ঘেয়ে আর্য্যজনোচিত শাক-চচ্চড়ী ভাত খেয়ে দুদিনে দম বন্ধ হয়ে মরব। তোর কথা আলাদা, অটা! সিবিলিয়ান হতে যাচ্ছিস। তুই নিজের মনের মতন লোকের মাঝে জীবন কাটাতে পারবি।"

*　　*　　*　　*

যথাসময়ে দুজনে দেশে ফিরল। অটার সিবিলিয়ান হয়েছে ত! বাড়ী না গিয়ে সোজা গ্রাণ্ড হোটেলে উঠল। বাপ সওদাগরী আপিসে সামান্য কাজ করেন, কায়ক্লেশে সংসার চালান, তিনি ছেলেকে তাঁর গলি-ঘুজির ভেতর ছোট বাড়ীতে নিয়ে যেতে সাহস করলেন না। কি জানি, যদি বাছার ইজ্জতের হানি হয়। সিবিলিয়ান সাহেব দিন পাঁচ সাত, "বাপরে, উঃ! কি অসহ্য গরম!" ইত্যাদি নানারকম অস্ফুট অস্বস্তির ধ্বনি করে কর্ম্মস্থলে চলে গেলেন। আত্মীয়স্বজনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। নবাবপুর জেলায় অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মুকুট পরে আমাদের অটার ভারতশাসনের কাজে লেগে গেল। জেলার হাকীমের সঙ্গে দেখা করতে যখন প্রথম গেল, তিনি কার্ড হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বাঙ্গালী ত?" অটার যখন বললে, "হ্যাঁ, নিশ্চয় বাঙ্গালী। কায়স্থের ছেলে।" তিনি বললেন, "এ কি রকম নাম? অটার কি বাংলা কথা না কি?" তখন তাড়াতাড়ি অটার বুঝিয়ে দিলে, "আমার হিন্দু নাম অটলকুমার। বড্ড লম্বা কি না, তাই তাকে কেটে কুটে নিয়েছি। কলেজে ঐ নামই প্রচলিত ছিল।"

"ওঃ, তোমার কলেজের ডাক-নাম! তা ও নাম কি কেউ বড় হয়ে ব্যবহার করে! লোকে হাসবে যে! আমার কলেজে নাম ছিল মার্মালেড। তাই বলে কি আমি তা কার্ডে ছাপিয়েছি? আর দেখ, আমার নাম Marmaduke Montgomery।

তোমাদের নেটিব, I beg your pardon, Indian, নামের চেয়ে ঢের লম্বা। সেজন্য আমার Service-এ কোন ক্ষতি কখনও হয় নেই। যাহোক, মন দিয়ে কাজ-কর্ম্মে লেগে যাও। ঘোড়ায় চড়তে পার ?"

অটারের চোখে রাগ দেখে ম্যাজিষ্ট্রেট একটু হেসে বললেন, "তোমায় সে রকম দেখাচ্ছে না। You dont look it, don't you know."

অটার বিলেতে ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করার বিদ্যাটাও শিখে এসেছে ত! সে বললে, "চেহারা দেখে কি ঘোড় সওয়ার চেনা যায় না কি ?"

"যায় না! Are you quite sure ? ঠিক জান ?" এই রকম দুচার কথা কওয়ার পর জেলা হাকীম মৃত্যুবাণ ছুড়লেন, "ওহে অটার, তোমার নূতন কাপড় করাতে হবে। ও কাপড়—"

"What's wrong with my clothes ? আমার পোষাকের কি দোষ দেখলেন আপনি—"

"না, না, কিছু না, আমায় মাপ কোরো। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছল।" ব্যাপারটা এই যে অটারকে লণ্ডনে কে একদিন বলেছিল যে তাকে অনেকটা চার্লি চ্যাপলিনের মত দেখতে। সেই থেকে সে আঠার ইঞ্চি চওড়া পাতলুন আর খুব খাটো কোর্ত্তা পরত, আর চার্লির মত পা ছুড়ে ছুড়ে চলত।

মণ্টগোমারী সাহেবের সঙ্গে প্রথম দর্শনে প্রেম হল না। তবে সাহেব প্রবীণ লোক, অনেক ছোকরা পার করেছেন, অটারের

সঙ্গেও বনিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে ঠাট্টা মস্করী করতেন বটে, কিন্তু অন্য সার্বিসের লোকের সামনে খুব ভাই ভাই ভাব দেখাতেন। তাতেই আমাদের অটলকুমার সন্তুষ্ট।

* * * *

এদিকে বেচারা বেজারের বড় দুরবস্থা! দুই বন্ধু একসঙ্গেই হাওড়ায় নেমেছিল। ষ্টেশন থেকে অটার যখন গ্রাণ্ড হোটেলে গেল, বেজার তার বাবাকে বললে, "আমিও হোটেলে যাই।" কিন্তু তার বাবা এটর্নী আপিসের বড়বাবু, কৌস্থলী চরিয়ে বুড়ো হয়েছে, সে রাজী হবে কেন! গাঁক করে উঠল, "বেজা, তোর মাথা ঘুরে গেছে দেখছি। নিজেকে ঠাওরাস কি? এখন থেকে রোজ আমাদের বাবুদের দোরে দোরে ধরনা দিবি, তবে মোকদ্দমা একটা আধটা পাবি। তোর ও সিবিলিয়ানী চাল করলে চলবে কেন! যখন সিংহ সাহেব, দাশ সাহেব, সরকার সাহেবের মত হবি, তখন নাক উঁচু করিস। চল বাড়ী চল, তোর মা সকাল থেকে পায়স পিঠে করছে। বলে ছেলেকে এক থার্ড কেলাস ঠিকে গাড়ীতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। ঐ দীর্ঘ দেহকে যথাসম্ভব কুঁচকে সে বসল সেই রথে, বাবা আর দুই ভাইকে নিয়ে। সেই হতে রোজ বেচারা শাকের ঘণ্ট, মাছের ঝোল খাচ্ছে, আর হাইকোর্টে পাড়ি দিচ্ছে। এটর্নী সাহেবদের বাড়ী খুব যাতায়াত করে বাপের সঙ্গে ধুতি পরে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার

সাক্ষাৎ ফল কিছু পায় নেই। দুই এক বাড়ী খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছে, কিন্তু সেও নেটীব খানা। বিকেল বেলা রঙ্গীন পায়জামা সুট পরে বসে দেড় টাকা শো বর্ম্মা চুরুট মুখে দিয়ে জাবর কাটে মনে মনে, "ওঃ! কি সব দিন গেছে ভার্সিটিতে, আর কি দিন যাচ্ছে এখন! অটারটাও এমন নিমকহারাম! একবার খবরও নেয় না। সিবিলিয়ান হয়েছে, নিজে মজা মারছে।"

এই রকমে বছর দুই যখন কাটল তখন সে মরিয়া হয়ে উঠল। তার এক বার-লাইব্রেরীর বন্ধু সম্প্রতি এক মস্ত বড় জজের কালো মেয়ে বিয়ে করে বাড়ী, মোটার, আসবাবপত্র, পেয়ে খুব চাল দিচ্ছে। বেজার উত্তর কলকাতাতে থাকে একেবারে নেটীব হালে, এই রকম জনরব ওঠায় তার ইঙ্গবঙ্গ সমাজে নিমন্ত্রণ জোটে না। দুই একবার চা পার্টিতে গেছল, কিন্তু মেয়েদের চিপটেন কাটার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই বেচারা দূরে দূরেই থাকে। নিজের পাড়ায় ধুতি গেঞ্জী পরে বেড়িয়ে, পান দোক্তা খেয়ে, বরং কতকটা খাতির জমায়। বুড়োরা বলে, "বিলেত যেতে হয় ত এই রকম! ভার্সিটির ছেলে, অথচ বেড়িয়ে বেড়ায় যেন ছাত্রবৃত্তি পাস করেছে।" এ সবে কিছু এসে যেত না, যদি মোকদ্দমা দুচারটে করে মাসে পেত। কিন্তু একবার এক pauper brief পেয়ে এমনই চলিয়েছিল যে তার বাবার মনিবও আর কাজ দিতে নারাজ।

এই অবস্থায় একদিন শুনলে যে এক দূর পল্লীগ্রামের জমীদার তাঁর মেয়েকে লোরেটো হাই ইস্কুলে পড়াচ্ছেন কবছর থেকে, এই

আশায় যে বিলেত-ফেরত জামাই মিলবে। মেয়েটি মেট্রিক পাস করেছে, বয়স ষোল বছর, দেখতে ভারী সুন্দরী, এইবার বর খোঁজা হচ্ছে। বেজা ত শুনেই লাফাতে আরম্ভ করলে। এটা হলে ত মেরে দিয়েছে! ছোট ভাইকে দিয়ে বাপকে বলালে। বাপ কিন্তু হেসে উঠলেন, "ও সব রাজা-রাজড়ার ধুয়ো আমি ধরতে পারব না। ব্যাটা নিজে চেষ্টা করুক গে।" কি করে চেষ্টা করবে? ভেবে-চিন্তে এক উড়ে ঘটক পাঠালে। সে প্রথম ছুচার দিন ত আমলই পেলে না। শেষ, হপ্তাখানেক বাদ এসে বললে, "বাবু, সে সম্বন্ধটি হবে না।"

"ভাল করে বলেছিলে, ছেলে বিলেতে কলেজে পড়া, হাইকোর্টের কৌঁসুলী, দেখতে খুব সুন্দর?"

"না বাবু, ও সব কিছু বলিতে কসুর করি নাই। রাজাবাবু শুনিয়া বলিলা, আমার মাইয়ার সম্বন্ধ হউচি এক সিবিলিয়ানের ঘরে।"

"তা হোক গে, তুমি আবার কালকে যাও। গিয়ে বল যে বর এক মস্ত এটর্নীর ছেলে। ছুচার বছরের মধ্যে সিবিলিয়ানের চতুর্গুণ রোজগার করবে। বেশ করে গুছিয়ে কথা বলতে পার না তুমি! একবার যদি মেয়ে দেখাতে পার, ত অনেক টাকা পাবে।"

টাকার লোভে ঘটক কি সব মিথ্যা কথা বলে এল, কে জানে! কিন্তু স্থির করে এল যে পরদিন ব্যারিষ্টার সাহেব কনে দেখতে যাবেন।

যথাসময় বর টেক্সী গাড়ী চড়ে রাজামহাশয়ের বালীগঞ্জের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল। ফটকে যে সেপাইটী ছিলে বেঢপ

খাকী উর্দ্দী পরে টহল দিচ্ছিল, সে থেমে তার ভাঙ্গা বন্দুকটা তুলে বেজারকে সেলামী দিলে। বাড়ীর সামনে পৌছলে এক উড়ে বেয়ারা নমস্কার করে তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসালে। ঘরটা নানারকম বিলেতী আসবাবে ভরা, কিন্তু সর্ব্বত্র ধূলো। চৌকী, কৌচ, সব ঘেরাটোপ ঢাকা। খানিক পরে একটি সুদর্শন যুবক এসে বললে, "রাজাবাবু একটু ব্যস্ত আছেন। আপনি বসুন। আমি রাজকুমারীকে নিয়ে আসছি।" বেজারের প্রাণে আশা হল। সে বললে, "আমার কোর্টের এখনও অনেক দেরী। আমি বসে আছি।" প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাহিরে চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজ শোনা গেল। বেজার কান খাড়া করেই ছিল। কাপড়-চোপড় গোছগাছ করে নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বসল। সেই যুবকটি এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে নিয়ে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। আমাদের বেজার মেয়েটিকে ভাল করে দেখবার জন্য তার গরদানটা বাড়ালে। ঠিক যেমন করে কচ্ছপ খোলসের ভেতর থেকে গলা বাড়ায়। গোল গোল চোখ দুটো তার যেন জ্বলতে লাগল। বেচারী রাজকুমারীর সেইদিকে নজর পড়তেই, "মা গো!" বলে ধপ করে দোরের কাছের এক চৌকীতে বসে পড়ল।

বেজার "আহা, আহা!" করে দাঁড়িয়ে উঠল। সঙ্গী যুবকটি তাড়াতাড়ি বললে, "মাপ করবেন। আমার বোনের শরীরটা বোধ হয় খারাপ মনে হচ্ছে। অনুমতি করেন, ত এখন নিয়ে যাই।"

“নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার দেখা হয়েছে। আমিই যাই।” বলে নমস্কার করে বেজ্বার নীচে পালাল। তখন মেয়েটি চোখ খুললে। “দাদা, লোকটা সত্যি গেছে ত! কি রকম হাড়গেল্লার মত গলাটা করছিল, দেখলে? বা-বা! আমার পা এখনও থর থর করে কাঁপছে।”

দাদা বললে, “নে, আর ন্যাকামি করতে হবে না, লতিকা! বাড়ীর ভেতর চল। তোর ভয় নেই। ও চীজকে আর এ বাড়ী ঢুকতে দেব না।”

বেজ্বার বাড়ী গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসল। টেক্সী বাবৎ পাঁচ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজ কিছু হল না। রাজা ত দেখাই করলে না! মেয়েটা যদি বা এল, ত অমন করে উঠল কেন! সে স্থির করলে “কুছ, পরোয়া নেহী, লেগে থাকতে হবে। কষ্ট নইলে কেষ্ট পাওয়া যায় না।” ঘটককে হুকুম দিলে “রাজার বাড়ীর খবরটা নিত্য নেওয়া চাই।”

দিন দুই বাদ ঘটক এসে খবর দিলে যে তার সিবিলিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী কাল মেয়ে দেখতে যাবে, লোকটার নাম অটল রায়। শুনে ব্রজ দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে, চোখ আকাশ পানে তুলে, সুর করে চেঁচিয়ে উঠল, “Oh! Ingratitude!” ঘটক ঠাকুর ভাবলে ইংরেজীতে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে, “হুজুর, আমার কি কসুর?” বেজ্বার খুব tragic ভাবে দোরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, “Go thou, to a nunnery, go.”

* * * *

অটারের ব্যাপারটা পাঠককে বুঝিয়ে দিই। সে চাকরী পেয়ে আসা অবধি ইঙ্গবঙ্গ সমাজ তাকে খুব তোয়াজ করছে। নবাবপুর বেশী দূর নয়। প্রতি শনিবারেই সে কলকাতায় আসে। দু দিনে অন্ততঃ দু জায়গায় নিমন্ত্রণ খায়। তবে মেয়ের মায়েদের কাছেই তার বেশী আদর। মেয়েরা গা টেপাটেপি করে। কাছে ঘেঁসতে চায় না। একেবার সে propose পর্য্যন্ত করেছিল। অবশ্য মেয়ের কাছে নয়, রেওয়াজ মত মেয়ের মার কাছে। মেয়েটি শোনবামাত্র ঢাকায় তার মামার বাড়ী পালিয়ে গেল। আর এল না। আর একবার, একটি ভাল মানুষ মেয়েকে একলা পেয়ে বলেছিল, "আমায় টেনিস খেলা শেখাবেন? আপনি ত অনেক cup প্রাইজ পেয়েছেন, শুনলাম।"

মেয়েটি বললে, "আপনি কি টেনিস খেলতে পারবেন কখনও! তার চেয় ব্রিজটাই ভাল করে শিখুন।"

দু বছর কারী ভাত খেয়ে অটারের পেটটি আরও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে সত্যি, কিন্তু তাই বলে মেয়েটা কি না মনে করলে সে টেনিস খেলতে পারে না! জানে না ত, সে রোজ ব্যাট হাতে করে নবাবপুর ইংরেজী ক্লাবে যায়। যাই হোক, ক্রমাগত এই রকম হেনস্তা বেচারা আর কত দিন বরদাস্ত করবে! তার কদর এই নকল মিসি-বাবারা না বোঝে, ত সে হিন্দু-সমাজে বিয়ে করবে। দিব্যি রুচি দেখে একটি মেয়ে বিয়ে করে এনে, তাকে

নিজে হাতে মানুষ করবে, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। যেমন সেকালে শাশুড়ীরা করত। অটার বাপের কাছে মামাতো ভাইকে দিয়ে কথাটা পাড়লে। বাপ নানা রকম ঘটক লাগিয়ে শেষ রাজকুমারী লতিকার সন্ধান পেলেন। কিন্তু নিজে কিছু করতে সাহস না পেয়ে পুত্রকে চিঠি লিখলেন, “কাকুড়গাছির জমীদার রাজা নরনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শ্রীমতী লতিকা নাম্নী এক শিক্ষিতা, বয়ঃপ্রাপ্তা রূপসী কন্যা আছে। তোমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাদের নিকট তোমার নামে ঘটক পাঠাইতে পারি। কন্যাটি বিদুষী হইলেও সর্ব্বরকমে আর্য্যভাবাপন্না। এ বিবাহ হইলে তোমাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে না। তোমার ইচ্ছা কি তাহা সত্বর জানাইবে।”

উত্তর খুব সত্বর এল, “বাবা, আপনি ঘটক পাঠাইবেন। আমি কন্যা দেখিতে যাইব আগামী রবিবারে।”

ঘটক-মারফৎ স্থির হয়ে গেল যে রবিবারে নটার সময় সাহেব লতিকাকে দেখতে যাবেন। রাজা বাহাদুরের নিজের এই বিবাহ প্রস্তাবে খুব উৎসাহ। বিলেত-ফেরত জামাই তিনি বরাবরই চান। সিবিলিয়ান ত বিলেত-ফেরতের সেরা! একবার তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্বশুর হলে তাঁর জেলার ডেপুটি, সদরালা, তাঁর কথায় উঠবে, বসবে। তখন তিনি একহাত দেখে নেবেন প্রজা ব্যাটাদের। গান্ধী মহারাজ, গান্ধী মহারাজ, করা বের করবেন। মিস্ লতিকারও এ সম্বন্ধ মন্দ লাগছে না। লোরেটোতে সিবিলিয়ান গোষ্ঠীর মেয়েরা কি রকম যে চাল দেয়, গা জ্বলে যায়!

বিয়ে করে সে অন্ততঃ ছুটি মাস কলেজে যাবে। দেখিয়ে দেবে নাক উঁচু করে চলতে হয় কি রকমে। আর, অটারের ত উৎসাহের অন্ত নেই! সে জাতে সিবিলিয়ান। এক গলদ, যে গরীব বাপের ছেলে। এইবার রাজার মেয়ে বিয়ে করে সেও জেলার জমীদার-দের মাঝে মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে, চলতে পারবে।

চারিদিকে সকলের এই রকম দুরু দুরু হিয়া। শুধু লতিকার দাদা অমলের মাথাটা খুব ঠাণ্ডা আছে। সে বোনকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু ভাই, যদি সেই বেজারের মত দেখতে হয়!"

বোনের গাল দুটি রাঙ্গা হয়ে উঠল। হেসে বললে, "কি যে বল, দাদা, তার ঠিক নেই। ও রকম চেহারা কি দুনিয়াতে দুটো থাকতে পারে!" মনে মনে ভাবলে, "সিবিলিয়ান, সরকারী জলপানি পেয়ে বিলেতে পড়ে এসেছে, নিশ্চয়ই খুব clever, বুদ্ধিমান। হলই বা চেহারা একটু নিরেস।"

রবিবার দিন রাজার নিজের গাড়ীতে অটার গ্রাণ্ড হোটেল থেকে এল। চারিদিকে সেক্রেটারী, সরকার, দরওয়ান, বেয়ারা ঘন ঘন সেলাম করতে লাগল। কুমার অমলনারায়ণ নিজে বরকে উপরে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ির চাতালে স্বয়ং রাজা, "এস, বাবা এস," বলে অভ্যর্থনা করলেন। অটার হোটেল থেকে আসছে কি না, তাই ইংরেজী কাপড় পরে এসেছে। বেয়ারা সাহেবকে কালো tail-coat, লম্বা কোর্ত্তা, পরিয়ে দিয়েছে। পোষাকটা বিলেতের, তিন বছর আগের তৈরী। আধুনিক অটারের অঙ্গে অতি কষ্টে

এঁটেছে। আগেই বলেছি অটার শ্যামবর্ণ। কিন্তু দুটি বছর নবাবপুরের রৌদ্রে পরিভ্রমণের ফলে সে রঙ এখন নিখুঁত কালো হয়েছে। গণ্ডস্থলের অত্যধিক পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য চোখ আরও বেশী কোটরস্থ হয়েছে। ঠোঁট দুটী খুব রাঙ্গা, তবে রঙ মেখেছে কি না, বোঝা যায় না। রাজা বাহাদুর ভাবী জামাইকে বসিয়ে বললেন, "অমল, লতিকাকে নিয়ে এস।" বলে অল্প কথায় মেয়ের গুণগান করতে আরম্ভ করলেন। একটু পরে মলের ঝুম ঝুম, চুড়ির ঠুন ঠুন, শোনা গেল। সেদিন ব্রজর কাছে মেয়ে ইঙ্গবঙ্গ সাজে এসেছিল। আজ যথার্থ রাজকন্যা সেজেছে, যেন দময়ন্তী স্বয়ম্বর সভায় আসছেন। দরজা পর্য্যন্ত এসে লতিকা আড়চোখে বরের দিকে চাইলে। চেয়েই অমনি দরজার চৌকাঠ ধরে থমকে দাঁড়াল। কি ভয়ানক! বেচারার মনে হল যেন একটা মোটা কালো বেরাল তার দিকে লোলুপ নয়নে চাইছে, এই ধরলে বলে! বেচারা কিছু না বলে এক ছুটে বাপের কাছে গিয়ে তাঁর বুকে মুখ লুকোল। বাপ বড় বিরক্ত হলেন। এই মাত্র জামাইয়ের কাছে বর্ণনা করছিলেন মেয়ে কি রকম smart, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, বলতে পারে, পিয়ানো বাজাতে পারে ইত্যাদি। মেয়েটা কি না এমনি করে রসভঙ্গ করলে! সেই চিরকেলে ভ্যানভেনে, প্যানপেনে হিন্দু মেয়ের মত ব্যবহার! কি করেন, তাড়াতাড়ি অটার সাহেবকে বললেন, "মিষ্টার রে, লতিকার বোধ হয় অসুখ করছে। আপনাকে আর একদিন কষ্ট করে আসতে হবে।

অটার খুব বিনয় করে বললে, "Very sorry, indeed, Sir, বড় দুঃখিত হলাম। আমি আবার আসছে রবিবারে আসব।"

অটার বেরিয়ে গেলে পর রাজা মেয়েকে খুব ধমকালেন, "এ আবার কি রকম ন্যাকামি! কচি খুকী না কি তুই! ইস্কুলে কি এতদিন এই শিখলি না কি? একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানিস না।"

মেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অমল বললে, "বাবা, ওর উপর মিছেমিছি রাগ করছ। ঐ ভয়ানক চেহারা, মহিষের মতন, ওকে দেখে আমরাই আঁতকে উঠি।"

"চুপ কর, অমল। মেয়েকে ইস্কুলে পড়িয়েছি বলেই তার বাঁদরামির প্রশ্রয় দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তুই কোন কথা বলতে আসিস না। লতিকা শোন্, আসছে রবিবার অটল তোকে আবার দেখতে আসবে। সেদিন তাকে চা ঢেলে খাওয়াতে হবে, পিয়ানো শোনাতে হবে, ভদ্র-সমাজের রীতি অনুসারে আদর অভ্যর্থনা করতে হবে।"

মেয়ে অত্যন্ত করুণ নয়নে বাপের দিকে চাইলে, "বাবা, আমায়—"

"না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বেশী কথা বলবি, ত দেখা শুনো বন্ধ করে দিয়ে একেবারে বিয়ের উদ্যোগ আরম্ভ করে দেব। অমল, তুমি এ সব ন্যাকামির প্রশ্রয় না দিয়ে বোনকে একটু বোঝাও-সোঝাও।" বলে রাজা মহাশয় রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

* * * *

সেই দিন বিকেল বেলা অমল ও লতিকা বেড়াতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে গিয়ে সোজা তাদের দিদি অলোকার বাড়ী গেল। দিদি তখন তাঁর কর্ত্তার জন্য জলখাবার করছেন রান্নাঘরে।

অমল চেঁচিয়ে ডাকলে, "দিদি, শীগগীর বেরিয়ে এস। দরকারী কাজ আছে। জামাইবাবু না হয় আজ বাজারের সিঙ্গাড়া কচুরী খাবেন।"

দিদি বেরিয়ে এলেন। উনুন-তাতে মুখ সিন্দুর বরণ হয়ে উঠেছে; ঘামে চুল কপালের উপর চিটকে গেছে। এক হাতে কড়া, অন্য হাতে খুন্তী করে এসে বোনকে বকুনি দিলেন, "লতিকা, তোর না আজ বাদে কাল বিয়ে হবে—এই তোর আক্কেল হয়েছে! তোদের সঙ্গে বসে ইয়ারকী দেব, আর কর্ত্তা খাবেন বাজারের পচা খাবার! ও কি রে, তোর মুখ অমন হয়ে গেছে কেন? মার কাছে বকুনি খেয়েছিস বুঝি! আচ্ছা, আমি আসছি এখনই, তোরা উপরে বসগে যা।"

খানিক পরে তিন জনে একত্র বসলে পর অমল বেজার অটারের গল্প বললে, খুব রঙ্গ চড়িয়েই বললে। বলে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ দিদি, বাবা মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তুমি কিছু বলবে না, কিছু করবে না?"

অলোকা বোনকে জিজ্ঞাসা করলে, "সত্যি লতি, তুই অটলকে বিয়ে করতে চাস না?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করছ কি? একবার নিজে তাকে চোখে দেখে এস না!"

"আচ্ছা তোরা বস, আমার Prime Minister, প্রধান মন্ত্রী, ঘরে আস্থন, তার পর পরামর্শ হবে।"

অমল বললে, "তবে তুমি যাও। মন্ত্রীকে খুশী রাখতে হবে। ভাল করে খাবার করগে। তোমার দেবর লক্ষ্মণটা কোথা গেল?"

"তেতলায় আছে, ডাক দাও না!"

অমল ডাক ছাড়লে, "সতীশ, সতীশবাবু, বাড়ী আছ?"

সতীশ নেমে এল। অমলেরই বয়সী, অর্থাৎ প্রায় বাইশ বছর। ফুটফুটে রঙ্গ, সুন্দর চেহারা। শিবপুর কলেজে হাতুড়ী পিটে পিটে পালোয়ানী ছাতি, প্রকাণ্ড হাতের গুলি হয়েছে। হেসে লতিকাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছোট বৌদি, আজ মুখখানা শুকনো শুকনো কেন?"

"আচ্ছা আপনি আমায় ছোট বৌদি, ছোট বৌদি, করেন কেন, বলুন ত।"

"তা কি বলব? লতিকা বলতে অনুমতি দেন, ত বলি। মিস্ চৌধুরী বলে আমি ডাকব না।"

"আচ্ছা লতিকাই বলবেন, অনুমতি দিলাম। দাদা, জিজ্ঞেস কর না এঁকে অটারের কথা।"

দাদা একটু দাঁত কিড়-মিড় করতে করতে জিজ্ঞাসা করলে, "সতীশচন্দ্র, অটার রে বলে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় আছে।"

"না পরিচয় নেই। তবে দিন কয়েক আগে ফুটবল খেলতে নবাবপুর গেছলাম, ম্যাচ দেখতে ঐ নামের এক মর্কট এসেছিল। একেবারে বাঁদর, হনুমান! সাহেবগুলোকে যে কি রকম তোয়াজ করছিল, কি বলব! শুনলাম, জাতে সিবিলিয়ান।"

"সেই মর্কট যে লতিকাকে বিয়ে করতে চায়, শুনেছ!

সতীশ চক্ষু রক্তবর্ণ করে চেঁচিয়ে উঠল, "কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা!" লতিকা হাসতে লাগল, "আপনি অত চটেন কেন, মশায়? বিয়ে ত করবে আমাকে।" "সেইজন্যই ত চটছি। শুধু চটছি নয়, নবাবপুরে গিয়ে ঝগড়া করে নাক ভেঙ্গে দিয়ে আসব।"

"ধরে পুলিশে দেবে না! সে ম্যাজিষ্ট্রেট, জানেন ত?" "তা দিক। আগে নাক ভেঙ্গে দিয়ে তার বিয়ে ভেঙ্গে দেব, তার পর না হয় জেলে যাব!" "অত বীরত্বে কাজ নেই। বাবাও তার দিকে, তা জানেন ত!" "না, আমি কিছুই জানি না। আমাকে বলুন, কি হয়েছে।"

ইতিমধ্যে বাড়ীর কর্ত্তা সুরেশবাবু কাছারী থেকে এসে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের কমিটি বসেছে তোমাদের হে?" লতিকা বললে, "দিদিকে ডাকুন, জামাইবাবু। নইলে কিছু বলব না।" সুরেশচন্দ্র হাঁকলেন, "গিন্নী, একবার এস গো, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বুঝি সমূহ বিপদ!" অলোকা জলখাবার হাতে করে এসে লতিকাকে বললে "যা, তোর জামাইবাবুর জন্যে চা করে নিয়ে আয় দেখিনি শীগগীর।" স্বামীকে বললে, "তুমি মুখ হাত ধুয়ে এস ঝাঁ করে।"

দশ মিনিট পরে সুরেশবাবু জল খেতে বসলে পর অলোকা বললে, “লতি, এইবার আমার মন্ত্রীর কাছে তোর দরখাস্ত পেশ কর।” লতি বললে, “দাদা, তুমি বল।” তখন অমল আগা-গোড়া সব কথা খুলে বর্ণনা করলে। সুরেশ খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললে, “আমাকে তোমরা জোর করে শ্বশুরদ্রোহী করছ। সমস্ত পাপ তোমাদের। একমাত্র উপায় হচ্ছে যে লতি যদি আমায় আজ বিয়ে করে। তাহলে হিন্দু-আইন অনুসারে পুনর্বিবাহ অসিদ্ধ হবে। আমি উকিল, এই opinion দিচ্ছি। লতিকাসুন্দরী, রাজী আছ?” “না, রাজী নই। বুড়ো বরকে আমি বিয়ে করব না। নিজের দিদির সতীনও হব না। ভারী আইন জান তুমি!” “কিন্তু ভাই, অন্য কোন পন্থা নেই। তোকে অটারের হাত থেকে বাঁচাতে হলে তোকে নিয়ে ভাগতে হবে।” সতীশ অলোকার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, “বৌদি, দাদার বদল আর কেউ হলে হয় না?” বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীকে, “উকীল সাহেব, তুমি না হয়ে আর কেউ যদি লতিকে নিয়ে পালায়, তা হলে হয়?” উকীল সাহেব গম্ভীর ভাবে বললেন, “তা হয় বই কি! কিন্তু আমি তাকে না দেখে মত দেব না।” অলোকা মিটমিটে হাসি হেসে বললে, “হ্যাগা, ছোটবাবুর স্ত্রীকেই ত ছোট বৌদি বলে?” “হ্যাঁ ব্যাকরণ মতে ত তাই হয়।” “আচ্ছা বেরসিক লোক, বাবু! এখনও বুঝতে পারলে না? হ্যাঁরে লতি, তোর কেন কান লাল হয়ে উঠছে?” লতিকা উঠে পড়ল, “আমি বাড়ী যাই। তোমরা কমিটী কর।” সতীশও উঠল। বললে, “ছোট বৌদিকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।”

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে আবার একত্র হলেন। অলোকা ছুছড়া বেল ফুলের গড়ে মালা সতীশ ও লতিকার হাতে দিয়ে বললেন, "মালা বদল কর।" বিনা আপত্তিতে নির্ব্বিবাদে মালা বদল হল। অলোকা শাঁক বাজিয়ে বোনকে জা পদে বরণ করে নিলে। স্থরেশ বীরের মত বুক চাপড়ে বললে, "এইবার দেখব, আমাদের ঘরের বৌকে কে বিয়ে করতে আসে! দেওয়ানী ফৌজদারী ছুকেতা মোকদ্দমা ঠুকে দেব, যদি চ গান্ধর্ব্ব বিবাহ কলিযুগে অপ্রচলিত।"

* * * *

এদিকে অটার বেজারের খবরটা নেওয়া যাক একবার। রবিবার দিন রাজবাড়ী থেকে হোটেলে ফিরে অটার দেখে বেজার বসে আছে তার ঘরে। জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে, কি মনে করে?" "তোমাকে টিফিন খেতে ধরে নিয়ে যাব ফিরপোতে?" "কেন তুমিও এইখানে খাও না।" "না ভাই, আমার সাধ তোকে আজ খাওয়াব। যেতেই হবে।" "রাইট ও! এটর্নী বাড়ীর মোটা চেক পেয়েছিস বুঝি?" বেজার কিছু বললে না। দেড়টার সময় ছুজনে বের হল। পাঠক তাদিকে গল্পের আরম্ভেই রাস্তায় দেখেছেন। ফিরপোর বাড়ীর উপর তলায় এক কোণের টেবিলে ছুজনে খেতে বসল। খেতে খেতে বেজার বললে, "অটা, তোর সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব। For Auld Lang Syne,

পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে, আমার একটু উপকার করতে হবে।” “Yes, fire away—বলে ফেল, বন্ধু।” “তুমি রাজা নরনারায়ণের মেয়েকে ছেড়ে দাও। তোমার কি, তুমি ত একটা মোটা মাইনের চাকরী করছ। আমি খেতে পাই না। বড় লোকের জামাই হলে একটা হিল্লে হয়ে যায়।” “না ভাই, আমি অত্যন্ত দুঃখিত তোমার ইচ্ছামত কাজ করতে পারছি না। আমার বিয়ের বয়স হয়েছে, পছন্দ-সই মেয়ে পেয়েছি, তোমাকে কেন ছেড়ে দেব? আর, আমি ছেড়ে দিলেই বা তারা তোমাকে পছন্দ করবে কেন?”

“রাগ কোরো না ভাই। তুমিও এমন কিছু কন্দর্প নও, যে তোমার রূপের জন্য তোমাকে কেউ পছন্দ করবে। আর, মনে আছে, বিয়ে জিনিসটাতেই তোমার অত্যন্ত আপত্তি ছিল? কত বক্তৃতা করেছ ইউনিয়নে, স্বাধীন প্রেমের গুণগান করে। আজ একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করতে দৌড়েছ!” “বেজা, বক্তৃতা করতে তুইও কিছু কসুর করিস নেই। তুই তাহলে লতিকাকে বিয়ে করবি কি করে?” “আমার কথা আলাদা ভাই। আমি ত সবই ছেড়ে দিয়েছি। ধূতি পরি, ডাল ভাত ভুঁইয়ে বসে খাই, আমার আর principles আছে কোথা? এই ত আজ নিয়ে সবে তিন বার হোটেলে খাওয়া হল, ফিরে এসে অবধি। দু বার পরের ঘাড় ভেঙ্গে, আর আজ নিজের পয়সায়।” “না ভাই, আজও তোর পয়সা দিতে হবে না। তুই আমার অতিথি। তোর কথাই যখন রাখতে পারলাম না, ভাল করে

তোকে আজ খাওয়াই। কি খাবি?" "সবই ভাল লাগছে ভাই। এই smoked মাছ, নোনা শুয়োরের মাংস, বিলেতে কুলী মজুরেও খায়, অথচ আজ অমৃতের মত লাগছে। মৌরলা মাছ বাড়ীতে রোজ খাই, অথচ এখানে Whitebait বলে দিয়েছে, তাই কত ভাল লাগছে!" "তা ত লাগবেই বেজা। খেতে খেতে মনে পড়ে যায় সেই বিলেত, সেই স্বাধীন প্রেম, সেই ধেই ধেই করে নাচ! এখানে একদিন নাচতে এসেছিলাম, কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে নাচতেই চাইলে না। নানা ওজর আপত্তি করলে।" "অটা, Do in Rome as the Romans do, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ, এই মন্ত্র নাও। ব্যাঙের ছাতা বিলেতে এত ভাল লাগত। এখন পাইও না, খাইও না। ডেঙ্গোর ডাঁটা খেতে খেতে মনে করি asparagus খাচ্ছি। তা যাকগে, লতিকাকে ছাড়বে না তাহলে?" "না ভাই পারব না। কিছু মনে করিস না। আয়, এক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া যাক।" "বেশ তাই ভাল, ভাই। অদৃষ্ট এড়ান যায় না। Badger মরেছে। আবার সেই ব্রজকিশোর! একটা মুনসেফী জোগাড় করতে চেষ্টা করব এইবার। তুই ভাই একটু সাহায্য করিস।"

* * * *

অটা কলকাতা ছেড়ে, লতিকাকে ছেড়ে, যেতে পারছে না। সাত দিনের ছুটী নিলে। কিন্তু রবিবারের আগে রাজার বাড়ী ত

যেতে পারে না। তাই বালিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, যদি লতিকাকে মোটারে একবার দেখতে পায়। দেখতে পেলে না। কিন্তু দু তিন দিন বাদ ডাকে এই চিঠি পেলে—

"রায় মহাশয়, আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করার সুযোগ হল না। একবার আলিপুর সরকারী বাগানের কাফিখানায় যদি কাল বিকেলে চারটের সময় আসেন, ত বাস্তবিক বড় আনন্দিত হব। দু দণ্ড গল্পস্বল্প করা যাবে। যদি না আসতে পারেন ত জানাবেন। নমস্কার। ইতি—

শ্রীলতিকা চৌধুরী।"

অটার হাসতে হাসতে বললে "যদি না আসতে পারি! যদি! এও কি সম্ভব! হৃদয়, শান্ত হও।"

পরদিন চারটের সময় অটার যখন চিড়িয়াখানার ফটকে নামল, বেজার সেখানে দাঁড়িয়ে। "কি রে বেজা, তুই কি মনে করে?" "এই একটু কাজ আছে ভাই, ভেতরে কাফিখানায়।" "অ্যাঁ, কোথায়? কাফিখানায়? কার সঙ্গে?" "তা বলতে পারলাম না ভাই, মাপ কোরো।" আর কিছু কথা না কয়ে দুজনে একসঙ্গে ভেতরে ঢুকল। দেখে, যে কাফিখানার সামনে ঘাসের উপর লতিকা একটি ধুতি-পরা ফিটফাট ছোকরার সঙ্গে পায়চারী করছে। তাদের দেখে দুজনে এগিয়ে এল। লতিকা নমস্কার করে বললে, "আসুন, চা তৈরী রেখেছি। এঁর সঙ্গে আলাপ করে দিই। আমার স্বামী সতীশচন্দ্র মিত্র।"

অটার বেজার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু লতিকার সঙ্গে চা খাওয়ার লোভটা সংবরণ করতে পারে কি! বেজার লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কতদিন বিয়ে হয়েছে?" "এই সবে পরশু দিন।" "তাহলে আমাদের তাড়াতেই শুভ কর্ম্মটা এত শীগগীর সমাধা হল! খাইয়ে দিতে হচ্ছে, মিষ্টার মিত্র।" "নিশ্চয় দেব। বয়, এক বোতল শ্যাম্পেন লাও।" শ্যাম্পেন এলে পর দুই বন্ধু দম্পতির মঙ্গল কামনা করে এক এক পাত্র করে খেলেন। তার পর লতিকা অটারের হাত ধরে বললে, "মিষ্টার রে, আমি আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি। সেটা ক্ষমা করে আমার একটু উপকার করবেন?" "অবশ্য করব। হুকুম করুন।" "বাবার নামে একখানা চিঠি লিখে দিন, যে আপনি আমাকে কোন কারণ বশতঃ আর বিয়ে করতে চান না। নইলে আমাদের উপর বাবার রাগ যাবে না। বাবা যে আপনার দিকে ভয়ানক ঝুঁকেছিলেন!" অটার চিঠিখানা লিখে লতিকার হাতে দিলে। তার পর সতীশের হাত ধরে খুব ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "Wish you all luck, old chap. I cannot claim to be a pretty bird like you. No wonder Lottie prefers you to me. ভাই, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার শুভ কামনা করছি। তোমার ও রূপের কাছে আমি হারব, তাতে আশ্চর্য্য কি!" বেজারও হাত নাড়া দিয়ে বললে "Same here old chap—Otters and Badgers have no chance against a real man, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ

করছি ভাই। অটার বেজার একটা সত্যিকার মানুষকে হারাবে কি করে?" সতীশ লতিকা চলে গেল। বেজার বললে, "অটা, একবার সেই পুরানো গানটা গাইলে হয় না? তোর কি বল, তুই ত বড় সাহেব। আমার সাহেবী হয়ে গেল। আমি এইবার গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুসভার প্রেসিডেণ্ট হব।" "আচ্ছা, fizz-এর বোতলটা আগে শেষ করে নেওয়া যাক।"

বোতল শেষ করে, দুজনে হাত ধরাধরি করে, গাইতে গাইতে march করে বেরিয়ে গেল।

ব্রজ : You are such a rotter, Otter.

অটল : You are but a bally Badger.

দুজনে : Otter and Badger,

Rotter and Cadger,

They cant get what they want.

অটারের চিঠি, অলোকার ষড়যন্ত্র, সুরেশের ওকালতী, এই তিনটের ফলে রাজা বাহাদুরের রাগ হপ্তাখানেকের মধ্যে পড়ে গেল। তখন ধূমধাম করে যথারীতি পুরুত ডেকে সতীশ ও লতিকার বিয়ে হল। অটার কলকাতা আসবার ছুটী পেলে না, কিন্তু বেজার দুটী দিন খুব খেয়ে গেল, যদি চ নেটীব খানা।

রাজপুতানী

আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ না হলেও এই শতাব্দীর সভ্যতাকে বড় ভালবাসি। চোখ রাঙ্গাতে হয় না, ঘুষো পাকাতে হয় না, লাঠি তুলতে হয় না, জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলো অবাধে নিষ্পত্তি হয়ে যায় উকীল-বাড়ীতে। ভব্যতার গণ্ডী পার হওয়ার দরকারই পড়ে না। সুবিধা সব রকমেই। কিন্তু তবু কি জানি কেন, মনটা কেমন সময় সময় হাঁপিয়ে ওঠে। তখন পালাই, বহু দূরে পালাই। কোথাও একটা কল্পিত অর্দ্ধ-বর্ব্বর আবেষ্টনের মাঝে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বাঁচি। পাঠকও চলুন আজ আমার সঙ্গে, ছাতি ভরে খানিকটা খোলা হাওয়া খেয়ে আসবেন!

অনেক বছর আগে আমার এক চারণ বন্ধু ছিল। উদয়পুর থেকে তাকে আনিয়েছিলাম। প্রায় সাত মাস সে আমার সঙ্গে তাবুতে তাঁবুতে ঘুরেছিল। কখন একা একাই সন্ধ্যাবেলা বসে তার গান শুনতাম। কখনও বা আশে-পাশের গ্রামবাসী রাজপুত তালুকদারদের নিমন্ত্রণ করতাম। যত বড় মজলিস জমত, বারোট-জী গাইতও তত ভাল। চাঁদকবি-প্রমুখ প্রাচীন চারণদের গাথা তার সমস্তই মুখস্থ ছিল। জলসা আরম্ভও করত কতকগুলো বাঁধা পদ গেয়ে! কিন্তু দুই এক মাত্রা কুসুম্বাপানি সেবনের পর মুখ খুলে যেত তার। তখন কোন বাধাই থাকত না। মুখে মুখে

অনর্গল শ্লোক রচনা করে গেয়ে যাচ্ছে। গাইতে গাইতে কখন হাসছে, কখন কাঁদছে, কখন বা বীররসের উদ্দীপনায় তার চোখ দুটো জ্বলে উঠছে। আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মুখের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গীও ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। আমার রাজপুত অতিথিরা মন্ত্র-মুগ্ধ। তারাও চারণের সঙ্গে একবার হাসছে, একবার কাঁদছে, একবার বা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে। খোলা মাঠে মশালের আলোয় সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! জলসা সত্যি জমত রাত বারোটার পর। ততক্ষণে প্রধান পালাটা শেষ হয়ে যেত। বারোটজী একবার জিজ্ঞাসা করতেন, "আরও কিছু শুনবেন মহারাজ?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই মনের আনন্দে নূতন পালা রচনা করতে লেগে যেতেন। এ সব পালাতে ইতিহাসের বালাই ছিল না। রাজওয়াড়ার কোন অখ্যাতনামা কিল্লেদারের জীবন-কাহিনী নিয়ে চারণ মহারাজ এমন গান গল্প জুড়ে দিতেন যে আমাদের ঘুম কোথায় পালিয়ে যেত। একদিনকার কথা মনে আছে। পালা ফুরিয়ে গেছে, রাত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গায়কের শ্রান্তি নেই। করলেন কি, উঠন্ত সূর্য্যের দিকে ফিরে একটু হেসে গান ধরলেন:

"পূরব গগন ভাসিত করী উঠত সুরজ মহারাজ।"

কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পালাই না শুনেছি—এই শেষ রাত্রের জলসায়! তার একটা আজ আপনাদের বলি, যতদূর মনে আছে। বারোটজী গাইতে লাগলেন:—

শুন সভাজন, রাজপুতের শৌর্য্যবীর্য্য এখনও অস্তমিত হয়

নেই। আজও প্রতিদিন হিন্দুস্থানে কত শত রাজপুত আপন ইজ্জৎ রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে। সে ইজ্জৎ কি সহজ জিনিস, ভাই! স্ত্রীলোকের সতীত্বের চেয়েও ভঙ্গুর জিনিস এই রাজপুতের ইজ্জৎ। অর্থ কিছু নয়, রাজ্য কিছু নয়, সিংহাসন কিছু নয়, প্রাণও কিছু নয়, যদি তার অমল ধবল কুল-গৌরবে কণামাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করে। মনে আছে, রাঠোরের মন্ত্রী একদিন তার প্রভুকে মারবাড়ের তৃণহীন মরুপ্রদেশ দেখিয়ে সগর্ব্বে কি বলেছিলেন!

আকড়ার ঝোপ, বকরার পাল,
বাজরার রুটী, তুয়রের দাল,
দেখ্‌ রে রাজা, তোর মারবাড়।

মারবাড়ের রাঠোরদের কথা জান ত? তাদের গৌরবগাথা আমার কাছেই ত কত শুনেছ। এই কুলের এক ক্ষুদ্র সামন্ত হরিসিং রাঠোর, মারাঠা রাজাদের সেনানী হয়ে, গুজরাতে আসেন। সে অনেক দিনের কথা। তখন তুর্কীর সূর্য্য চিরদিনের মত ডুবেছে, দিল্লীর তক্ত টলমল করছে, আর সেই তক্ত নিয়ে কাড়া-কাড়ি করছে ইংরেজ ও মারাঠা! হরিসিংহের পৈত্রিক পেশা লড়াই। মারাঠাদের ফৌজে ঢুকলে প্রাণ ভরে লড়তে পাবে। আর, কে জানে, অদৃষ্টে থাকে ত গুজরাতের সুন্দর সবুজ বনানীর মাঝে এক নূতন রাঠোর রাজ্যের পত্তন করবে। ভাই সব, বীরের স্বপন ত এই রকমই হয়ে থাকে। কিন্তু হায়, স্বপন কি সত্য হয়! হরিসিং সাধ মিটিয়ে লড়লে, কিন্তু নূতন রাঠোর রাজ্য স্থাপন করা

হল না। তবে তাঁর উপর তুষ্ট হয়ে গায়কবাড় মহারাজ মেহসানার কাছে এক জায়গীর ইনাম দিলেন। তার পর তুর্কী গেল, রাজপুত গেল, মারাঠা গেল, দিল্লীর তক্তে বসল ইংরেজ কোম্পানী। মরদের লড়াই খতম হয়ে গেল। আমলা, উকীল, আর বেণেতে মিলে মেড়ার লড়াই জুড়ে দিলে। হরিসিং রাঠোরের বংশধরেরা আপন কোটে আফিঙ্গ খেয়ে ঘুম দিতে লাগল। এ নূতন রাজ্যে তাদের স্থান কোথায়! যাক্, এখন আপদ চুকে গেছে। আর হরিকোটে কেউ রাঠোর নেই। সেই বংশলোপের করুণ কাহিনীই আজ তোমাদের বলব। হরিসিংহের শেষ বংশধর রণবীরসিং যথার্থ ই শূর বীর ছিল, সার্থক তার জন্ম হয়েছিল রাঠোর কুলে। কিন্তু ভাই, আর ত রাজস্থানের ঝণ্ডা উড়বে না, আর ত তিরৌরী, হলদীঘাট, দেবীরে, রাজপুত রণতাণ্ডবে মাতবে না। শৌর্য্য এখন মরদের অলঙ্কার নয়, চরণের নিগড়! তবু প্রদীপ নেভবার আগে একবার জ্বলে উঠেছিল। কলঙ্কের কালিমা ধুয়ে ফেলবার জন্য আবার একটী বার রাঠোরের শমশের বীরের হাতে বিজুলী খেলেছিল।

রণবীরকে আমি দেখেছিলাম যখন সে বারো বছরের ছেলে। সোনার মত রঙ্গ ছিল তার, কমলের মত মুখ। কিন্তু কি চোখ, ভাই, কি চোখ! যেন চৌদ্দপুরুষে সঞ্চিত আগুন সে চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে তার বাপ তাকে ইস্কুলে পড়তে পাঠালেন। কিন্তু সেই হাতে কলম ধরবে কি করে? সেই চোখে পুঁথীই বা পড়বে কেমন করে? কলম ভেঙ্গে, পুঁথী ছিঁড়ে

সিংহের বাচ্চা দুচার বছর কাটালে। তার পর বাপ মরে যেতেই সরস্বতী-মায়িকে প্রণাম করে ইস্কুল থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলে। হরিসিংহের এক মিশকালো রঙ্গের প্রকাণ্ড কাঠিয়াবাড়ী ঘোড়া ছিল, নাম সুলতান। তার পিঠেই সারাদিন কাটাতে লাগল। খুড়ো জ্যাঠা কেউ ছিল না, যে মানা করবে। কালীয়র হরিণের পেছনে বল্লম হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে, তার মৃগয়া হত। দুটো বাজ পুষেছিল। তাদিকে হাতের উপর বসিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিল জলার কিনারে কিনারে ঘুরত। কিন্তু এই রকম করে কত দিন কাটাবে জোয়ান ছেলে? শেষ, হায়রান হয়ে বেরিয়ে গেল রাজস্থান ভ্রমণে। দুটী বছর ধরে রাজোয়াড়ার প্রত্যেক কেল্লা, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক মন্দির, ঘুরে ঘুরে দেখলে। দেখত আর ভাবত, এই রাজপুতের রক্তে জন্মেছি আমি! বুকটা দশ হাত হয়ে উঠত। আবার তখনই মনে পড়ত, কই, আজ ত কিছুই নেই। কোথায় হিন্দু, কোথায় তার ক্ষত্রিয়, কোথায় রাজপুত! সব গেছে। যদি সবই গেছে, ত বেঁচে ফল কি? একবার যদি তলোয়ারটা খুলে কোথাও লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়াতে পারতাম ত—মরার মত মরতাম। যাই দেশ ছেড়ে। কোথায় লড়াই হচ্ছে খুঁজে বের করি। তার পর, বাপ দাদা যে রকম করে জান দিয়েছিলেন, সেই রকম করে দিই।

দেশে ফিরে রণবীরের আর হরিকোটে কিছুতেই মন বসল না। কাজ একটা তার চাই। এই বয়সে খালী হাতে বসে থাকবে কি করে! গেল চলে বড়োদায় তার পিতৃসখা সরদার

শম্ভাজীরাও মোহিতের কাছে। তাঁকে সব মনের কথা খুলে বললে। তিনি শুনে একটু হেসে বললেন, "বাবা, তুই বলিস ত ইংরেজী ফৌজে তোকে চেষ্টা করে ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সাধারণ সিপাহী হয়ে ঢুকতে হবে। তা পারবি কি?"

"রাও সাহেব, আমি খুব পারব। কিন্তু জাতের লোকে আমায় একঘরে করবে। জানেন ত, গরাসীয়া রাজপুতের কি রকম জাতের দেমাক!"

"তা জানি, রণবীর। বুঝতেও পারি। যার জাত আছে, বংশ আছে, তারই কুলগৌরব থাকে, কুলী মজুরের থাকে না। আচ্ছা, তোকে যদি আমি আমাদের গায়কবাড়ী ফৌজে একটা সামান্য রকম হুদ্দেদার করে দিই, তাহলে চলবে? কিন্তু তলোয়ার বাঁধবি এই পর্য্যন্ত, খুলতে হবে না কোন দিন।"

"তাই করে দিন, সরদার সাহেব। কে জানে, তলোয়ার খোলার মৌকা হবে কি না কোন দিন! একটা বড় রকম লড়াই যদি বাধে, ত রাজওয়াড়ার ফৌজেরও হয় ত ডাক পড়বে। নসীবে থাকে, হবে।"

"আচ্ছা রণবীর, আমি মহারাজকে বলব। তুমি তোমার জায়গীরের ব্যবস্থা করে মাস খানেকের মধ্যে বড়োদায় আবার এসো।"

"জায়গীর ত বাবা ইজারা দিয়ে গেছেন। ঘরকন্নার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়েই আসছি। রাও সাহেব, আপনি আমায় বাঁচালেন। প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছিল!"

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ফৌজে দাখিল হওয়া রণবীরের অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে! সে ত তা জানে না। ফেরবার পথে আহমদাবাদে নামল। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ভদ্রকালী মন্দিরে পূজা দিয়ে যাবে। ভদ্দরের ভদ্রকালী জাগ্রত দেবতা। তোমরা সবাই জান, প্রতি বৎসর সন্ধি-পূজায় সেখানে মহিষ বলি দেওয়া হয়। জৈন, বৈষ্ণব, বণিকের সহরে কেল্লার মাঝখানে যে আজও বলি বন্ধ হয় নেই, সে শুধু দেবীর মাহাত্ম্যে। সেই মন্দিরের পূজারী ঠাকুর ছিলেন একজন সিদ্ধপুরুষ। বারো বার ভারতের সমস্ত পীঠস্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন। তিনি পূজার পর রণবীরের কপালে রক্ত চন্দন দেওয়ার সময় বললেন, "বৎস, তুমি অবিলম্বে ক্ষত্রিয়ের কাম্যলোক প্রাপ্ত হইবে।"

মনের আনন্দে বালক হরিকোটে ফিরল। আর কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে গেল আস্তাবলে। তার কালো ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললে, "সুলতান, লড়াইয়ে যাবি?" সুলতান চোঁ হেঁ হেঁ করে লাফিয়ে উঠল! রণবীর হেসে তার গরদান চাপড়ে বললে, "আরে বেটা, একটু সবুর কর। অত অধীর হলে চলবে কেন?" ভাই সব, কে বেশী অধীর হয়েছিল, ঘোড়া না সওয়ার?

রণবীরের বাপের আমলের এক খাবাস ছিল, অমরসিং। সেও জাতে রাঠোর। তার পূর্ব্বপুরুষ এসেছিল মারবাড় থেকে ঠাকুর হরিসিংহের চাকর হয়ে। সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়ার পর

রণবীর তাকে বললে, "অমরসিং ভাই, আমার বড়োদায় নোকরী হয়েছে।" "কি নোকরী ঠাকুর সাহেব, পলটনে ত?" "হ্যাঁ, ফৌজে আফসার হয়েছি।" "লড়াই করতে যাবে, দাদা? তা ত যাবেই। সে ত তোমাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু তোমার বংশের নিয়ম যে বিবাহ না করে লড়াইয়ে যেতে নেই!" "বিবাহ কাকে করব? কিছুই ত ঠিক নেই।" "একটী খুব সুন্দরী কন্যা আছে, ঠাকুর সাহেব। বেশী দূরেও নয়। জেতপুরের বাঘেলা ঠাকুরের নাতনী। কিন্তু তাদের অনেক পয়সা। আমাদের ঘরে যদি মেয়ে দিতে রাজী না হয়! আর ত সে দিন নেই, হুজুর, যে কন্যা ধরে নিয়ে আসা চলবে।"

"কেন চলবে না? আলবাৎ চলবে। মেয়ে একবার দেখাতে পার? আমাদের ঘরে কেমন বিয়ে না দেয়, দেখে নেব।"

"আচ্ছা, সরদার। আমি কাল্ সকালে জেতপুরে গিয়ে কথাটা পেড়ে আসি।"

সন্ধ্যাবেলায় অমরসিং জেতপুর থেকে ফিরে এল। বিরস বদন। রণবীর জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলে, "না দাদা, সেখানে হল না। বাঘেলা ঠাকুর সাহেব কিছুতেই রাজী হয় না। একেবারে বেণে বনে গেছে। বললে, রাঠোর ফাঠোর আমি বুঝি না, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফা না থাকলে আমি মেয়ে দেব না।"

মনিবের রাগে চোখ জ্বলে উঠছে দেখে অমরসিং তাড়াতাড়ি

বললে, "তাতে কি এসে যায়, ঠাকুর সাহেব। আমি কালই বেরিয়ে খুব ভাল মেয়ের সন্ধান করে আসব।"

"না অমরসিং ভাই, যখন অত বড় কথা বলেছে জেতপুর-ওয়ালা, তখন আমি ঐ মেয়েই নিয়ে আসব। কিন্তু একবার নিজের চোখে দেখতে চাই যে!"

"দেখতে চাও? তাহলে কাল ভোর বেলা জেতপুরের মন্দিরের দোয়ারে দাঁড়িয়ে থেকো।"

"কি করে জানলে তুমি, অমরসিং ভাই?"

"সে অনেক কথা। আমি যখন বুড়োর সঙ্গে কথা কইছি, তোমার রূপগুণের বাখান করছি, তখন ভেতরের ঘরে চুড়ী নুপুরের আওয়াজ শুনলাম। সেদিকে আমি চাইতেই যে দাঁড়িয়েছিল সরে গেল। কিন্তু যখন ফিরে আসছি, আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে কোটের খিড়কী দরজা খুলে একজন আধ-বয়সী স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে আমায় রামরাম করে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ঠাকুর সাহেব কি একটা মস্ত কালো ঘোড়া চড়ে শিকার খেলে বেড়ান? আমি বললাম—তা ত রোজই করেন। তখন সেই স্ত্রীলোকটি খিডকীর কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ বাইসাহেব, তিনিই বটে! ভেতর থেকে মধুর কণ্ঠে জবাব এল—আমরা কাল সূর্য্যোদয়ের আগে মহাকাল মন্দিরে পূজা দিতে যাব, না জমনা-বাই? স্ত্রীলোকটি মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে—তোমার ঠাকুর সাহেবও পূজা দিতে আসবেন ত? আমি কোন উত্তর দিলাম না। হুজুর, এ সব আমাদের

সেকালের কাহিনীর মত শোনাচ্ছে। কিন্তু এখন দিন কাল অন্য রকম হয়েছে।"

রণবীর প্রসন্নমুখে বললে, "কিছুই অন্য রকম হয় নেই। রাজপুত চিরদিনই রাজপুত। অমরসিং ভাই, যদি কনে পছন্দ হয়, ত একা বাড়ী ফিরব না।"

অমরসিং হেসে উত্তর দিলে, "দাদা, পুরুত একটা ডাকতে কতক্ষণ লাগবে!"

পরদিন মহাকাল বাবার মন্দিরের বাহিরে শুভদৃষ্টি হল। চোখে চোখে কি কথা হল, আর কেউ জানলে না। রণবীর সিং ঘোড়া থেকে নামে নেই। সে হাত বাড়াতেই রূপালী-বাই লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার উপর। সুলতান তিন লাফে বেরিয়ে গেল হরিকোটের রাস্তায়। অমরসিং পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে আর এক ঘোড়ায় বসেছিল। তার ভাবগতিক দেখে জেতপুরের দরোয়ান একটা কথা বলতেও সাহস পেলে না। জমনা-বাই একবার "কি হল, কি হল, চোর, চোর!" করে নাটুকে ধরণে চেঁচিয়ে উঠল। অমরসিং একটু হেসে তার পায়ের কাছে দু খান গিনি মোহর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল। বাড়ীতে পুরুত উপস্থিত ছিল। পাড়া-পড়সী রাজপুত মেয়েপুরুষ সব এল। রূপালী-বাই যথাবিধি হরিকোটের সরদারনীর পদে বহাল হলেন।

অমরসিং সেই দিন হতে হপ্তাখানেক হরিকোটের চারদিকে তিরিশজন জোয়ান পাহারায় মোতায়েন রাখলে। আট দিনের

দিন জেতপুর হতে সওয়ার এল, ঠাকুর সাহেবের চিঠি নিয়ে। চিঠি রূপালীর নামে।

"রূপালী-বাই, তুমি স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় ছেড়ে গেছ। আর কখনও আমার কেল্লায় ঢুকতে চেষ্টা কোরো না। দরওয়ানরা অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। তাদের উপর কড়া হুকুম আছে। আর এক কথা। হরিকোটে পাহারা মিছেমিছি কেন রেখেছ? আমি তোমায় কেড়ে আনতে ইচ্ছা করলে তোমার ভিখারী বর আমাকে আটকাতে পারবে না। তবে, আমি আর তোমায় নিয়ে কি করব?

রাঠোর ছোঁড়াটাকে বিয়ে করেচ ত?

ঠাকুর জেসংজী বাঘেলা।"

রূপালী চিঠিখানা পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। স্বামীকে দেখালে না। এক কলম জবাব তখনই লিখে দিলে।

"জেতপুরের ঠাকুর সাহেব শ্রীমন্ত জেসংজী বাঘেলা সমীপেষু:

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি বিচলিত হবেন না। ভিখারী স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে আপনার জেতপুরের কেল্লায় ফিরে যাওয়ার আমার কোন ইচ্ছাই নেই। দরওয়ানদের বলে দেবেন।

হরিকোটের রূপালী-বাই রাঠোর।"

আরও এক মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। রূপালী ও রণবীর দুজনেই ভুলে গেছে যে তারা মর্ত্ত্যলোকে বাস করছে।

একটা গোলাপী নেশায় তাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। সংসারের সমস্ত ভার অমরসিং মাথায় করে রয়েছে। "আহা! ছেলেমানুষ, দুদিন আমোদ করে নিক্। দুনিয়াদারী ত আছেই। সারা জীবন দুনিয়াদারীতে ডুবে থাকতে হবে।" যেখান থেকে পারে, বুড়ো রোজ সকালে এক রাশ ফুল এনে ঢেলে দেয় এদের সামনে। দুজনে সেই ফুল নিয়ে কত খেলাই করে! কখন বা বেল ফুলের মালা গেঁথে দুজনে দুজনার মাথায় গলায় গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে, কখন বা গাঁদাফুল ছিঁড়ে নিয়ে দুজনে দৌড়াদৌড়ি, মারামারি, ছোড়াছুড়ি করছে, কখন বা রণবীরের তলোয়ারখানাকে খাপ থেকে বের করে রূপালী গোলাপফুল দিয়ে সাজাচ্ছে। একদিন রণবীর হেসে বললে, "রূপালী, আমাকে ফুল দিয়ে বেঁধে তোর সাধ মিটল না, তলোয়ারখানাকেও ফুল পরাচ্ছিস!"

বালিকা উত্তর দিলে, "সিংহজী, সময় এলে দুজনকেই রক্তচন্দনে সাজিয়ে দেব। কিন্তু আমার ফুলের খেলা যে এখনও শেষ হয় নেই! এস, আজ সুলতানকেও মালা পরিয়ে দিয়ে আসি।"

সুলতানের নাম শুনে রণবীরের বড় লজ্জা হল। সেই যে মহাকাল মন্দির থেকে ফিরে এসেছে, তার পর আর একবারও সুলতানকে বের করে নেই। ছি, ছি, ছি, রাজপুতের ছেলে না সে! ঘোড়াকে এই রকম হেনস্তা করছে! রূপালী কিন্তু রোজ একবার আস্তাবলে যেতে ভোলে না। গিয়ে সুলতানকে গলা জড়িয়ে কত আদর করে, তেল চিরুনী দিয়ে তার চুল আঁচড়ে দেয়,

আটা গুড় মশলা দিয়ে লাড্ডু করে খাইয়ে দেয়। রণবীরের কিন্তু বড লজ্জা করছে ঘোড়ার সামনে যেতে। কে জানে, হয় ত সুলতান মনে করে, "কি নিমকহারাম আমার মনিব! ওর রূপালীকে এনে দিলে কে? এখন তাকে নিয়ে মশগুল, একবার আমার দিকে ফিরেও চায় না।"

আজ কিন্তু স্ত্রী ছাড়লে না। দুজনে আস্তাবলে গেল। প্রভুকে দেখে ঘোড়া মহা আনন্দে লাফ দিয়ে চেঁ হেঁ করে উঠল। রূপালী তাকে এক চড মেরে বললে, "পাজী ঘোড়া! কোথায় ছিল তোর মনিব এত দিন? আমায় দেখে ত এ রকম লাফালাফি করিস না!"

সুলতান যেন বুঝতে পারলে তার কথা। আদর করে তার ছোট্ট কাঁধটির উপর মাথা রেখে সামনের ডান পাটা তুলে দিলে রণবীরের হাতে। অমরসিং দরজায় দাঁডিয়ে ছিল। এক গাল হেসে বললে, "আহা হা, কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোমাদের তিন জনকে, বাই সাহেব!"

এমন সময় ডাক হরকরা এক চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানা হাতে করেই অমরসিংহের সমস্ত গাটা কেঁপে উঠল। বৃদ্ধ ভাবলে, "এ রকম কেন হল? কোথাকার চিঠি এ!" রণবীর চিঠি নিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। "কার চিঠি, সিংহজী?" বলতে বলতে রূপালী তার পিছু পিছু চলল। চিঠি পড়ে রণবীর একটুক্ষণ বোকার মত বসে রইল। তার পর চিঠি রূপালীকে পড়তে দিলে। ম্লান হাসি হেসে বললে, "রাজপুতানী, শেষ হয়ে গেল তোর ফুলের খেলা।"

চিঠিখানা এই :—"রণবীর সিংহজী, এক মাস ত হয়ে গেছে, কই তুমি এলে না! আমি মহারাজ বাহাদুরকে বলে চাকরী একেবারে পাকা করে রেখেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে জেতপুরের ঠাকুর সাহেব এখানে এসেছিলেন। তিনি দেওয়ান সাহেবের কাছে তোমার নামে কি সব নালিশ করে গেছেন। তুমি অবিলম্বে বড়োদায় আসবে। ভয় নেই, আমি তোমার চাকরীর কোন গোলযোগ হতে দেব না। কিন্তু তোমার এখনই এখানে আসা দরকার। আশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—শম্ভাজীরাও মোহিতে।"

রূপালী চিঠি পড়ে একবার জোরে নিশ্বাস নিলে। তার পর হাসতে হাসতে স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললে, "তা সিংহজী, তুমি কি করবে বল? সেপাই মানুষের বৌ, চিরদিন ফুলের খেলা চলবে না, জানতাম। কালই বড়োদা চলে যাও তুমি তাহলে।"

"তা যাব! কিন্তু তোকে কোথায় রেখে যাই?"

"আমাকে আবার কোথায় রেখে যাবে! আমি আমার নিজের কেল্লা আগলাব।" অমরসিং এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পারব না কেল্লা আগলাতে, অমরসিং ভাই?"

অমরসিংহের বুকটা গর্ব্বে ভরে উঠল। বললে, "কেন পারবে না, বাই সাহেব! এমন বৌ আমরা ঘরেই আনি না। তুমি একটুও ভেবো না, মা! ঠাকুর সাহেব ত সত্যি লড়াই করতে যাচ্ছেন না। মরাঠা রাজার মহল আগলাতে যাচ্ছেন, ছিঁচকে চোর ভেতরে না সেঁধোয়।"

রূপালী হেসে উঠল,—কিন্তু রণবীর গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলে, "না অমরসিংহজী, বাই সাহেবকে এখানে রেখে যাওয়া চলবে না। কাছেই প্রবল শত্রু রয়েছে, জেতপুরের ঠাকুর সাহেব। রূপালী, চল্ তোকে আহমদাবাদে তোর মামার বাড়ীতে রেখে যাই। ছুটী পেলে বাড়ী এসে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে যাব।"

রূপালী তখনও হাসছে। বললে, "সিংহজী, তুমি এত বড় রাঠোর বীর, আমার জন্ম তোমার এত ভয় কেন বল ত!" রণবীর সে কথার উত্তর না দিয়ে অনুচরকে বললে, "অমরসিং ভাই, তুমি আজই আহমদাবাদে চলে যাও। ওদের বোলো রূপালী কাল আসছে।"

* * * *

পরদিন যখন স্বামী স্ত্রী ষ্টেশনে পৌছল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। ডুলী বেয়ারা, ঘোড়া, চাকর বাকর, সব বিদায় করে দিয়ে দুজনে প্লাটফরমে উঠল। টিকিট কেনবার সময় জিজ্ঞাসা করলে, "আহমদাবাদের গাড়ী কখন আসবে, মাষ্টার বাবু?" "এগারটা রাত্রে।" "এত রাত্রে কেন? সাড়ে সাতটায় যে একটা গাড়ী ছিল।" "ছিল বটে। কিন্তু এই পয়লা তারিখ থেকে সেটা সাড়ে ছটায় আসছে। এই একটু আগেই বেরিয়ে গেল। তোমরা বস গিয়ে বাহিরে। আমার গল্প করার সময় নেই, অনেক কাজ।"

রূপালী আপাদমস্তক একটা বুটিদার চাদর ঢেকে দোরের

বাহিরে দাঁড়িয়েছিল। এগারটা অবধি ষ্টেশনে বসে থাকতে হবে শুনে মনে কেমন ভয় হচ্ছিল তার। অজানা অকারণ ভয়। ব্যস্ত হয়ে দোর গোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। ব্যস্ততার জন্য মুখের কাপড়টা একটু সরে গেছল। সেই ফুটন্ত কমলের মত মুখখানির উপর নজর পড়তেই মাষ্টার বাবুর সমস্ত ভাবটা বদলে গেল। এক গাল হেসে গদগদভাবে রণবীরকে বললে, "আসুন আমার সঙ্গে, ঠাকুর সাহেব। আমি আপনাদের বসবার ভাল জায়গা করে দিচ্ছি। কোন কষ্ট হবে না।" দুজনকে নিয়ে গিয়ে বসালে Ladie's Waiting Room-এ, মহিলাদের বিশ্রাম ঘরে। পরিষ্কার সাজান ঘর। টেবিলে ল্যাম্প জ্বলছে। একজন আধবুড়ো কুলীকে ডেকে বললে, "এই, পোর্টার! দোরের কাছে থাকিস! এঁদের কিছু দরকার হলে সাহায্য করবি।"

ছোট ষ্টেশন। ট্রেন চলে গেলেই নিঝুম হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী এক বেঞ্চে বসে ঢুলতে লাগল। খানিক পরে রণবীর বললে, "রূপালী, এ রকম করে দুজনে ঘুমোলে কি হবে? বাড়ী পৌঁছে খেতে ত একটা বাজবে। তুই যদি একটু একা থাকতে পারিস, ত ঝট করে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসি।" স্বামীর পাশে বসে বসে রূপালীর তখন ভয়টা কেটে গেছে। বললে, "সে ত খুব ভাল কথা। দুজনে খেয়ে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, আমার একলা থাকাতে তোমার এত ভয় কেন বল ত! হরিকোটে একলা থাকতে পারব না! এখানে সরকারী ষ্টেশনে দু দণ্ড একলা বসতে পারব না! আমিও ত রাজপুতের মেয়ে গো!"

রণবীর নির্ভাবনায় বেরিয়ে গেল। মনে করলে, "কতই বা দেরী হবে? আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না। পোর্টারটা ত বসে রয়েছে দোর গোড়ায়।" কিন্তু শীগগীর ফিরতে পারলে না। খাবার কেনা ত সহজেই হল। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই দেখে, দুজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বেজায় কাঁদাকাটা করছে। রণবীরের বগলে তলোয়ার দেখে তাকে সরকারী লোক ঠাওরালে। এসে একেবারে পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "আমাদের দিয়ে তিন কোশ মাল বওয়ালে, হুজুর। এখন চার আনা বই পয়সা দিচ্ছে না।" "কে পয়সা দিচ্ছে না?" "ঐ গদীর মহাজনেরা। দয়া করে ওদের একটু ধমকে দাও, বাবা।" "আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।" গদীতে গিয়ে রণবীর খুব তম্বিতম্বা করলে। শেঠেরাও ভাবলে সে সরকারী আমলা! অনেক দর কষাকষি করে শেষ এক এক গাড়োয়ানকে বারো আনা করে দিলে।

রণবীর ষ্টেশনে ফিরে দেখে ওয়েটিং রুম অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে গেল। দেখলে এক কোণে রূপালী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ভুঁইয়ে বসে রয়েছে। মুখ অবধি চাদর জড়ান।

হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি গো, ঘুমিয়ে পড়লি না কি?" কোন উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলে, "রূপালী, ঘুমোচ্ছিস?"

কি রকম একটা ভয়ানক স্বরে জবাব এল, "না জেগেই আছি। তুমি আমাকে ছুঁইও না।"

রণবীর কিছু বুঝতে পারলে না। বললে, "কি বলছিস্ তুই, পাগলী! ওঠ, মুখে জল দিয়ে আয়। খাবার এনেছি।"

রূপালী আবার কথা কইলে, চাদরের ভেতর থেকে। ভাঙ্গা গলায়, হাঁপাতে হাঁপাতে, যেন যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছে, "না গো না! পায়ে পড়ি তোমার, তুমি যাও, আমি খাব না। তুমি চলে যাও বড়োদায়। আমি হরিকোটে ফিরে যাচ্ছি এখনই। আমার কাছে দাঁড়িও না। দয়া কর।"

রণবীরের বুকের ভেতর যেন কে হাতুড়ী মারছে। জিব শুকিয়ে যাচ্ছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, রূপালী? বল্ আমাকে, লক্ষ্মীটি। বল্, কি হয়েছে।" কোন উত্তর নেই।

তখন রণবীর বাহিরে প্লাটফরমে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কি করবে সে? কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় খানিক দূরে দেখতে পেলে সেই বুড়ো কুলিটাকে। তাকে দেখে পালাতে চেষ্টা করছে। এক ছুটে গিয়ে তার হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "দরজা ছেড়ে কেন গেছলি তুই? কি হয়েছে আমার স্ত্রীর? কি হয়েছে বল্, হতভাগা!" বলে কুলিটার হাতে মোচড দিতে আরম্ভ করলে।

বুড়ো যাতনায় গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, "আমায় কেন মারছ, ঠাকুর সাহেব? আমি বুড়ো, আমি গরীব, আমি গোলাম, হুকুম তামিল না করে আমার গতি ছিল না।"

"স্পষ্ট বল্ কি হয়েছিল, নইলে তোর হাতের কব্জী গুঁড়ো করে দেব।"

"ষ্টেশন মাষ্টারবাবু আলো নিভিয়ে আমায় হুকুম করলেন বাইকে

ধরতে। বাই তখন ঘুমোচ্ছিল। আমি ধরলাম তাকে চেপে। ভয়ে, বাবা ভয়ে! মনে করলাম—চাকরী গেলে—বুড়ো বয়সে খেতে পাব না। দোহাই বাবা, গরীবকে প্রাণে মেরো না।”

“না তোর প্রাণ নেব না। ডান হাত বাড়া।” কুলিটা ডান হাত বাড়িয়ে দিলে। রাজপুত তলোয়ারের এক কোপে হাতখানা কেটে নিলে। নিয়ে ঝড়ের বেগে টিকিট ঘরে ঢুকল। সেখানে টেবিলের পিছনে বসে বাবু হিসেব লিখছিলেন। হঠাৎ দরজায় রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে রাজপুতকে দেখে ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেল। তবু জোর করে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললে, “কে তুই? বেরো এখান থেকে। বেরো! মাতলামি করবার আর জায়গা পাস নেই! এটা সরকারী আপিস, জানিস না! এখনই পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেব।”

রণবীর কথা কইলে না। এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে সেই কাটা হাতখানা দিয়ে বাবুর গালে এক ভীষণ চড় মারলে। তার পর—লাল তলোয়ারখানা ফোঁস্ করে লাফিয়ে উঠল, গোখরো সাপের মত। বাবুর কাটামুণ্ড ভুঁইয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

চুলের মুঠি ধরে সেই মুণ্ড তুলে নিলে রণবীর। নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ফিরে গেল ওয়েটিং রুমে। স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “রূপালী, এই ত?” একটা দেশলাই জ্বেলে মুণ্ডটার সামনে ধরলে। রূপালী ঘোমটা তুলে দেখলে। দেখে ঘাড় নেড়ে জানালে, এই বটে। তার পর টেনে চাদরটা খুলে ফেলে দিয়ে

হাঁটু গেড়ে বসে ধীরে ধীরে গরদান বাড়িয়ে দিলে স্বামীর দিকে। রণবীরের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তলোয়ারখানা হাত থেকে খসে পড়ল ঝনঝন করে পাথরের মেজের উপর।

মুহূর্ত্তেক সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাহিরে লোকের কলরব বেড়ে উঠতে লাগল। মনে হল, কারা যেন সব দৌড়ে আসছে সেই দিকে। আর সময় নেই। রণবীর তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে রূপালীর কানের কাছে বললে, "আচ্ছা, সেই ভাল, রূপালী। পিয়ারী, সেই ভাল। তুই এগিয়ে যা। আমিও আসছি।"

উডল তলোয়ার আবার, সেই আঁধার ঘর আলো করে। সতীর রক্তে পৃথিবী পবিত্র হল। রণবীর স্ত্রীর ছিন্নমুণ্ড বুকে চেপে ধরে বাহিরে গিয়ে বসল। আধ ঘণ্টা পরে যখন পুলিসের দারোগা এলেন, তখনও সে সেই একই অবস্থায় বসে আছে, বিড়বিড় করে কি বলছে। দারোগা একটা প্রশ্নেরও জবাব পেলেন না।

তার পর দশ বছর কাটল রণবীরের রত্নাগিরির পাগলা গারদে। কাউকে কষ্ট দিত না এতটুকু! চুপ চাপ বসে থাকত একটা ইঁট কি এক চাঙ্গড়া মাটি কোলে করে। চোখ থেকে টস্ টস্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ত সেই ইঁটের উপর কি মাটির ঢেলার উপর। দশ বছর এই রকম চলল। কত জলই না ছিল ভাই, তার চোখে! শেষ একদিন হল কি, হঠাৎ তার পাগলামি বেড়ে গেল। বাগানে পড়ে ছিল এক শাবল। দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ভাঁজতে আরম্ভ করে দিলে যেন সেটা তলোয়ার।

বিকট হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কোথায় আপিস? কোথায় সেই হারামজাদা মাষ্টার? একটু সবুর কর, পিয়ারী। আনলাম বলে তার মুণ্ড।" চার পাঁচজন ওয়ার্ডার তাকে তাড়া করলে। সে এক মই বেয়ে দুড় দুড় করে পাঁচিলের মাথায় চড়ে গেল।

তার পর শাবলটা নীচে ফেলে দিয়ে আকাশ পানে চেয়ে ডাক ছাড়লে, "রূপালী! রূপালী! আমি এসেছি।" কি দেখলে, কে জানে। মুখে তার সুন্দর হাসি ফুটল। দু হাত বাড়িয়ে এক লাফ মারলে বাহিরের দিকে।

হরিকোটের রাঠোর-ঘরানা নির্ম্মূল হয়ে গেল। ভাই সব, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না আমার রণবীরের জন্য!

বেরসিক

আমার নাম রসিকলাল মৈত্রেয়। অন্ততঃ আমার বাপ মা ঐ নামই দিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু টিকল না অমন সুন্দর নামটা! বিলেতে যখন পড়তে গেলাম, সেখানে বন্ধুরা আমাকে ডাকতে আরম্ভ করলে misnomer বলে। দেশে ফিরে আবার যখন বিশুদ্ধ স্বদেশীয় নাম নেওয়ার প্রয়োজন পড়ল, তখন বার লাইব্রেরীর ভ্রাতারা আমাকে baptise করলেন—বে-রসিক। এই baptismal (নামকরণ উৎসব)-এর বাবতে আমার অনেক-গুলো টাকা খরচ হয়ে গেছ্‌ল।

আজ পাঁচ বছর আমি নূতন নামেই পরিচিত। নামটা, বোধ হয়, আমাকে মানাতও বেশ। কিন্তু এখন আমার গিন্নী চটে যান। বলেন—ও ত তোমার নাম নয়, বদনাম। যাঃ! কি করলাম, গল্প লিখতে বসেই সব ফাঁস করে দিলাম! এখনও কেউ যে জানে না, আমি বিয়ে করেছি! কিন্তু আর না বলেও থাকতে পারছি না। তাই ত অনেক ভেবে চিন্তে কলম ধরলাম। এতে যদি ব্যারিষ্টার ভায়াদিকে এক কেস্ শ্যাম্পেন দিতে হয়, ত দেব। উপায় কি?

গল্পটা আর কেউ লিখলে, হয়ত ভাল হত। আমার সম্বন্ধে দুটো ভাল কথাও বলতে পারত। এই বেকার সমস্যার দিনে

লেখক পাওয়া ত কঠিন নয়! ব্রিষ্টল গ্রিলে গোটা ছুই টিফিন, আর ফিরপোতে গোটা ছুই খানা, খাওয়ালে আমার হাইকোর্টের বন্ধু অনেকেই আমার biography (জীবনী) লিখতে রাজী হবেন। তবে সে biography-র ভাষা—সুশ্রাব্য হবে কি? আর, সত্যি বলতে কি, আমার ব্রাদারদের রসজ্ঞান বড কম। আমি যে স্বনাম-খ্যাত বেরসিক, আমার চেয়েও কম। ওরা কি আমার romance-টা ঠিক বুঝবে? কাজ নেই। নিজেই লিখি।

আমার বাবা ছিলেন মস্ত এটর্ণী। বিস্তর টাকা রোজগার করেছিলেন। আমি তাঁর এক ছেলে। দাদা খুব অল্প বয়সে মারা যান। দিদিরা দুজনে শ্বশুর-ঘর করছেন। কাজেই বাপ মা তাঁদের স্নেহের ভাণ্ড আমার মাথায় উপুড় করে দিয়েছিলেন। নিন্দুক লোকে বলত ছেলেটা আদর খেয়ে বাঁদর হয়ে যাচ্ছে। বলত বই কি! নিজের কানে এ কথা শুনেছি। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। আমি ছেলেটি ছিলাম ভাল। ভাল মানে ক্লাসে ফার্ষ্ট বয় নয়, যাকে বলে nice lad। শুধু কি তাই! প্রেসিডেন্সী কলেজে রীতিমত চারটী বছর পড়ে বি এস সি পাস করেছিলাম। অনার্স পাই নেই বটে। কিন্তু অর্দ্ধশত বর্ষ পরে, ও সামান্য কথা কার রবে মনে? লেখা-পড়া বেশী করি নেই, স্বীকার করি। কিন্তু লেখাপড়ার চেয়েও যেটা বেশী দরকারী জিনিস, খেলা-ধূলো, সেটা সাধ মিটিয়ে করেছিলাম। দেহখানা বেশ গড়ে উঠেছিল। তবে মনটা গ্রাজুয়েট-জনোচিত করে তুলতে পারি

নেই। আড়ালে কেউ কেউ আমার সম্বন্ধে হোঁৎকা শব্দটাও প্রয়োগ করত, শুনেছি। ভারী অন্যায়! নয়?

ছেলেবেলা থেকেই বাবা আমাকে বেশ মোটা রকম জলপানি দিতেন। তার অধিকাংশটাই আশ্রম, কেবিন, ইত্যাদি স্থানে খরচ হত কুক্কুট-মাংসে। সেই মাংসের কিন্তু অতি সামান্য ভাগই আমি নিজে খেতাম। সুতরাং হোঁৎকা হলেও বন্ধুমহলে আমার popularity (লোকপ্রিয়তা) কায়েম ছিল। কৃতজ্ঞ বন্ধুবান্ধব আমাকে নানা বিদ্যা শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। তার কতকগুলো আমি সহজেই রপ্ত করেছিলাম—যথা, ব্রে খেলা, সিগারেট খাওয়া, ক্লাসে proxy দেওয়া। কিন্তু নাকী-সুরে রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করা আমাকে কেউ শেখাতে পারলে না। তথা, হারমোনিয়ামের চাবি টিপতেও কখন পারলাম না। আঙ্গুলগুলো ছিল বেজায় মোটা মোটা। এক সঙ্গে দু তিনটে সাদা কালো চাবি টিপে ফেলতাম। তখন ওরা করলে কি, আমাকে দিয়ে বাজনার হাপর ঠেলিয়ে নিতে আরম্ভ করলে। রোজ মাথা ধরে যেত, বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে বসে—তো-মা-রি ত-রে গেঁ-থে-ছি হা-র—গান শুনতে শুনতে। ঐ গানটা ছিল ওদের জাতীয় সঙ্গীত গোছের। রোজ গাইত। কি করি? শেষ এক ফন্দী মাথায় এল। একটা ছোট্ট পেরেক লুকিয়ে হাতের চেটোয় নিয়ে বসতাম। সুবিধা পেলেই হাপরে দু তিন স্থানে সেটাকে ফুটিয়ে দিতাম। জলসা অকালে বন্ধ হয়ে যেত। এদের এমন কেউ ছিল না যে বাজনাটা

টঁ্যা টঁ্যা না করলে গাইতে পারে। আমাদের মজলিসটা ঠিক "রুচি-সংসদের" মত high class না হলেও এটা বলতে পারি, যে কলেজে উঠে অবধি আমাদের মেম্বররা কেউ কখন হেঁটে বেড়াতে বেরোতেন না। ও সব চোয়াড়ে ব্যাপার আমি একাই সকলের নাম করে বজায় রেখেছিলাম।

আমি বি এস সি পাস হওয়ার পর বাড়ীতে সমস্যা উঠল, ছেলে এইবার করবে কি? বাবার ত পঁচিশ বছর আদালতের কাদা ঘেঁটে-ঘেঁটে মনটা এত, কি বলব, আইন-বিরুদ্ধ হয়ে গেছল যে তিনি বললেন—খোকা, তোর যা মন চায়, কর। কিন্তু হাই-কোর্টের তে-সীমানায় আসতে পাবি না।

মায়ের বড সাধ, পুত্র হাইকোর্টের জজ হয়। কিন্তু জজ হওয়ার ত সরাসরি কোন পন্থা নেই। আগে উকীল কৌঁসুলী হওয়া চাই। এই সব জটলা চলছে, এর মাঝে মা আমার হঠাৎ চলে গেলেন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আরও মাস ছয়েক জবে-স্থবে কাটল। শেষ, বাবা বললেন—দেখ খোকা, এক কাজ কর। এডিনবরা চলে যা। ডাক্তার হয়ে আয়। কেমিষ্ট্রীটা ত পডাই আছে!

গেলাম চলে এডিনবরা। কিন্তু বছরখানেক পড়ার পর স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে ডাক্তারী আমার দ্বারা হবে না। সেই সময়টায় বাবা, কি জানি কি মনে করে, এক চামড়ার কারবারে মবলক টাকা ফেলেছিলেন। আমাকে লিখলেন—ডাক্তারী যদি নিতান্তই না পোষায় ত Leeds-এ চামড়ার কাজ শিখে আয়। নিজের কারখানা দেখবি।

তখন একটা খুব ঘেউট উঠেছে—Bengal for the Bengalees। দিন কয়েক আমারও একটা বেশ উৎসাহ হল। কত রকম চামড়ার নাম শিখলাম। Tan করার নানা রকম প্রক্রিয়াও আয়ত্ত করলাম। কিন্তু কদিন? এক বছর না যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগল—শেষকালে মুচী হব? একেবারে হরিজন! তার চেয়ে বদ্দি হওয়া যে ছিল ভাল! কিন্তু বাবাকে আবার লিখি কি করে, ভাববেন কি?

লিখতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে হল না। সেই চামড়ার কারখানাটা ফেল হয়ে গেল। পয়সা-কড়ি যা কিঞ্চিৎ উদ্ধার হল, সব মেরে নিলেন বাবার এক Bengalee বখরাদার। হাজার পঞ্চাশেক টাকা ডুবল। এই দুর্ঘটনার মাস খানেক বাদে বাবার কাছ থেকে এক পত্র পেলাম। পত্রখানা পড়ে কি যে আনন্দ হল, কি বলব! মোদ্দা কথাটা এই,—তুমি স্পষ্ট কিছু লেখ নেই, কিন্তু ইদানীং তোমার চিঠিগুলোর ভাব-গতিক দেখে আমি বুঝতে পারছি, যে Tannery-র কাজ শেখা সম্বন্ধে তোমার আর কোন উৎসাহ নেই। এগজামীন ত এ পর্য্যন্ত একটাও পাস করতে পারলে না। সত্যি বলতে কি, আমারও ব্যবসা বাণিজ্যের ঝোঁক কেটে গেছে, বাবা। High Court for the Bengalees বজায় থাক, তাহলেই যথেষ্ট। তোমার মায়ের, জান ত, চিরদিন সাধ ছিল তুমি হাইকোর্টের জজ হও। সেই পথই ধর তাহলে। আমি আর আপত্তি করব না। যত শীঘ্র সম্ভব bar-এ নাম লেখাও। টেলিগ্রাম পেলেই টাকা পাঠাব।

অবিলম্বে bar-এ খানা খেতে আরম্ভ করে দিলাম। একবার ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরতে পারলে হয়! আমার কি ভাবনা? অত বড় এটর্ণী আপিস আমার হাতের মুঠোয়! এ রকম সুবিধা কার ছিল? লাট সিংহেরও নয়, বনার্জ্জী সাহেবেরও নয়, সরকার সাহেবেরও নয়। লণ্ডনের সেই অন্ধকার কুয়াসার মাঝে বসে বসে পাইপ মুখে দিয়ে এমনি কত আলনস্করের স্বপ্ন দেখতাম!

কিন্তু আমার অদৃষ্ট বিরূপ! গোটা ছয়েক term খানা খেয়েছি, এমন সময় আমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। এখন যিনি আপিসের বড় বাবু হলেন, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, তাঁর আপন ভাই কলকাতায় ব্যারিষ্টারী করছে আজ চার বছর। তাকে ফেলে কি আমাকে তিনি মোকদ্দমা দেবেন! ছোট বাবু, নরেশ বোসের উপরেও ভরসা নেই। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বড শালা আমাদের Inn-এই খানা খাচ্ছে। খুব সম্ভবতঃ আমার ঢের আগে পাস-টাস করে বেরিয়ে যাবে। নরেশ বাবুর প্রথম চেষ্টা ত হবে, তাকে দাঁড় করিয়ে দেবার! তাহলে আমার আর রইল কে! চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলাম। আর ব্যারিষ্টারী পড়ে কি হবে?

মনের দুঃখে চলে গেলাম সুইস্ দেশে। সেখানে তিন মাস ধরে পদব্রজে খুব ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম পাহাড়ে পাহাড়ে। Mout Blanc-র চূড়ায় উঠে বরফের মাঝে কয়েক ঘণ্টা মাথা ঠাণ্ডা করে এলাম। ক্রমাগত কসরতের ফলে শরীরটা বেশ খনখনে

হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনটাও অনেক হালকা বোধ হতে লাগল। চুলোয় যাক ব্যারিষ্টারী! জীবনে আরও কত জিনিস আছে মানুষের।

জেনিভায় আমার হোটেলে একদিন বসে আছি, এমন সময় বড ভগ্নীপতির কাছ থেকে এক চিঠি এল। তিনি বাবার এক্‌জিকিউটার। উইলের প্রোবেট নিয়ে বিষয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বিষয় নিতান্ত কম নয়। বিডন ষ্ট্রীটের বসত বাড়ী ছাড়াও আর তিনখানা বাড়ী আছে। সেগুলো ভাড়া দেওয়া হয়। তার উপর, নগদে কোম্পানীর কাগজেও বেশ কিঞ্চিৎ আছে। মোট আয় হাজার দেড় হাজারের কম হবে না। তবু ভগ্নীপতি জেদ করেছেন—পড়াশুনো ছেড়ো না। যত শীঘ্র পার, ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে চলে এস।

চিঠিখানা পেয়ে বেশ ফূর্তি হল। যাক, তাহলে আর অন্নচিন্তায় দেহপাত করতে হবে না! লণ্ডনে ফিরেই এক মাষ্টার রাখলাম। তাঁকে নিয়ে ছটী মাস হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে bar-এর পরীক্ষাগুলো শেষ করলাম। আর বিলেত ভাল লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল, পালাতে পারলে বাঁচি। যত শীঘ্র সম্ভব, পালালাম।

দেশে ফিরে কিন্তু বিশেষ সুবিধা পেলাম না। বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী নানা রকমের, নানা বয়সের, আত্মীয়-কুটুম্বের দখলে। তাঁরা অনুগ্রহ করে আমার জন্যে তেতলায় দুটো ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন। দিদিরা বিদেশে, আপন আপন শ্বশুর-ঘরে।

এক বড় ভগ্নীপতি কলকাতায় এসেছেন আমাকে স্বাগত করতে। তিনি উপদেশ দিলেন—ও বাড়ীতে ঢুকো না, ভায়া। মাসহারা দিতে দিতে জান যাবে।

গ্রাণ্ড হোটেলে আশ্রয় নিলাম। পরদিন আপিসে সুরেশ-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বেশ একটু রূঢ়ভাবে বললেন—বিলেতে ত দাঁড়টানা, পাহাড়-চড়া, ঘুষোঘুষি, খুব শিখে এসেছ শুনলাম। এইবার একটু আইন-টাইন পড়। কাজ দেব বই কি!

বাবার বন্ধু অন্য বড় বড় এটর্ণীদেরও সেলাম বাজাতে গেলাম। তাঁরা বরং মৌখিক ভদ্রতা খানিকটা দেখালেন। বিলেতের গল্প-টল্প শুনলেন। কিন্তু কাজ দেওয়ার নাম কেউ করলেন না। বললেন—বেশ করে পড়াশুনো কর।

দিদিদের কাছে একবার ঘুরে এলাম মাসখানেক। তাঁরা দুজনেই অনেক চোখের জল ফেলে বললেন—ভালয় ভালয় ফিরে এসেছিস, ভাই। এইবার বিয়ে-থা কর। বাবার সংসার বজায় থাকুক।

আমি হেসে জবাব দিলাম বটে—আমি ত টোপর পরেই বসে রয়েছি। তোমরা রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্বের সন্ধান কর।

কিন্তু বংশ রক্ষার নামে বুক দুড় দুড় করে উঠল। বড় ভগ্নী-পতি আমার সঙ্গে কলকাতায় আসছিলেন। তাঁকে অনুনয় করে, ভয় দেখিয়ে, বললাম—দিদিদের কয়েক বছর ঠেকিয়ে রাখ,

জামাইবাবু। নইলে, বেশী হুজ্জৎ কর ত পালাব। এমন পালাব, যে কোন সন্ধান পাবে না।

তিনি হেসে আশ্বাস দিলেন—না হে না! তোমার ভয় নেই। তোমাকে বিয়ে করবে কে?

বছরখানেক লাগল আমার সব গোছগাছ করতে। জামাই-বাবুর সাহায্য না হলে কিছুই হত না। তিনি জবরদস্তী করে বসত বাড়ীখানা বেচে ফেললেন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকায়। তারই হাজার পনের ঘুষ দিয়ে কুটুম্বমণ্ডলীকে গঙ্গা পার করে দিলেন। কাউকে পাঠালেন কাশীধাম, কাউকে বৃন্দাবন, কাউকে শ্রীক্ষেত্র। পৈত্রিক আসবাব-পত্র যা ছিল, তার বেশীর ভাগ বেচে ফেললেন নিলামে। বাকী পার্ক-ষ্ট্রীটে এক তেতলার flat-এ সাজিয়ে গুছিয়ে সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলেন। দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। যাবার সময় চোখ টিপে বলে গেলেন—মনের মতন কনে পেলে খবর দিও হে! এসে তখন বাড়ী কিনে দিয়ে যাব।

হাইকোর্টে নিয়মিত এগারটা পাঁচটা হাজরে দিই। ঐ কঘণ্টার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর কাটে টিফিনের সময়টা। বন্ধুবান্ধব নিয়ে রীতিমত হাল্লা করে হোটেলে জলযোগ করি। বাকি সময়টা বড়ই dull, একঘেয়ে, লাগে। লাইব্রেরীতে চেঁচামেচি করবার জো নেই, সিনিয়ারেরা বিরক্ত হন।

পাঁচ বছর পরে একদিন নোটবহি খুলে রোজগারের হিসাব করতে বসলাম। দায়রার মোকদ্দমা defend করে একবার

আদালত থেকে একশো টাকা পেয়েছিলাম। সুরেশবাবু দুবার দুই মোহর করে ফী লিখে ব্রিফ দিয়েছিলেন। কিন্তু মোট চল্লিশ টাকার বেশী আমার ট্যাঁকে আসে নেই। পার্ক-ষ্ট্রীটে আমার বাসার একতলায় যে মোটরের দোকান আছে, তাদের খুচরো কাজ ছোটো আদালতে করে দিয়ে ষাট টাকা পেয়েছিলাম! সবসুদ্ধ হল দুশো টাকা।

ইতিমধ্যে একখানা অষ্টিন গাড়ী কিনেছি। আদালত বন্ধ হলেই লম্বা লম্বা পাড়ি দিই। কখন রাঁচি, কখন হাজারীবাগ, কখন বা গয়া। একবার দিল্লী পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছি। কলকাতায় থাকলে সকালবেলা লেকে দাঁড় টানি, বিকেলে হাইকোর্ট ক্লাবে টেনিস খেলি। শিকারের মৌসুমে শহরের আস-পাসের জলাতে হাঁসটা স্নাইপ-টা মারতে যাই। আর কিছুদিন এই রকম বেকার বসে থাকলে বাঘ ভাল্লুকও মারতে আরম্ভ করব। নইলে সময় কাটবে কি করে? ব্রিজ, পোকার্ ত কিছুতেই তেমন শিখতে পারলাম না!

প্রথম বছর দুই খুব নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াতাম। কিন্তু যখন বুঝলাম যে নিমন্ত্রণ পার্টিগুলো স্বয়ংবর সভা বই আর কিছু নয়, তখন একেবারে ভড়কে গেলাম। আমার মতন একটা আস্ত চোয়াড়ের সঙ্গে এই রকম একটী রঙ্গকরা মোমের পুতুলকে বেঁধে দিলেই হয়েছে আর কি! এখন লোকে বলে বেরসিক। তখন বলবে—Beauty and the Beast!—পরীরাণী ও পশুরাজ!

আর মেয়েমহলে বড একটা মুখ দেখাই না। পালিয়ে

পালিয়ে বেড়াই। বন্ধু বান্ধবের ত আর অভাব নেই! চলে যায় এক রকম। আমার flat-এ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রাখি নেই। ডিনারটা রোজ খাই ফিরপোর কাফীখানায়। তা, একা খেতে হয় না কোন দিন। মোটর সফরেও দুই একজন সঙ্গী ঠিক জুটে যায়! আমার বন্ধুভাগ্য ভাল।

কিন্তু এ ভাবে আর কত দিন চলতে পারে! জীবনটা বড্ড কেমন এক-ঘেয়ে মনে হতে লাগল। কি করা যায়? দিদিদের লিখব না কি? তারা ত অনেকগুলি জীইয়ে রেখেছেন, শুনতে পাই। নাঃ, এরই মধ্যে কাজ নেই উদ্বন্ধনে। I mean, উদ্বাহ-বন্ধনে। বছর খানেক বিলেতটা আবার ঘুরে আসি। টমাস কুক কোম্পানীকে হুকুম দিলাম—তোমরা সব বন্দোবস্ত কর। আমি এক বছরে উরাল থেকে পিরিনীজ পর্য্যন্ত সব পাহাড়গুলো চডব।

শুভদিনে, অর্থাৎ এক বৃহস্পতিবারে, বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার আগে দক্ষিণ বাহু বার দুই স্পন্দিত হল! অহো! শান্তং ইদং আশ্রমপদং। স্ফুরতি চ বাহু। কুতঃ ফলং ইহাস্য? আমি কি তখন জানি যে অতনু ঠাকুরটী ফুলধনুতে শর যোজনা করে হাওড়ার পুলের মুখে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন! আচ্ছা, আমি কি সত্যি বেরসিক?

উঃ! কি গরম আজ! কলকাতার পিচের রাস্তাগুলো তেতেছে যেন সাহারার বালি! হাওয়া ছুটেছে যেন মরুর সাইমুম! চোখে খরতালের মতন কালো চশমা এঁটে চলেছি আমি হাওড়ার পানে। ষ্ট্রাণ্ড থেকে পুলের দিকে যেই বাঁয়ে মোড় ফিরেছি কি

আমার গাড়ীর টায়ার করলে ভীষণ skid। আমি হলপ করে বলতে পারি, মশায়, আমি তখন তিরিশ মাইলের বেশী জোরে যাচ্ছিলাম না। রাস্তায় কিছু তেল-টেল পড়েছিল, বোধ হয়। নইলে skid করবে কি করে? যাক, ঠিক সেই সময়টা গাড়ীকে রুখতে পারলাম না। বোঁ করে ঘুরে গিয়ে মারলে ধাক্কা এক টেক্সীকে। তবু আমার হাতে হুইল ছিল বলেই টেক্সীটা বেঁচে গেল। Mudguard-এর উপর দিয়েই গেল। ওখানে অ-জায়-গায় টেক্সী দাঁড়ায়ই বা কেন? আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম ঝগড়া করব বলে। কাছে গিয়ে দেখি, গাড়িতে ড্রাইভার নেই, ভেতরে এক রাশ লগেজের মাঝে বসে একটী বাঙ্গালীর মেয়ে। কি রকম দেখতে? কত বয়স? বলতে পারি না, মশায়, নজর করি নেই। তিনি হেসে বললেন, "আপনি ত চমৎকার গাড়ী হাঁকান! বেশ neatly—বেমালুম ধাক্কাটা মারলেন।"

আমার কেমন লজ্জা হল। আমতা-আমতা করে উত্তর দিলাম "এমন অ-জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়েছেন! আপনার ড্রাইভার কোথায় গেল?"

"অ-জায়গা কেমন করে হল, মশায়? ফুটপাথে লাগিয়ে বাঁ-দিক ঘেসে ত দাঁড়িয়েছি! আমার ড্রাইভারের কথা জিজ্ঞেস করছেন? বেচারা পুলিসের খর্পরে পড়েছে। ঐ দেখুন না পানের দোকানের সুমুখে দাঁড়িয়ে কনষ্টেবলের সঙ্গে রহস্যালাপ করছে। আপনি তা হলে এখন আসুন। আবার কাউকে ধাক্কা মারবেন না যেন!"

মেয়েটীর বড় সুন্দর হাসি। আর, কচি কলাপাত রঙ্গের oil silk-এর স্বচ্ছ বরসাতী কোটটা পরে এমনি মানিয়েছিল! বললাম, "আপনি কি হাওড়া যাচ্ছেন? চলুন না, আপনাকে পৌছে দিই।"

মেয়েটি মধুর হেসে হাত বাড়িয়ে উত্তর দিলে, "না মশায়, আপনার মতন খুনে লোকের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ভরসা হচ্ছে না। আমার ড্রাইভার ছাড়া পেয়েছে, ঐ আসছে। গুড বাই।"

কি আর করব! আমিও, গুড বাই বলে সরে গিয়ে নিজের গাড়ীতে বসলাম। তার পর, টেক্সীখানার দিকে দুই একবার বোকার মতন তাকিয়ে আপন পথে বেরিয়ে গেলাম। যেতে কেমন মন সরছিল না।

ষ্টেশনে পৌছে দেখলাম আমার দরোয়ান মাল-পত্র এক কুপে-তে চড়িয়েছে। কোট খুলে আরাম করে কাত হয়ে পড়লাম পাখার নীচে। বেজায় গরম বোধ হচ্ছিল প্লাটফরমে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, "মেয়েটি কোন ট্রেনে যাচ্ছে, কে জানে! হয় ত বেচারা ট্রেন মিস্ করবে। আমি ত বললাম, আসুন পৌছে দিই। আমার দোষ কি? Awfully nice girl, দিব্যি মেয়ে! মোটরে ধাক্কা লাগল, তবু দৃকপাত নেই। ঐ নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা করলে! আমাদের রঙ্গমাখা society doll (পুতুল) হলে কেঁদে ধরা ভাসাত।"

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। গার্ড বাঁশী ফুঁকলে। টেন ঝিকি

ঝিকি করে রওয়ানা হল নাগপুরের পথে। আচ্ছা, বিলেত যাচ্ছি ছুটিতে, অথচ আমার সে রকম আনন্দ হচ্ছে না কেন? আমার আবার পিছু টান কিসের।

গভীর রাত্রে, আমরা সিনি জংশন ছাড়ার পর, হঠাৎ ক্যাঁচ্ করে vacuum ব্রেক কষার আওয়াজ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল ময়দানের মাঝখানে। আমি জেগে বসে ছিলাম। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে গার্ড আর চাকর-বাকররা লণ্ঠন হাতে ছুটোছুটি করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হল, গার্ড? এখানে থামলে কেন?"

গার্ড উত্তর দিলে, "সেকেণ্ড ক্লাস মেয়েদের গাড়ীতে একটী বাঙ্গালী মহিলা ভয় পেয়ে alarm-শেকল টেনেছেন।"

আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। গার্ডের সঙ্গে গিয়ে দেখি সেই মোটরের মেয়েটী সেকেণ্ড ক্লাস ladies-এর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটুও ভয় পেয়েছে বলে ত মনে হল না! আমাকে দেখে হেসে উঠল, "এ কি! আপনি কোথা থেকে এলেন?"

অমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছিল, বলুন দেখি!"

"কিছু না। গাড়ীতে কে একটা কোট পেণ্টুলুন-পরা দাড়ী-ওয়ালা ঢ্যাঙ্গা লোক উঠেছিল। আমার সুটকেস ধরে টানাটানি করছিল। যেই আমি, কৌন হ্যায়, ক্যা করতে হো, বলে চেইনটা টেনেছি, কি সে বেরিয়ে পালাল।"

গার্ড বললে, "অনেক খোঁজ করেছি, মিস্। ও রকম কাউকে ত ট্রেনে দেখতে পেলাম না। বোধ হয় লাফিয়ে পড়েছে। আজ

কাল এই ধরণের চুরী অনেক হচ্ছে। আপনার এ গাড়ীতে একা থেকে কাজ নেই।" আমিও গার্ডের কথায় সায় দিলাম।

মেয়েটী খুব হাসতে লাগল। আমাকে ঠাট্টা করে বললে, "আপনি কি আমাকে অবলা নারী ভেবেছেন না কি? চোর মশায়কে একবার ধরতে পারলে তার ডান হাত খানি চুরমার করে দিতাম। টাকাগাকি সান-এর সাকরেদ আমি, তা জানেন?"

গার্ড আমাকে কানে কানে বললে, "Plucky girl that, sir, বাহাদুর মেয়ে, মশায়! কিন্তু ওঁকে একলা থাকতে দেবেন না। চোরটার সঙ্গীরা হয়ত এই ট্রেনেই রয়েছে।"

আমি আমার একখানা কার্ড বার করে মেয়েটীর হাতে দিয়ে বললাম, "আমি রসিক মৈত্রেয়, ব্যারিষ্টার। আমাকে অনুমতি করেন ত সকাল পর্য্যন্ত এই গাড়ীতে আমি থাকি।"

মেয়েটী তার কার্ড আমাকে দিয়ে বললে, "আমার নাম মৈত্রেয়ী সেন। আমি বোম্বাইয়ে চাকরী করতে যাচ্ছি। বয়স তেইশ বছর। এম এ পাশ করেছি। জুজুৎসু জানি। গার্ল গাইডের অফিসার। আমি বডি-গার্ড নিয়ে রেলে যাতায়াত করলে আমার ইজ্জতের হানি হবে।"

আমি না-ছোড়-বান্দা। বললাম, "ধরুন, মিস্ সেন, আমারই ভয় করছে, একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আজকের রাতটা আপনিই আমাকে পাহারা দিন।"

মৈত্রেয়ী ইংরেজীতে বললে, "মেয়েদের গাড়ীতে আপনাকে গার্ড আসতে দেবে কেন?"

গার্ড একটু হেসে বললে, "না ম্যাডাম, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

আমি দুচারটে প্রয়োজনীয় জিনিস আমার কুপে হতে নিয়ে এসে মৈত্রেয়ীর গাড়ীতে উঠে বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিলে পর আমি তাকে বললাম, "এইবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন, মিস্ সেন। আমি আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে এই কোণটায় বসি।"

মৈত্রেয়ী আবার হেসে উঠল। হাসিটা দেখছি ওর রোগ! এ মেয়েকে কোন ষ্টুপিড একজামীনার এম-এ পাস করে দিয়েছে, জানি না। আমার ত মনে হয় না, ওর বয়স কুড়ির বেশী। কি কাণ্ড করলে, শুনুন। উঠে এসে মাঝখানের বেঞ্চে ঠিক আমার সুমুখে বেশ করে বসল। তার পর হাত জোড় করে বলতে লাগল, "মৈত্রেয় মহাশয়! আমার কতকগুলো অনুরোধ আছে, আপনাকে রক্ষা করতে হবে। প্রথম, আমাকে আপনি মৈত্রেয়ী বলে ডাকবেন। আর, আপনি আপনি করবেন না। রাজী আছেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "সহজেই। কেন না, তোমাকে সেই মোটরে দেখে অবধি কেবলই মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার চিরদিনের পরিচিত।"

"আর জন্মে দেনা-পাওনা কিছু ছিল বোধ হয়, মিষ্টার মৈত্রেয়। নইলে আপনার নাম মৈত্রেয়, আমার নাম মৈত্রেয়ী, হল কি করে?"

"দেখ মৈত্রেয়ী, আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি এম-এ পাস করেছ।"

"কেন, আমি চপল স্বভাব বলে? আমার দাদা ত আমাকে ঐ কথা বলে গালাগাল দেন। তবে তিনি কথাটা উচ্চারণ করেন্—ছ্যাপলা। এম-এ পাস আমি করেছি। প্রমাণ এই দলীলখানা। দেখুন না।" বলে সুট-কেস খুলে ডিপ্লোমা বার করে আমার হাতে দিলে।

আমি কাগজখানা দেখে ফেরৎ দিয়ে বললাম, "মৈত্রেয়ী সেনের ডিপ্লোমা বটে!"

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। বললে, "আমার নাম মৈত্রেয়ী সেন নয়? আমি কি তাহলে মৈত্রেয়ীকে খুন করে তার কার্ড, তার ডিপ্লোমা, তার নাম লেখা লগেজ, সব নিয়ে এসেছি? আপনি ত ভয়ানক লোক মশায়! আপনি কি ব্যারিষ্টার, না টিকটিকি পুলিস?"

এইবার আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, "রাগ কোরো না, ভাই মৈত্রেয়ী। হাইকোর্টের মানুষ কি না! তাই মনটা সদাই সন্দিগ্ধ। তুমি কি বলছিলে, বল।"

মৈত্রেয়ী আবার জোড় হাত করে বললে, "আমাকে আপনার সামনে শুয়ে ঘুমোতে আদেশ করবেন না। আমি একেলে মেয়ে বটে, তবু, কি জানেন, কাজটা ঠিক সুশোভন হবে না! তার চেয়ে আসুন, দুজনে বসে গল্প করা যাক। দেখতে দেখতে রাতটা কেটে যাবে।"

"তার পর? সূর্য্য উঠলেই আমাকে আমার সেই কুপে-তে ফিরে যেতে হবে ত?"

"সে, সকাল-বেলার কথা সকাল-বেলায় দেখা যাবে। আমি তাহলে বসি? আমার সঙ্গে গল্প করবেন ত?"

"Right-O! তুমি কোথায় যাচ্ছ, মৈত্রেয়ী, সেইটে আগে বল।"

"আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বোম্বাইয়ে চাকরী করতে যাচ্ছি কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। ইচ্ছা করছে নাগপুরে নেমে পড়ে ফিরতি মেলে কলকাতা ফিরে যাই। আমি জন্মে কখনও কলকাতার বাহিরে থাকি নেই। নিরামিষ হিঙ্গ-গন্ধ গুজরাতী খাবার রোজ খেতে হবে মনে করে আমার কান্না পাচ্ছে। এই ত হল আমার ইতিহাস। এইবার, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, বলুন।"

"এক বছরের জন্য বিলেত, যাচ্ছি, মৈত্রেয়ী। সাধ মিটিয়ে পাহাড় চড়ব বলে।"

"কেন? মিসেস মৈত্রেয়র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি!"

"No Mrs. Maitreya, my dear lady—মিসেস কেউ আজও জোটেন নেই।"

"তবে পাগলের মতন পাহাড় চড়তে যাচ্ছেন কেন?"

"কেন যাচ্ছি? জীবনটা একঘেয়ে লাগছিল বলে। কিন্তু আমার মত বদলে গেছে। আমি যাব না। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি দুই একদিনে। তুমিও ফিরে চল, মৈত্রেয়ী। দাদার সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে! ছি!"

মৈত্রেয়ীর চোখ ছল ছল করে উঠল। বললে, "আমি কি ঝগড়া করতে চাই, মিষ্টার মৈত্রেয়? তবে আমাদের মোটে মতে মেলে না। ওঁরা ভয়ানক গোঁড়া ব্রাহ্ম। ওঁদের মতে মেয়ে-ছেলে হাসবে না খেলবে না, দিবারাত্রি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবে। একবার আমি নাচ শিখতে আরম্ভ করেছিলাম বলে দাদা কেবল মারতেই বাকী রেখেছিল। বৌদি সাত দিন কথা বলে নেই আমার সঙ্গে।"

আমার বড় কষ্ট হল মেয়েটির জন্য। এত youthful, এত lovely মেয়ে, সে মুখ গোম্‌শা করে দিনরাত বসে থাকতে পারবে কেন! ওর দাদা must be a howling idiot—একটি আস্ত গর্দ্দভ! কত গল্প করে, কত রকম হাসি ঠাট্টা করে মৈত্রেয়ীকে শান্ত করলাম। একটা ইংরেজী কমিক গান পর্য্যন্ত গাইলাম! তার পরে মৈত্রেয়ীও গান গাইলে দু তিনটা। বেশ আনন্দে সময় কেটে গেল।

ভোর বেলা রায়পুরে ছোট হাজরী এসে উপস্থিত হল। চা খাওয়া হলে আমার সঙ্গিনী হুকুম করলেন, "এইবার নিজের গাড়ীতে যান। দিনের বেলায় ত আর আমাকে পাহারা দিতে হবে না!"

"তাড়িয়ে দিচ্ছ, মৈত্রেয়ী! আমার সেই আড়াই ফুট কুপে-তে ফিরে, হয় দম আটকে মারা যাব, নয় ত একা-একা বসে টেলিগ্রাফের থাম গুণতে গুণতে পাগল হয়ে যাব।"

"না না মশায়, পাগলও হবেন না, দম আটকেও মরবেন না।

তবে সারা রাত ঝিল্লীপনা করে মশায়ের চেহারাটা যা হয়েছে! একবার উঠে আয়নায় মুখ দেখুন না। একটু অঙ্গরাগের প্রয়োজন হয়েছে।"

"ওঃ! I see! তাই বল না! তোমার নিজের দরকার হয়েছে আধ ঘণ্টা পাউডার রুজ্ নিয়ে বসবার! তুমিও ঐ ব্যাপার, মৈত্রেয়ী! I never thought—"

"আপনার কিছু think করে কাজ নেই। এখন সরে পড়ুন। না হয় ব্রেকফাষ্টের সময় এসে আমাকে খেতে নিয়ে যাবেন। জানেন ত, আমি ইস্কুল মাষ্টার? রোজ মেয়েদের শেখাই—উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ। আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।"

"Hallo! আমি শিশু?"

"নয় ত কি!"

"আচ্ছা, দেখা যাবে!" বলে তর্জ্জনী তুলে শাসিয়ে ধীরে ধীরে নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। উঠেই বিদ্যুৎবেগে প্রসাধন-ক্রিয়া সমাধা করে নিলাম। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই আবার দৌড়লাম Ladies কামরার দিকে। দোয়ার ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগান, জানালায় সব ঝিলমিলি ফেলা। আমি বাহিরে থেকে চেঁচিয়ে বললাম, "মিস্ সেন, শিশু মুখ ধুয়ে নিজ বেশ পরিধান করে উপস্থিত।"

গম্ভীর গলায় জবাব এল, "আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ —বলেছিলাম না!"

আমি বললাম, "আমার পুস্তক যে এই কামরায়!"

মৈত্রেয়ী হেসে উত্তর দিলে, "এখন পালান। পরের ষ্টেশনে আসবেন কেতাব খুঁজতে।"

আমি গট্‌গট্‌ করে ফিরে গেলাম নিজের কামরায়। একটু রাগ হয়েছিল। ঠিক রাগ নয়—অভিমান। Edgar Wallace-এর একখানা নভেল খুলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাল লাগল না। Fancy! ভাল লাগল না! একশো চার ডিগ্রী জ্বর নিয়ে Edgar Wallace পড়েছি। Maurois-র নূতন ফরাসী নভেলখানা ছিল। সেটা খুললাম। No use, একটা পাতাও পড়তে পারলাম না। চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম, "লক্ষণ সমস্তই সুস্পষ্ট। রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার বদ্দি ডাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আসল কথা এখন ঔষধ জোগাড করা। বিলেত যাব না। That's settled। Damn the Ural mountains—জাহান্নমে যাক পাহাড় পর্ব্বত।"

গাড়ী থামতেই দৌড়লাম Ladies কামরার দিকে। মৈত্রেয়ী জানলায় বসে হাসছে। জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আপনার একটু রাগ হয়েছিল, না? খুব ছেলেমানুষ যাহোক! আসুন ভেতরে। পরের ষ্টেশনেই ত ব্রেকফাষ্ট খেতে নামতে হবে!"

আমি উঠে বসলাম। গাড়ী ছাড়ল। হঠাৎ একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেললাম। মৈত্রেয়ীর ডান হাতখানি খপ করে ধরে ফেললাম, "তুমি কি করে জানলে আমার রাগ হয়েছিল?"

সে হাত টেনে নিলে না। হেসে উত্তর দিলে, "নভেল-নাটক অনেক পড়া আছে কি না! এ রকম ক্ষেত্রে একটু রাগ হয় বলেই পড়েছি। কিন্তু আপনি হাতখানা ছাড়ুন। বড় লাগছে। নইলে এখনই আবার alarm চেইন টানব।"

"লাগছে? কি রকম লাগছে, ভাল না মন্দ? চেইন টান না! আমিও বলব, সারারাত পাহারা দিয়েছি, একবার হাত ছুঁলেই দোষ!"

"আমি কি মহাশয়কে পাহারা দিতে ডেকেছিলাম না কি? যাক, ঝগড়া করে কাজ নেই। অনেকক্ষণ ত হয়েছে! এইবার হাত ছাড়ুন।"

সমস্ত details আপনাদিগকে বলে আর কি হবে! তবে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে নুন নিতে, গোল মরিচ নিতে, মাখন এগিয়ে দিতে, বার বার হাতে হাত ঠেকতে লাগল। এত বার এটা ঘটল, যে তাকে অকস্মাৎ ঘটনা বলা চলে না। মৈত্রেয়ী তবু রাগ করলে না। বরং মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। একটা point তাহলে আমি জিতলাম! হাতে হাত দেওয়ার অধিকারটা সাব্যস্ত হল।

ব্রেকফাষ্ট শেষ হলে খুব মনের আনন্দে Ladies কামরার দিকে চললাম মৈত্রেয়ীকে নিয়ে। এবার তাড়িয়ে দিলেও যাব না। চেইন টানলেও যাব না। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথাটা ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। কামরার ভেতর দেখি এক পেসেঞ্জার উঠে বসেছেন। ইংরেজ মহিলা, ষাট বছর

বয়স। মুখের ভাবটা, যেন এই মাত্র কাঁচা নিমপাতা চিবিয়েছেন! বোধ হয়, পাদরী মেম। আমি আমার সঙ্গিনীর হাত ধরে টানা-টানি করতে করতে বললাম, "চল, আমার কুপে-তে চল।"

মেমটা কটমট করে তাকাতে লাগল। তার সেই দৃষ্টি মৈত্রেয়ীর **modernism** এর বর্ম্ম ভেদ করে, বোধ করি, আঁতে বিঁধল। কেন না, সে হঠাৎ রাঙ্গা হয়ে উঠল। "ছিঃ! ছেড়ে দাও।" বলে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে। এক লাফে কামরার ভেতর গিয়ে কোণে বসে পড়ল।

আমি আমার কুপে-তে ফিরে এসে খুব জোর চিন্তা করতে লাগলাম। আর এক point জিতলাম না কি? Why that blush? কেন ছেলেবেলায় রবিবাবুর কবিতা-টবিতাগুলো পড়ি নেই? তাহলে ঠিক বুঝতে পারতাম। কিন্তু মৈত্রেয়ীর মুখে সেই রক্তের ঝলক, সেই গোধূলি রাগ, কি সুন্দর! How lovely! ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতে পারি নেই। ভীষণ কলরবে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মস্ত ষ্টেশন। কুলীরা হাঁকছে, নাগপুর! নাগপুর! লাফিয়ে নেমে ছুটলাম মৈত্রেয়ীর কামরার দিকে। দেখি, সে একা বসে রয়েছে। যেন কি ভাবছে। আমার পানে চেয়ে একটু হেসে বললে, "পাদরী মেমটা নেমে গেল কাম্পটী-তে। আমি তোমাকে খবর দিতে গেছলাম যে! কিন্তু তুমি এমন নিভাঁজে ঘুমোচ্ছিলে, যে মায়া হল। ডাকলাম না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছিলে। কি স্বপন দেখছিলে গা?"

"কি স্বপন দেখছিলে গা!" কি জবাব দেব এ প্রশ্নের? সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছে। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ী পিটছে। এ কি! মিষ্টার জষ্টীস্ Eros-এর, মদন দেবের, এজলাসে আমার মোকদ্দমা কি এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? আর সেই মোকদ্দমা জিতলাম কি না আমি, চিরদিনের বেরসিক ব্যারিষ্টার!

মৈত্রেয়ীর দুই হাত চেপে ধরে কোন রকমে বললাম, "মৈত্রেয়ী, কলকাতায় ফিরে চল, লক্ষ্মীটী!" সে কথা কইলে না, কিন্তু তার চোখ দুটী বুজে এল।

গিন্নী জানেন না যে আমি এই গল্প লিখছি। How jolly! কি মজা!

শ্যামচাঁদ

সেদিন থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" দেখে ময়দানের পথে ফিরে আসতে আসতে কথাটা মনে হচ্ছিল। এই যে মাথার উপরে নীল আকাশে জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ-তারা কেবলই ঘুরছে, এদিকে কি সত্যি সুন্দর বলা যায়? এরাও ত নিয়মের দাস, মোটা মোটা হরফে ছাপা নি—য়—ম! রেলগাড়ীকে যেমন বাঁধা লোহার রাস্তায় চলতে হয়, এদেরও ত তাই। একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। সূর্য্যের মতন যে একটা অত বড় শক্তির আধার, তাকেও মালিকের হুকুমে সকাল-সন্ধ্যা উঠতে হয়, ডুবতে হয়, প্রতি বছর উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন করতে হয়। বেচারা চাঁদের ত কথাই নেই। প্রতিমাসে একবার জন্ম থেকে মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত পালাটা অভিনয় করে মানুষকে দেখাতে হয়। ভাবছি, এমন সময় একটা পাগলা তারা চোখ ঝলসে দিয়ে পশ্চিম আকাশ আলো করে ছুটে উত্তর মুখে চলে গেল, তীরের মতন বেগে বেরিয়ে গেল। কত দূর ছুটল, কে জানে! হয়ত বহু দূর গেল, হয়ত বা কাশীপুর বরাহনগর পৌঁছেই নিবে গেল। কিন্তু আর ফিরবে না। নিয়মের ধার ধারে না সে। এ যেন সৌরজগতের বাচ্চা-ই-সাকো। উল্কা তুমি যথার্থ ই সুন্দর, সত্যিই চমৎকার! হলই বা তোমার অজানা কুলশীল। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।

গাড়ী চলেছে। আমি চোখ বুজে আকাশের এই খসা-তারা আর কাবুলের সেই ভিস্তির ছেলে, দুজনার কথা ভাবছি। ভাবতে ভাবতে আমার হঠাৎ মনে পড়ল ছেলেবেলাকার এক ভবঘুরে বন্ধুকে। জন্ম তার আসমানেও নয়, কাবুলেও নয়, এই নগণ্য বাঙ্গালা মুলুকে। শ্যামচাঁদ অতি সামান্য লোক ছিল, কিন্তু সেও নিয়মের জগদ্দল পাথরটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল এই নির্জীব তাসের দেশে।

শ্যামচাঁদের সত্যি নাম কি ছিল, তা আমাদের পাড়ার কেউ জানত না। রোগা দীর্ঘ দেহ। মেরুদণ্ড লাঠির মত সোজা। গায়ের কোথাও এতটুকু চরবী মাংস নেই। বড় বড় চোখ, ভাঙ্গা গাল। রঙ্গ বোধ হয় ছেলেবেলায় ফরসা ছিল, কিন্তু সে আমরা দেখি নেই। জামা বড একটা পরত না। চাদরের ভেতর থেকে উঁকী মারত দুধের মত সাদা পৈতার গোছাটা।

আমার জন্ম পাডা-গাঁয়ে। যখন বাবা চাকরী পেয়ে কলকাতায় এসে বাস করলেন, তখন আমার বয়স বছর বারো। শহরের মাঝ বরাবর এক ভদ্রপল্লীতে আমরা বাসা করলাম। গলিটা আঁকা-বাঁকা, লম্বা। আমাদের বাড়ী বড় রাস্তার দিকটায়। অন্যদিকে এক বস্তী ছিল। সেখানে খেলার ঘরে নানা জাতের লোক থাকত, বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। দু চার ঘর ধাঙ্গড়ও ছিল।

আমাদের পরিবারে তিনটী মাত্র লোক। বাবা, মা, আর

আমি। এক শনিবার রাত্রে আমরা কলকাতায় পৌঁছলাম। রবিবারটা সারাদিন গেল সব গোছগাছ করতে। সোমবার তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে বাবা আপিস চলে গেলেন। আমরাও চটপট খেয়ে নিলাম। ঠিকে-ঝি বাসন-কোসন ধুয়ে রেখে ভাত নিয়ে চলে গেল। কলকাতা চোর-ছ্যাঁচড়ের দেশ। তাই ঝি বেরিয়ে যেতেই মা সদর দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে ভেতরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, "খোকা, রাস্তায় বার হস না যেন।" আমি বাহিরের ঘরে এক শ্লেট পেনসিল নিয়ে ছবি আঁকতে বসলাম। একটা বেজে গেছে। পাড়া নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে বড় রাস্তা থেকে ট্রামের আওয়াজ আসছে। আমি বসে একমনে হিজিবিজি কাটছি, এমন সময় জানালা থেকে কে বললে, "কি হচ্ছে, খোকাবাবু?" চেয়ে দেখি একজন মস্ত ঢেঙ্গা লোক গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে এক ময়লা উড়ানী। ভাঁটার মতন দুটো চোখ যেন গিলতে আসছে আমাকে। ভয় হল। "তোমরা কবে এলে গো, খোকাবাবু? আমি শ্যামচাঁদ।" বলে লোকটা সাদা ধবধবে দুপাটি দাঁত বের করে হেসে উঠল। বেশ মিষ্টি হাসি। তবু ভয় করতে লাগল। যদি ছেলে-ধরা হয়! ওরা ত কত জাদু জানে! কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কে? আমি ত আপনাকে চিনি না।"

"আমি শ্যামচাঁদ গো! আমাকে সবাই চেনে। একবার মা ঠাকরুণকে বল না গিয়ে।"

তাড়াতাড়ি মাকে ডেকে নিয়ে এলাম। তাঁকে দেখেই বামুন নমস্কার করে বললে, "মা গো, আমার খিদে পেয়েছে।"

মায়ের ত তখন বয়স বেশী হয় নেই। ঘোমটার ভেতর থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

বামুন জোড় হাত করেই ছিল। হেসে উত্তর দিলে, "আমি তোমার ছেলে, মা। আমার নাম শ্যামচাঁদ। পাশের বাড়ীর মায়ের ঠেঁয়ে শুনলাম তোমরা এসেছ। তাই মনে করলাম, আজ আমার নূতন মায়ের কাছে খাইগে।"

মা মাথার কাপড়টা একটু নামিয়ে হাসিমুখে বললেন, "তা বেশ ত বাবা, এস। ঘরে যা খুদ-কুঁড়ো আছে, খেয়ে যাও।"

শ্যামচাঁদ জানালা থেকে সরে যেতেই আমি চুপি চুপি মাকে বললাম, "মা, দোর খুলো না। যদি ছেলে-ধরা হয়!"

"পাগল ছেলে! আমি কি মানুষ চিনি নাকো রে!" বলতে বলতে গিয়ে মা সদর দরজা খুলে দিলেন।

"মা আমার অন্নপূর্ণা!" বলে শ্যামচাঁদ হেট হয়ে প্রণাম করলে।

মা, "বেঁচে থাক, বাবা," বলে আশীর্ব্বাদ করে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

শ্যামচাঁদ আমার দিকে ফিরে বললে, "এইবার চেনা-পরিচয় হল ত, দাদা! মাঝে মাঝে আসব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার বাড়ী কত দূর শ্যামবাবু?"

"আমি বাবু-টাবু নই রে, ভায়া। আমি শ্যামচাঁদ। আমার

বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করছ, ভাই ? আমার বাড়ী অসংখ্য। এই ত আমার একটা বাড়ী হল।"

মা খাবার বেড়ে নিয়ে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্যাম-চাঁদ ততক্ষণ উঠানের গঙ্গাজলের কলে হাত মুখ ধুয়ে, চাদর খুলে আসন-পীড়ি হয়ে বসেছে। বামুনের পৈতার গোছা নজরে পড়তে মা থালা নামিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, "বাছা, তুমি ব্রাহ্মণ ? সর্ব্বনাশ, এতক্ষণ বলতে হয় ! আর একটু হলেই তোমাকে কায়েতের ভাত খাইয়েছিলাম।"

শ্যামচাঁদ কোন উত্তর না দিয়ে থালাখানা কোলের গোড়ায় টেনে নিয়ে টপাটপ খেতে লেগে গেল। গরাস দুই চার খেয়ে বললে, "হ্যাঁ মা, এই তোমার খুদ-কুঁড়ো ! মা গো, এমন প্রসাদ যে রাজবাড়ীতেও মেলে না।"

খাওয়া হয়ে গেলে ব্রাহ্মণ থালা ঘটি বাটি কলতলায় মেজে এনে দিলে, মায়ের মানা শুনলে না। বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, "সদর দরজায় খিল দাও, দাদাবাবু। আমি বাইরের রোয়াকে একটু গড়িয়ে নিয়ে নিজের কাজে যাই। সন্ধ্যাবেলায় আসব এখন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।"

দোরে আগড় দিয়ে উঠানে আসতেই দেখি মা পাশের বাড়ীর গিন্নির সঙ্গে কথা কইছেন। তিনি তাঁদের দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে। শুনলাম, বলছেন, "বামুন, বড় ভাল ছেলে। কোন ল্যাঠা নাই। যেখানে খুশী খায়। যেখানে খুশী শোয়। চাল নেই, চুলো নেই। বলে, দেশে পরিবার আছে,

একটী ছোট ছেলে আছে। কিন্তু কোন কালে দেশে যেতে ত দেখি নেই। আমরা এক বছর হল এ পাড়ায় এসেছি। আজ সকালে আমাকে বলে গেল, পাশের বাড়ীতে যে নূতন মা এসেছেন, তাঁর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ।"

"কাজ-কর্ম্ম কিছু করে না?"

"কাজ-কর্ম্ম! আপনার আমার কর্ম্ম করতেই ত ওর সময় যায়। আর কাজ কি করবে? দুদিন দেখলেই বুঝতে পারবেন। এমন মা বলে ডাকে, যে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। সময় সময় ছোট ছেলের মতন বায়না ধরে, কিন্তু রাগ করবার জো নেই। কেঁদে পৃথিবী ভাসাবে তাহলে।"

মা বললেন, "আমার ত একবার দেখেই কেমন মায়া পড়ে গেছে।"

সন্ধ্যাবেলা বাবা এসে জলটল খেয়ে বাহিরের ঘরে আমাদের সঙ্গে গল্পস্বল্প করছেন, এমন সময় রোয়াকের উপর কে যেন বলে উঠল, "মা জগদম্বা!" মা বললেন, "ঐ আমার সেই পাগলা বামুন ছেলে এসেছে।"

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে গা?"

মা জবাব দিলেন, "একবার ডাকই না! নিজে চোখে দেখবে। আমাকে এরই মধ্যে যেন জাদু করেছে।"

বাবা একটু আনমনা ভাবে বললেন, "আশ্চর্য্য নয়। পাগলা ওরকম ব্যাকুল ডাক কোথা থেকে শিখলে!"

তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম, ব্যাকুল ডাক মানে কি তা

বুঝতাম না। কিন্তু এটা জানতাম যে বাবা রোজ ভোরে উঠে প্রায় ঘণ্টা দুই পূজা করেন, আর পূজার সময় "মা! মা!" বলে বার বার ডাকেন।

বাবা ডাকতেই শ্যামচাঁদ ভেতরে এল। এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে বললে, "বাবুমশায়, মা ঠাকরুণ শ্যামচাঁদকে ছেলে বলে গ্রহণ করেছেন। বড় ভাগ্যবান সে!"

বাবা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বামুন উত্তর দিলে, "নাম শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু শ্যামচাঁদ। পদবী নেই। বাড়ী বর্দ্ধমান জেলা, রায়না গ্রাম। এখানে কোথায় থাকি? কোথাও না, বাবু। অর্থাৎ সর্ব্বত্র। কি করে খাই? আমার খেতে ত পয়সা লাগে না, জগৎ জোড়া আমার মা জননী। যেখানে দেখা দিই, সেখানেই খেতে পাই।"

"লেখা-পড়া, কাজ-ধান্দা, কিছু শেখ নেই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কাজ ত অনেক রকম জানি। ঘড়ী বেগড়ালে চালিয়ে দিই। গ্রামোফোন মেরামৎ করি। মোটরের ব্যারাম হলে তাও একটু-আধটু চিকিৎসা করি।" এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বললে, "বাঙ্গলা পড়তে পারি। ইংরাজীতে পর্য্যন্ত নাম সই করতে পারি, মশায়।"

বাবা এতক্ষণ বামুনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। উঠে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা ত সব বুঝলাম। কিন্তু এমন মা বলে ডাকতে কার কাছে শিখলে, বল দেখি!"

"আমার মায়েরাই শিখিয়েছেন, বাবু। আর কে শেখাবে? প্রসাদ খেয়ে খেয়ে মুখ খুলে গেছে।"

বাবা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না সে দিন। শুধু বললেন, "এবেলাও তোমার মায়ের প্রসাদ চারটি খেয়ে যাও, শ্যামচাঁদ।"

"না বাবু, এত পুণ্যের জোর নেই। দুবেলা প্রসাদ সহ্য হবে না। আর একদিন প্রসাদ দিও, মা জননী।"

বাবা হেসে বললেন, "বামুনের ছেলে, মিছেমিছি জাতটা দিলে, পেটটা অন্ততঃ ভরাও।"

বামুন বাবা মাকে নমস্কার করে বললে, "মনে রাখবেন, বাবু। অধম সন্তানকে ভুলে যেয়ো না, মা।" বেরিয়ে যেতে যেতে আমাকে বললে, "খোকাবাবু, আমি খুব ভাল গল্প বলতে পারি, জান? একদিন শোনাব।"

এর পরে আবার কদিন শ্যামচাঁদের দেখা নেই। বোধ হয়, আমাদের ওদিকে আসেই নেই। পাড়ায় সুধীরবাবু বলে এক উকীল থাকতেন। তাঁদের মস্ত তেতলা বাড়ী। খুব নাম ডাক। ফটকে দরোয়ান, আস্তাবলে দুখানা মোটরগাড়ী। এ পাড়ার তাঁরা পুরানো বাসিন্দা। উকীল বাবু ভাল লোক। সুখে দুঃখে সকলে তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেন। বাবা একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন। গিয়ে শ্যামচাঁদের কথা অনেক কিছু শুনে এলেন। ফিরে এসে মাকে সব বললেন। আমিও সেখানে বসেছিলাম, কিন্তু সব কথা তখন বুঝতে পারলাম না। পরে ক্রমশঃ জানলাম, বুঝলাম।

শ্যামচাঁদের সত্যি নাম সুধীর বাবুও জানতেন না। তাকে পাঁচ বছর আগে প্রথম এ পাড়ায় দেখা যায়। তার পর আস্তে আস্তে সে সকলের সঙ্গে এমন ভাব করে নিয়েছে যে এখন সব বাড়ীতেই তার অবাধ গতি। গিন্নীদের সবায়ের সে ছেলে। দরকার পড়লেই সে ছোট বড় সবায়ের কাজ করে দেয়। যজ্ঞি-জ্বালাতে কুলির মতন খাটে, একাই একশো। কারও বাড়ী রোগ শোক হলে, বামুন হাযে-হাল হাজির, দিনরাত সেবা করেও এতটুকু ক্লান্তি নেই। আবার যখন হাতে কাজ নেই, চার পাঁচ দিন কোথায় উধাও হয়ে যায়। নিন্দুক লোকে বলে মদ খেয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু কেউ কোন দিন তার মুখে মদের গন্ধ পায় নেই। তার মা-জননীরা ত এ কথা উড়িয়েই দেন! বলেন, এমন সচ্চরিত্র ছেলে আর হয় না। গুজব, যে ছোকরা বড় ঘরের ছেলে,বাপ মা নেই, দাদা তাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা এই বিশাল কলকাতা শহরের কোন কোণে বাস করেন, তা কেউ জানে না। তিনি না কি খুব ভাল মিস্ত্রী, সাহেবদের বড় বড় কারখানায় কাজ করে দিয়ে বিস্তর টাকা রোজকার করেন। শ্যামচাঁদ নিজেও পাকা মিস্ত্রী। মোটর বলুন, ঘড়ি বলুন, গ্রমোফোন বলুন, সবেরই তুক-তাক জানে। আজকাল এ পাড়ার কেউ আর মেরামতির জন্য দোকানে যায় না। তবে ছোকরাকে কাজে বসানই দায়! এই দেখুন না, আমার আপিসের গাড়ীখানা খুলে টুকরো-টুকরো করে রেখে দিয়ে কোথায় ডুব মেরেছে, পাত্তা নেই! আজই হয়ত আসবে, সারা দিন খেটে গাড়ী চালু করে দেবে। কিন্তু

পয়সা নেওয়ার নাম করবার জো নেই। ভয়ানক রেগে যায়, বলে, "ছেলেও বলবেন, মজুরিও দেবেন, দুটোই হয় না, মশায়।"

এই রকম নানা গল্প করে সুধীরবাবু বাবাকে বললেন, "সত্যি, ওর গত জীবনের কথা আমরা কেউ কিছু জানি না। আলাপ পরিচয় হলে আপনিই ওকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

দুই এক দিন বাদে বামুন হঠাৎ এসে হাজির হল সন্ধ্যাবেলা। জানালা থেকে ডাক দিলে, "খোকাবাবু, মা কোথায় ?"

মা আমার কাছেই বসেছিলেন। জবাব দিলেন, "এই যে বাবা, আমি। তুমি কোথায় গেছলে কদিন ? বলে গেলে, আবার একদিন খেতে আসবে, আমি রোজই তোমার পথ চেয়ে থাকি।"

"বেঁচে থাকি ত সে ক্ষোভ তোমার রাখব না, মা। আজ দাও না চারটী খেতে ! সকাল থেকে ও কাজ হয় নেই।"

খেয়ে-দেয়ে বামুন আমার কাছে তক্তায় এসে বসল। কোণের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওটা কি, দাদা ?"

আমি বললাম, "গ্রামোফোন। নূতন রকমের কল, ওতে চোঙ্গা লাগাতে হয় না। কিন্তু sound-boxটা বিগড়েছে। ভাল আওয়াজ বেরোয় না।"

"সে ত সামান্য কথা। আমি কাল সকালেই ঠিক করে দেব। একটা বাজাও দেখিনি।"

আমি লাগিয়ে দিলাম, "মনেরই বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি।" শ্যামচাঁদ খুব মন দিয়ে শুনলে। গান হয়ে যাবার

পরও খানিকক্ষণ চুপটি মেরে চোখ বুজে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে রইল। তার পর "মা! মা!" করে উঠে পড়ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "শুনলে শ্যামচাঁদ, কি রকম ভাঙ্গা আওয়াজ!"

"ভাই রে! তুই এই বয়সে বুঝবি না। ও গান গাইতে গেলে নারদ ঋষিরও গলা ভেঙ্গে যায়।"

আমার রাগ হল আমাকে ছেলেমানুষ বললে বলে। "তুমি কলটার কিছু বুঝলে কি? ঠিক করতে পারলে কিছু, না কেবল বচন ঝাড়ছ?"

"কলের দিকে কি মন গেছ্‌ল, খোকা! একটা ব্যাণ্ড কনসার্ট লাগিয়ে দাও, শুনি।"

আমাদের বাজনার রেকর্ড বেশী ছিল না। একটা বেছে লাগালাম। এবার বামুন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কান পেতে শুনলে। শেষ হয়ে গেলে, sound-boxটা খুলে আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখে বললে, "কিছুই হয় নেই। অভ্রটা বদলে দিয়ে একটু ঠুকে-ঠেকে দিলেই আবার খন খন করে বাজবে। কাল সকালে ঠিক করে দিয়ে যাব।"

এমন সময় বাবা মা ঘরে ঢুকলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে শ্যামচাঁদ, খোকার সঙ্গে কি হচ্ছে?"

"কিছু না, বাবু। এই কলটা একটু বিগড়েছে। কাল মেরামৎ করে দেব।"

সেদিন বাবার সঙ্গে শ্যামচাঁদের অনেক কথা হল বাহিরের ঘরে বসে। মা খেতে গেলেন। আমি একখানা কেতাব নিয়ে

ভেতরের দালানে বসলাম কিন্তু কিছুতে পড়ায় মন বসল না। ভয়ানক ঝোঁক হয়েছিল শ্যামঠাকুরের ইতিহাস জানবার। বাবা তাকে সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কে আছে শ্যামচাঁদ ?"

"আজ্ঞে, আমার স্ত্রী আছে, একটী ছোট ছেলে আছে। তারা দেশে থাকে।"

"তোমার এক দাদা নাকি কলকাতায় থাকেন ?"

"সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন না, বাবু। তিনিও আমার নাম করেন না। আমিও তাকে ভুলে গেছি।"

"তাঁর কাছেই ত কাজ শিখেছিলে ?"

"কি কাজ ? কল-কবজার ? সে নিজের বুদ্ধিতে শিখেছি। দাদা ত অল্প বয়সেই—যাক, সে কথা কয়ে কি হবে ?"

"আচ্ছা, সে কথা আমি জানতে চাই না। আর একটা কথা বল। তুমি কি দীক্ষা নিয়েছ ?"

"দীক্ষা! গুরুমন্ত্র! আমাকে দীক্ষা কে দেবে, বাবু!"

"ও জবাব ত আমি শুনব না। অমন মা বলে ডাকতে তুমি কোথায় শিখলে ?"

"মায়ের কাছে শিখেছি, মশায়! ছেলে ও-ডাক ত মায়ের কাছেই শেখে।"

"তোমার মা বেঁচে আছেন ?"

"বেঁচে আছেন বই কি। আমার যে অনেক মা। ঘরে ঘরে আমার মা। সবাই ত এক। সবাই মিলে আমার মা, আমার জগৎ জোড়া করুণাময়ী মা!"

বাবা বললেন, "তোমাকে আমি সহজে ছাড়ছি না, শ্যামচাঁদ! আজ দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু আর একদিন বসতে হবে। অনেক কথা আমার জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

"বেশ ত, বাবু। যবে আদেশ করবেন, আসব।"

বাবা আর আমি ভিতরে শুতে গেলাম। শ্যামচাঁদ বাহিরে রোয়াকে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন ভোরে বাহিরের জানালা খুলতেই দেখি বামুন রোয়াকে বসে কি গুন গুন করে গান গাইছে। আদুড় গা, দেখে মনে হল স্নানটান সেরে নিয়েছে। হেসে বললে "দাদা দোর খোল ত! চাদরখানা ছাতে শুকোতে দিয়ে আসি। আর মায়ের কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে এস। অভ্র কিনে আনি। আজ তোমার কলটা ঠিক করে নিয়ে গোটা কয়েক ভাল ভাল গান শুনতে হবে।"

অভ্র এনে সারা সকালটা খেটে গ্রমোফোন মেরামৎ করলে, sound-boxটা ঠিক করলে। ভেতরের কলকব্জা বার করে তেল খাইয়ে আবার জুড়ে দিলে। কাজ শেষ করে চেঁচিয়ে উঠল, "মা জননী, এইবার প্রসাদ পাব গো!"

খেয়ে চাদর গায়ে দিয়ে বেশ লম্বা ঘুম দিলে রোয়াকে পড়ে। বাবা ফিরে আসতেই বললে, "জল টল খেয়ে নিন, বাবু। দুটো গান শুনব বলে বসে আছি।"

সারা সন্ধ্যাটা গান হল। বাবার বাছা বাছা যত ঠাকুর দেবতার গান ছিল, সব শুনলে বামুন। বসে বেশ মৌজ করে শুনলে। তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। "আজ আসি গো, মা",

বলে গট গট করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাবা কত ডাকলেন "খেয়ে যাও শ্যামচাঁদ, খেয়ে যাও। অমনি যেতে নেই।" কে শোনে কার কথা! পালাল বামুন, যেমন চোর পালায়।

আবার কিছু দিন দেখা নেই শ্যামচাঁদের। ইতিমধ্যে আমার পড়া শুনোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। মিত্র Institution ইস্কুল আমাদের বাসা থেকে বেশী দূরে নয়, সেইখানে পড়তে যেতে হবে। মায়ের কলকাতার রাস্তাকে বড় ভয়। তাই বাবা বললেন যে তিনি আপিসের পথে আমাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবেন, বিকেলে ঝি নিয়ে আসবে। এতে অসুবিধা অনেক, কিন্তু উপায় কি? এই গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ের মাঝে মা ত তাঁর কচি ছেলেটীকে একলা ছেড়ে দিতে পারেন না! প্রথম ইস্কুল যাবার দিন ঠাকুর প্রণাম করে বাবার সঙ্গে রাস্তায় বের হচ্ছি, দেখি সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামচাঁদ। আমায় দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "সরস্বতী মন্দিরে চললে দাদাবাবু! বাঃ, এই ত চাই। নইলে আমার মত আকাঠ মূর্খ হয়ে থাকতে হবে। চল, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। এসে মা ঠাকরুণকে খবর দেব। আপনার কোন চিন্তা নেই, বাবু।"

ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে আমাকে বলে গেল, "আমিই আবার তোমায় নিতে আসব। দিন আষ্টেক এই রকম করলেই মা-জননীর ভয় ভেঙ্গে যাবে।"

মাসখানেক এই বন্দোবস্ত চলল। রোজ দুবেলা শ্যামচাঁদের

সঙ্গে পথ হেঁটে দুজনের বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। তার পর হঠাৎ একদিন তার দেখা নেই। মা ত ভেবেই আকুল! কি হবে? আমি বললাম, "কি আবার হবে? একলা যাব। তুমি অমন কোরো না, মা। লোকের ছেলে ত একলাই ইস্কুলে যাওয়া আসা করে।" মা অনেক কষ্টে রাজী হলেন। আমারও নাবালকত্ব কতকটা ঘুচল। সেই দিন থেকে একা পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে সুরু করলাম।

এবার আমরা অনেকদিন শ্যামঠাকুরের দেখা পেলাম না। মাস দুই পরে একদিন রাত্রি বেলা বাহিরের ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করছি, এমন সময় জানালায় সেই পরিচিত ডাক শুনলাম, "খোকাবাবু!" আমি প্রথমটা একটু অভিমানভরে চুপ করে রইলাম। আবার শুনলাম, "দাদা, রাগ করলে? আমার উপর ত কেউ রাগ করে না কখনও!"

আমি আর থাকতে পারলাম না। মুখ ফেরালাম। বামুন গরাদে ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় গেছলে, শ্যামচাঁদ?"

"দেশে গেছলাম, ভাই। ছেলেটা বড় হচ্ছে কি না! তাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল। তবে, সেই বন-জঙ্গলের মুলুকে থাকতে পারব না, জানতাম। মনে করেছিলাম একটি হপ্তা থেকেই পালিয়ে আসব। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, কম্প জ্বরে ধরলে। খুব খানিকটা ভোগালে। পথ্য পেতেই পালিয়ে এসেছি। একটা গল্প শুনবে, খোকা বাবু?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বামুন রোয়াকে বসে গেল। আমিও জানালা গোড়ায় গিয়ে বসলাম। সেই মামুলী গল্প ফাঁদলে, "এক যে ছিল রাজা। তার ছিল দুই রাণী। দুয়ো রাণী আর স্থয়ো রাণী।" হাজার বার শোনা গল্প, তবু যতক্ষণ না দুষ্টু স্থয়োরাণীকে, হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা করে, পোঁতা হল, ততক্ষণ ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলতে সাহস হয় নেই। মা যে কখন এসে তক্তায় বসেছেন তাও জানতে পারি নেই।

গল্প শেষ হলে মা বললেন, "তোমার রকম কি বল ত!"

"কেন মা, দেশে গেছলাম। তুমিই ত পাঁচ টাকা গাড়ীভাড়া দিলে, বৌয়ের জন্য সাড়ী দিলে! আবার এখন অমন করছ!"

"তা বেশ করেছিলি। বৌ ভাল আছে ত? খোকা বেশ বড় হয়েছে?"

"খোকা বেশ বড় হয়েছে। কিন্তু মা, তোমাদের বৌকে নিয়ে আমি পারি না। ভাল করে কথা কইলে না একটি দিন।"

"কেন কইবে? তুই তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখিস না।"

"তা কি করব, মা? মা বড়, না বৌ বড়? আসতে রাজী হত, সঙ্গে নিয়ে আসতাম। আমাদের মায়েদের কোলে ফেলে দিতাম। তা সে পোড়ারমুখীর আক্কেল আছে! উলটে আমাকে কত কথা শোনালে। বললে—মিনসের চাল নেই চুলো নেই, বিদেশে বৌ নিয়ে যাবার সাধ!"

"তোমার বৌ ছেলে কি খায়, শ্যাম? দেশে জমী জমা আছে?"

"এক কাঠাও নেই, মা। শুনেছি, দাদা নাকি খেতে দেয়। আমাকে ত কিছু বলে না। বলবে কেন? যে স্বামীর স্ত্রীকে খেতে পড়তে দেবার মুরদ নেই, তাকে কে পোছে, মা!" বামুন একবার চোখ মুছলে।

আমি কথা ফেরাবার জন্য বললাম, "গান শুনবে, শ্যামচাঁদ? তোমার পাড়া-গাঁয়ে ত আর গ্রামোফোন ছিল না!"

"শুনব। সেইটে লাগাও। সেই যে—মনেরই বাসনা শ্যামা।"

গানের আওয়াজ শুনে বাবা নেমে এলেন। একটা, দুটো তিনটে গান হল। তখন শ্যামচাঁদ দুটো ঝুটো হাই তুলে তুড়ী দিতে দিতে বললে, "বড় ঘুম পেয়েছে। আজ যাই, বাবু।"

বাবা বললেন, "কেন মিছে-মিছি গোল করছ, ঠাকুর! তোমার একটুও ঘুম পায় নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি। বস, খানিকক্ষণ গল্প করা যাক। তোমরা শুতে যাও গো উপরে, রাত হয়েছে।"

আজ শ্যামচাঁদের চেহারা আমার বড় বিশ্রী লেগেছিল। আরও রোগা হয়ে গেছে, চোখ কোটরে বসা, মুখটা কেমন কালী-মাখা। শুয়ে শুয়ে কেবল তার মুখ মনে পড়ছিল, ঘুম আসছিল না। তবু চোখ বুজে পড়েছিলাম। মা কি একটা বই পড়ছিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে বাবা উপরে এলেন। এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা ঘুমিয়েছে, অমলা?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। কেন, বল দেখি।"

"শ্যামচাঁদের সঙ্গে কথা কইছিলাম। বেচারা বড় দুঃখী!"

"কি বলছিল?"

"ওর জীবনের কথা বলছিল। কষ্টও যেমন পেয়েছে, মা তেমনই কৃপাও করেছেন। কি আর বয়স হয়েছে ছোকরার! কিন্তু এরই মধ্যে—গুরুদেবের এত দয়া সত্বেও, কই, আমার ত হল না!"

সব কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না। মা বাবার একটু কাছে সরে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, "ছি! ও কথা মুখে আনতে নেই। কি না হয়েছে তোমার! সংসারের ভার মাথায় করে এর বেশী হয় না।"

বাবা হেসে বললেন, "সংসার মানে ত তুমি! তোমার ভার বওয়া শক্ত বটে!"

"ও কথা যাক, তুমি বামুন ছেলের কথা বল।"

বাবা অনেক কথাই বললেন। কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না। যা বুঝতে পারলাম, তা মোটামুটি এই—

শ্যামচাঁদের বাপ মা মারা যান, যখন সে একেবারে ছোট। তার দাদা তাকে মানুষ করেন। তিনি সারাদিন কারখানায় কাজ করতেন। মেজাজ বড রুক্ষ। ভাইকে কড়া শাসনে রাখতেন। কিন্তু ফল বিশেষ হয় নেই। ভাই লেখা-পড়ায় বড় একটা সুবিধা করতে পারলে না। যখন বছর চোদ্দ বয়স, দাদা একদিন ডেকে বললেন, "ভদ্রলোক হওয়া তোর কপালে নেই, হবি কোথা থেকে! কাল হতে কারখানায় নিয়ে যাব। দেখ,

যদি আমার মত মিস্ত্রী হতে পারিস। নইলে শেষ পর্য্যন্ত ডুগডুগি বাজিয়ে লোকের দোয়ারে দোয়ারে ভিক্ষে মাগবি।" বছর দুই কারখানায় কাজ শেখা চলল। তবে শ্যামচাঁদের ভবঘুরে স্বভাব, দুদিন যায়, দুদিন বা যায় না। দাদার কাছে চড়টা-চাপড়টাও বেশ খায়।

পাশের বাড়ীতে অপর্ণা বলে একটি বছর ছয়েকের মেয়ে থাকত। তার বাপ মার সঙ্গে দাদা বৌদির খুব মেলা-মেশা ছিল। শ্যামচাঁদ অপর্ণাকে বড় ভালবাসত। অপু বলে ডাকত। অত বড় ছেলে, কিন্তু একটা না একটা ছুতো করে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার সঙ্গে একটু খেলা করে আসত। চকোলেট, টফী, ইত্যাদি বিলেতী মিষ্টির নাম ত এরা জানত না, তবে শ্যামচাঁদ যখনই অপুর কাছে যেত, লুকিয়ে লুকিয়ে মুড়ীর চাকতী কি মোয়া কি গোলাপী রেওড়ী তাকে একটু দিয়ে আসত।

কোন কোন দিন কারখানা কামাই করে সারা দিন অপর্ণার সঙ্গে খেলা করত। দাদা একদিন এই নিয়ে খুব বকাবকি করলেন, "তোর কি সব বিদকুটে! পনর ষোল বছরের ছেলে, কোথায় ছুটোছুটি মারামারি করবি, না একটা পুঁটকে খুকীর সঙ্গে বসে উদয়াস্ত পুতুল খেলা!"

শ্যামচাঁদ একগুঁয়ে ছেলে। জবাব দিলে, "রাস্তায় গুণ্ডামি করে বেড়ালে কি তোমার মান বাড়বে না কি? মেয়েটার একটা ভাই নেই, বোন নেই, তাই দৌড়ে দৌড়ে যাই, দু দণ্ড খেলা করে আসি। এতে দোষটা হয়েছে কি?"

"দোষ কিছু হোক বা না হোক, তুমি কাল থেকে নিয়মিত কারখানায় যাবে। বুঝতে পারলে কি?"

এক দিন হল কি, শ্যামচাঁদ কারখানা থেকে ফিরে এসে মুখ হাত ধুয়ে একটু হাওয়া খেতে বের হচ্ছে, এমন সময় পাশের বাড়ীতে ভয়ানক কাঁদাকাটি শুনতে পেলে। দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। দেখলে যে রান্নাঘরের দাওয়ায় অপর্ণা ভুঁইয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তার সাড়ীতে আগুন ধরেছে, দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তার মা কিছুতেই নেবাতে পাচ্ছেন না, অসহায়ের মত কাঁদছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বাড়ীর ঝি "ওগো, কি হল গো," করে চীৎকার করছে। শ্যামচাঁদ এক লাফে গিয়ে "অপু, অপু, ভয় নেই," বলে অপর্ণাকে তুলে উঠানের চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে দিলে। আগুন নিবে গেল।

সেদিন সারা রাত শ্যামচাঁদ অপর্ণার বাপ মায়ের পাশে জেগে বসে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করলে। কিন্তু তাকে রাখতে পারলে না। ভোর বেলায় যখন পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়ে গোলাপী আলোর ছটা ঘরে এসে ঢুকল, অপর্ণার প্রাণ-পাখী সেই আলোয় উড়ে বেরিয়ে গেল।

তার পরের যা কিছু করণীয় ছিল, শ্যামচাঁদই সব করলে। অপর্ণার বাপ শোকে বিকল হয়ে গেছলেন, তাঁর কিছুই করবার শক্তি ছিল না। সেই ষোল বছরের ছেলে, সে যেখান থেকে পারে লোকজন ডেকে এনে খাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গঙ্গা নেয়ে যখন ফিরছে, তখন শ্যামচাঁদের দেহ মন

দুই যেন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। পা উঠতে চাইছে না। কেবল মনে হচ্ছে, "অপুর মায়ের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে ?"

একজন সঙ্গী বললে, "কি রে, বড্ড কাবু হয়ে পড়েছিস যে! একটু ঔষধ খাবি ? গায়ের ব্যথা সব মরে যাবে।"

শ্যামচাঁদ বললে, "তা দাও না, কি ঔষধ দেবে।"

সঙ্গীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল এক মদের দোকানে। সে একবার বললে, "এখানে কেন ?"

একজন হেসে বললে, "খুব ভাল দাওয়াই তোকে দেব। তোর ভয় নেই।"

শ্যামচাঁদের তর্ক বিতর্ক করবার মত শক্তি ছিল না। তারা যা হাতে দিলে, খেয়ে ফেললে। খাওয়া মাত্র সমস্ত শরীরটা গরম হয়ে উঠল, মনে হল যেন গায়ের ব্যথা সব মরে গেছে। ফূর্ত্তি করে বললে, "বা! চমৎকার দাওয়াই ত! কিন্তু গন্ধটা বড় বিশ্রী।"

সঙ্গী একজন বললে, "তুই আস্ত গাড়ল। ভাল দাওয়াই ত দুর্গন্ধ হবেই। নইলে এত তেজ তার আসবে কোথা থেকে! আর এক মাত্রা খা।"

খেলে আর এক মাত্রা। তার পর কি হল, তা শ্যামচাঁদ জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখে রোদ উঠেছে আর সে পড়ে রয়েছে তাদের বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে। একটু পরেই দাদা বেরিয়ে এলেন। তাকে দেখে চক্ষু রক্ত বরণ করে জিজ্ঞাসা

করলেন, "কোন চুলোয় গেছলি রাত্তিরে?" শ্যামচাঁদ কিছু জবাব দেওয়ার আগে গর্জ্জে উঠলেন, "এ কি রে! হতভাগা ছোঁড়া, মুখে গন্ধ কিসের? বামুনের ছেলে শেষ পর্য্যন্ত এই বিদ্যা! দূর হ আমার বাড়ী থেকে, বেরো, এখনই বেরো, এই মুহূর্ত্তে।"

ভাইকে কিছু বলতে দিলেন না। পায়ের চটী খুলে মারতে মারতে তাকে এক-বস্ত্রে রাস্তায় বের করে দিলেন। শ্যামচাঁদ সেই শ্মশান-বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল।

আমি আর শুনতে পারলাম না। কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসলাম। মা আমার কাছে উঠে এসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "জেগে রয়েছিস, বাবা! শো, ঘুমো, আমি তোর কাছে শুচ্ছি।"

সকালে উঠে স্থির করলাম, আজ শ্যামঠাকুরকে কিছুতেই ছাড়ব না, সব গল্পটা শুনব। কিন্তু সে একেবারে উধাও হয়ে গেল কোন দিকে। কত দিন আমাদের পাড়ামুখোই হল না। বোধ হয় বাবাকে সব পুরানো কথা বলে লজ্জা হয়েছিল।

প্রায় তিন মাস পরে একদিন ইস্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি বামুন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই বললে, "খোকা, আজ আমার বাড়ী জল খাওয়ার নিমন্ত্রণ। মাকে বলে এসেছি। তোমাকে সোজা সেইখানে নিয়ে যাব।"

এমন করে বললে যেন রোজই তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমি একটু রাগ করে উত্তর দিলাম, "তোমার জল-খাবার আমি!

খাব না। এই রকম করে তুমি যখন খুশী দু মাস, তিন মাস,আসবে না! জান, তোমার জন্য মায়ের কত মন কেমন করে? রোজ শ্যামচাঁদ, শ্যামচাঁদ, করেন। তোমার তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমার মা ত! যাও তুমি, আমি যাব না জল খেতে।"

"অভিমান কোরো না ভাই। আমার যে অনেক মাকে সামলাতে হয়। সব মা-ই ত এক, দাদা, সবাই এক!"

এ কথার আর কি উত্তর দেব! গেলাম তার সঙ্গে সঙ্গে। পথে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁ শ্যামচাঁদ, তোমার আবার বাড়ী কোথায় হল?"

"দেখবি, ভাই, দেখবি।"

সুধীর বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়ে বস্তীর দিকে যেতে ডান-হাতি এক খাবারের দোকান ছিল। দোকানদার উড়িয়া। সেখানে যে সব উপাদেয় পদার্থ তৈরী হত, তার মধ্যে প্রধান ছিল তেলে ভাজা জিলেবী, পেঁয়াজের ফুলুরী আর বেগুনী। সেই দোকানের কাছ বরাবর এক জায়গায় অনেকগুলি ছেলে মেয়ে জমেছে। সব রকমের ছেলে। সুধীর বাবুর ছোট ছেলে প্রফুল্লও এসেছে, বস্তীর ছেলেরাও এসেছে। আবার ধাঙ্গড়দের গুটিকয়েক ছেলেও এক পাশে বসে আছে। ঠিক মাঝখানটায় একটা তোলা উনুনে আঙ্গরা জ্বলছে। পাশে কলাপাতে পেঁয়াজ, আলু, বেগুন, পটল, গাদাখানেক বেসম, এক ছোট নাগরী ভরা তেল। সেগুলো আগলে বসে আছে একটি বছর ছয়েকের মেয়ে। শ্যামচাঁদ তাকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অপু, সব জোগাড় ঠিক আছে ত?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি আমায় অপু বলে ডাক কেন বল ত? আমার নাম অন্নু, অন্নপূর্ণা!"

"আমার ঘাট হয়েছে, মা অন্নু, ঘাট হয়েছে। কিন্তু মা অন্নপূর্ণার যে অনেক নাম।"

"ও সব আমি জানি না। আমার নাম অন্নু। তুমি আমাকে অন্নু বলবে। বুঝলে? এখন একটা কড়া জোগাড় করে আন দেখি। দোকানী আমাদিকে দিলে না। ফুলুরী ভাজব কিসে?"

"দিলে না! এত বড় আস্পর্দ্ধা! ভাই জগন্নাথ, ভাই সনাতন, কে আছ একটা কড়া দিয়ে যাও ত, বাবা, ঝটপট। খানিক পরে দুখানা গরম গরম পেঁয়াজের বড়া খেয়ে যেও।"

জগন্নাথ উড়িয়া হাসতে হাসতে কড়া নিয়ে এসে বললে, "এই নাও কড়া, ঠাকুর। কিন্তু ধাঙ্গড়দের সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁই কোরো না!"

শ্যামচাঁদ হেসে বললে, "রাম রাম, ছোঁয়াছুঁই এখানে হতে পারে কি? এ যে জগন্নাথ ক্ষেত্র! তুমি যাও, বাবা, জিলেবী ভাজ গিয়ে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের বড়া ভাজা আরম্ভ হয়ে গেল। শ্যামচাঁদ আমাকে ডেকে বললে,"ভোলা দাদা, তুমি আর অপু এখান থেকে নিয়ে নিয়ে সবাইকে গরম গরম ফুলুরী দাও। ওহে, দুজনে কেউ কলাপাত ছিঁড়ে ছোট ছোট করে এদের হাতে দাও ত।"

অন্নপূর্ণা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "ফের আমার নামের গোলমাল করছ, ছেলে!"

"না, না, গোল করব কেন, মা! তুমি অন্নপূর্ণা ত? আচ্ছা, ভোলানাথের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তুমি খুব পরিবেশন কর। কেউ বাদ না পড়ে। ওরে লছমনিয়া, জানকী, তোরা অত দূরে বসেছিস কেন? কাছে ঘেসে আয়।"

ধাঙ্গড় ছেলেরা কাছে সরে এল। কেউ কেউ মুখ বাঁকালে, কিন্তু কারও কিছু বলতে সাহস হল না। মহা ধূমধাম করে জলযোগ সমাধা হল। ফিরে যেতে যেতে বামুনকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, "এত পয়সা কোথায় পেলে, শ্যামচাঁদ?"

"ভিখারী পয়সা-কড়ি কোথায় পাবে, ভাই? যাদের জিনিস, তারাই খেলে।"

"আচ্ছা তুমি অনুকে অপু বল কেন, শ্যামচাঁদ?"

"অপুর গল্প শুনেছ বুঝি মায়ের কাছে! সে দেখতে অনুর মতনই ছিল।" বলে বামুন চাদরের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলে।

•

আরও কিছুদিন গেল। বাবার সঙ্গে বামুনের ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়তে লাগল। এক দিন শুনলাম বাবা বলছেন, "শ্যামচাঁদ, তুমি আমার কাছে তিন সত্য কর যে আর খাবে না।"

"এমন সত্য কি করে করব, বাবু? সে শক্তি যদি মা আমাকে দেন, তবেই হবে।"

"তোমার মতন আপন-ভোলা মানুষ, শ্যামচাঁদ, এই সামান্য জিনিসটা করতে পারবে না! এও কি সম্ভব!"

"সত্যি কথা বলব, বাবু? ছাড়তে চাই না। ওতে যে

আমি কি রস পেয়েছি, তা তোমাকে বুঝাব কি করে! একদিন ওরই জোরে আমার অপুকে ভুলেছিলাম। আর আজ ওর জোরে নিজেকে ভুলে আছি।”

বাবা আর কিছু বললেন না। লোকটা বদ্ধ পাগল! নিজেকে ভুলবে কি করে! কিন্তু কি ছাড়তে পারছে না, মদ? বামুন মদ খায় না কি? বাবা উঠে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “শ্যামচাঁদ অপুকে ভুলতে চাও কেন?”

“ভুলতে চাই? মোটেই না, ভাই। মাকে কি ভোলা যায়? মা যে চারিদিকে!” বলতে বলতে বামুন আনমনা হয়ে চলে গেল। মদের কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। কে জানে, হতেও পারে। প্রফুল্ল ত বলে যে বামুন ধাঙ্গড়দের সঙ্গে ঘোরে।

কিছুদিন পরে শ্রীপঞ্চমী এল। শ্যামচাঁদ প্রতি বছর ধূমধাম করে সরস্বতী পূজা করত। এবার আমারও নিমন্ত্রণ হল। আগের দিন বামুন এসে মাকে বলে গেল, “খোকাবাবু যেন তোমার ছেলের পূজাবাড়ীতে অঞ্জলি দিতে আসে। কোন ওজর আপত্তি শুনব না, মা।”

সকালে উঠে স্নান-টান সেরে বার হলাম। মা গরদের ধুতি-চাদর পরিয়ে দিয়েছিলেন। সুধীর বাবুদের গাড়ী-খানায় দেখলাম শুভ্র সুন্দর বীণাপাণি মূর্ত্তি, যেন শ্বেত পাথরে গড়া। দরজার উপর লাল শালুতে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা, “শ্যাম-

চাঁদের সরস্বতী পূজা।" পাড়ার সমস্ত ছেলে মেয়ে জুটেছে, প্রায় শ খানেক। দেবীর সামনে স্তূপাকার মুড়ী, মুড়কী, পাটালী, নবাত। শুভ মুহূর্ত্তে বামুন নিজে পূজায় বসল। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মেখেছে। সামনে একরাশি শ্বেতপদ্ম। দুদিকে ধূপ-ধুনো জ্বলছে। পাশে বসে অম্বু বলে সেই মেয়েটি গঙ্গাজল, তুলসী পাতা নৈবেদ্য গুছিয়ে সাজিয়ে পূজারীর হাতের কাছে এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। পূজা অনেকক্ষণ চলল। আমি দোর গোড়ায় চুপটি মেরে বসেছিলাম প্রফুল্লর সঙ্গে। মন্ত্র-তন্ত্র ত কিছুই শুনতে পেলাম না। শ্যামচাঁদ আপন মনে বিড়বিড় করে বাঙ্গলায় কি সব বলছিল। প্রফুল্ল বললে, "ফি বারই এই রকম পূজা হয়। মন্ত্র বোধ হয় জানে না।"

সংস্কৃত মন্ত্র না বললেও বামুনের মুখখানা যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল, কি বলব! চোখ দুটি বোজা। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি। পূজা শেষ হলে, প্রণাম করে উঠে বসল। হাত জোড় করে সোজা প্রতিমার মুখের পানে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। দেবীর মুখেও যেন কি রকম হাসি ফুটে উঠল। তখন শ্যামচাঁদ চেঁচিয়ে বললে আমাদিকে, "ঐ মা এসেছেন রে! জয় মা সরস্বতী! আয়, সব, অঞ্জলি দিবি।"

সে এক বিরাট ব্যাপার, একশো ছেলের এক সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়া। তখন কলকাতায় সার্ব্বজনিক পূজার রেওয়াজ হয় নেই। লোকে এ জিনিস বড় একটা দেখতে পেত না। শ্যামচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন বার বললাম,

"গলায় গজমোতি মুক্তার হার
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার ॥
জয় মা সরস্বতী ॥"

তার পর প্রসাদ বিতরণ। রাস্তায় মুড়ী মুড়কীর ঢেউ খেলে যেতে লাগল। খুব আনন্দে সারা বেলাটা কাটিয়ে তিনটের সময় বাড়ী ফিরলাম।

সন্ধ্যাবেলা শ্যামচাঁদ বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। বাবা বললেন, "কি হে, খুব পূজা করলে, শুনলাম। আমাদিকে কই প্রসাদ দিলে না!"

"এই যে, বাবু," বলে চাদরের খুঁট থেকে বের করে মাকে বাবাকে গুড়ে বাতাসা দিলে। দিয়ে বাবাকে চুপি চুপি বললে, "বাবু, এই শেষ পূজা। আজ মায়ের হুকুম পেয়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি কথাগুলো শুনতে পেলাম, কিন্তু বুঝলাম না তখন। বামুন চলে গেলে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্যাম কি বলছিল, গা!"

বাবা মুখ তুললেন না। ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, "ওর লীলা খেলা শেষ হয়ে গেল, অমলা।"

"তুমি অমনি বিশ্বাস করলে ঐ পাগলের কথা?"

"দেবী পূজার আসনে ওকে আদেশ জানিয়েছেন। সত্য হতেই হবে।" বলে বাবা হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

সত্যিই হল। একদিন সুধীর বাবুর বাড়ীর ফটকের সামনে বেঞ্চে বসে শ্যামচাঁদ প্রফুল্ল আর আমি গল্প করছি। অর্থাৎ শ্যামচাঁদ গল্প বলছে, আমরা দুজনে শুনছি। এমন সময় গলির ভেতর-দিকটায় কি একটা কলরব শোনা গেল। তিন জনেই দৌড়লাম সেই দিকে। বস্তির কাছ-বরাবর যেতেই দেখি আগুন লেগেছে, একখানা খোলার বাড়ী ধূ ধূ করে জ্বলছে। অনেক লোক জমেছে। রাস্তার উপর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "হায় হায়," করতে করতে পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। বুক চাপড়াচ্ছে, আর সবাইকে বলছে,"ওগো, তোমরা কেউ বাঁচাও আমার মেয়েটাকে।"

শ্যামচাঁদ আমার কানে কানে বললে "অপুর বাপ। আমি চললাম, দাদা।" বলেই ছুটল সেই জ্বলন্ত বাড়ীর দিকে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "সাবধান, শ্যামচাঁদ, এখনই চাল ভেঙ্গে পড়বে।" বামুন দৃকপাতও করলে না। কাছে দুজন জোয়ান ধাঙ্গড় দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজনকে ঠেলে দিয়ে বললে, "রঘুনাথ, একটা দা নিয়ে আয় ত, ভাই।"

এমন সময় সেই আগুনের ভেতর থেকে ছোট মেয়ের গলার কাতর ডাক এল, "বাবা গো, বাবা গো!"

শ্যামচাঁদ চেঁচিয়ে উঠল,"ভয় নেই। এলাম বলে, অপু। রঘুয়া, কাটারী নিয়ে তুই আয়। আমি এগোই। আর দাঁড়াতে পারছি না।"

ঢুকল গিয়ে বামুন আগুনের ভেতর। পিছু পিছু ঢুকল রঘুয়া ধাঙ্গড় দা হাতে। সকলের বুক দুড় দুড় করে উঠল।

একটু পরেই সেই আগুনের মধ্যে থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল শ্যামচাঁদ, অন্নপূর্ণাকে কোলে করে, অস্তগামী সূর্য্যদেবের মত সোনার বরণ। "বাঁচিয়েছি! এবার অপুকে বাঁচিয়েছি!" বলে মেয়েটাকে তার বাপের কোলে ফেলে দিয়ে ছুটে ফিরে গেল বামুন। তাঁর ধুতি দাউ দাউ করে জ্বলছে। সবাই চীৎকার করে উঠল, "যেও না, ঠাকুর, পুড়ে মরবে।"

শ্যামচাঁদ গর্জ্জন করে উঠল, "কি! আমার রঘুয়া একা একা মরবে! জয় মা কালী! এই যে, মা, এসেছি!"

তার পর দমকল এল, আগুনও নিবল। ছাইয়ের ভেতর থেকে খালাসীরা টেনে বের করলে দুটো আঙ্গরার মূর্ত্তি, জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে। পৈতা গেছে পুড়ে, চেনবার জো নেই কোনটী শ্যামচাঁদ, কোনটী তার বন্ধু রঘুনাথ।

হাওয়া বদল

অমরনাথ গরীবের ছেলে। বাপ নেই। ভবানীপুর চাউল-পটী রোডে একখানি ছোট বাড়ী রেখে তিনি পাঁচ বছর হল মারা গেছেন। সেই বাড়ীর নীচের তলার দুটী ঘরে অমর ও তার মা থাকেন। মার কিছু গহনা ছিল। তাই বেচে, আর উপর তলা ভাড়া দিয়ে, মা এই কবছর কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন ও ছেলেকে কলেজে পড়াচ্ছেন। অমর মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। চার বছর হয়ে গেছে। আর বছর দুই হলেই পূরোপূরি ডাক্তার হয়ে বেরোবে। তাহলেই মার সকল দুঃখ ঘুচবে। পাস-টাস এ পর্য্যন্ত অমর মাঝামাঝি রকম করেছে। তবে তার বুদ্ধি নানাদিকে খেলে। কষ্টের সংসারে মানুষ হয়ে সে একরকম স্থির করেছে যে বডলোক একদিন হবেই। শুধু বিদ্যায় সেটা হওয়া যায় না, তা সে বোঝে। বড়লোক হতে হলে কিসে সবাইকে খুশী করা যায় সেটা জানা চাই, সব কথায় সায় দিতে পারা চাই, সকল সময় সকল অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই। এটা অমর বেশ বুঝত। কলেজে সে সব রকম ছেলেদের সঙ্গেই বেশ বনিয়ে চলত, তবে যারা গরীব, যাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা নেই, তাদের সঙ্গে ভাব করত না। বড় ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই তার বেশী মেলা-মেশা ছিল। টেনিস খেলতে

চেষ্টা করে শিখেছিল, কারণ এ বিদ্যা আধুনিক সমাজে খুব কাজে লাগে। মাষ্টার প্রফেসরদের খুশী রাখতেও তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুবিধা পেলেই তাঁদের বাড়ী যেত। তাঁদের মন যোগাবার জন্যই ক্লাসে সদাসর্ব্বদা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। বুঝত এ সব একদিন কাজে লাগবে। ভবানীপুর Y. M. C. A.-তে অমরের খুব যাতায়াত ছিল, কেন না সেখানে অনেক পদস্থ ব্যক্তির সমাগম। তার বড় সাধ বিলেতে গিয়ে একটা তকমা নিয়ে আসে, কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ, উত্থায় প্রবিলীয়ন্তে, ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, জলে বুদ্‌বুদের মত! তবে কে জানে, হয়ত আসবে একদিন, কোন গণ্ডমূর্খ রাজা নবাবকে আশ্রয় করে পাড়ি জমাবে।

আপাততঃ কলেজের ছুটি হয়ে গেছে, গরমও বেজায় পড়েছে, একবার পাহাড়ে কি সমুদ্রের ধারে দিন কয়েক কি করে বেড়িয়ে আসা যায়, অমর তাই ভাবছে। তার কয়েকজন বন্ধু দার্জ্জিলিঙ্গ গেছে। তারা ক্রমাগত আসতে লিখছে, কিন্তু ওরকম শুকনো নিমন্ত্রণে ত আর অমরের চলবে না! শেষ হরেনের এক চিঠি এল, সে যাওয়া-আসার রেল ভাড়া অবধি দিতে প্রস্তুত। অমর মাকে বললে, "তুমি যদি কিছু দাও, ত একবার বেড়িয়ে আসি! এই গরমে লেখাপড়া করে করে মাথা খারাপ হয়ে গেল যে!" মা পঁচিশ টাকা দিলেন। নগদ সাত টাকায় এক ছাই রঙ্গের ফ্লানেল পেণ্টুলেন আর দশ টাকায় পিতলের বোতাম লাগান নীল এক কোট কিনে নিলে। গেল বছর সাড়ে তিন টাকা

দিয়ে এক সৌখীন কুমীরের চামড়ার (?) সুটকেস কিনেছিল, সেইটে বেশ করে ঝেড়ে-মুছে তাইতে জিনিস-পত্র ভরলে। বিছানা বাঁধার কেম্বিসের থলি ছিল না, তাই বিছানার উপর এক লালিমলী কম্বল জড়িয়ে চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে নিলে! মোটের উপর তাকে বেশ Smart দেখাচ্ছিল ষ্টেশনে, বিশেষ যখন টেনিস ব্যাটটা হাতে করে পৌছল। শুভক্ষণে (?) রওয়ানা হল। চলল ত, কিন্তু গিয়ে থাকবে কোথায়? তার এক দূর সম্পর্কের মামা চাঁদমারীতে থাকেন। কিন্তু সেখানে উঠলে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখান দুষ্কর হবে।

দুপুরে দার্জ্জিলিঙ্গ পৌছল। পাঁচ রকম ভেবে-চিন্তে বাক্স-বিছানা ধর্ম্মশালায় রেখে সোজা Amherst Villa বাড়ীতে চলে গেল। সেখানে হরেনরা থাকে। গিয়ে দেখে এলাহী কারখানা! যেমন আসবাবপত্র, তেমনি চাকর-বাকরের বহর। অমরকে দেখে চারিদিকে রোল উঠল "হ্যালো, এই যে", ইত্যাদি। স্নান ভোজনাদি বেশ হল। কিন্তু এখানে আশ্রয় জোগাড় করতে কিছুতেই পারলে না। স্থান নেই, পাঁচ জন এই বাড়ীতে থাকে। এদের দল সবসুদ্ধ দশ জন। অন্য পাঁচ জন আরও দু-তিন বাড়ীতে থাকে। আলাদা আলাদা জায়গায় থাকলে কি হয়, রোজ সকালে বিকেলে এরা খুব সুন্দর মনোহারী প্রসাধন করে একত্রে বেড়াতে বের হয়। চৌরাস্তায় গোটাতিনেক বেঞ্চ জুড়ে বসে খুব হাসিগল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। অপেক্ষাকৃত দুর্গত লোকের এদের মাঝে স্থান পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

রাস্তায় যেতে যেতে সবাই এই চাঁদের হাট চেয়ে চেয়ে দেখত। নিন্দুকেরা নাম দিয়েছিল, House of Lords। সারা বিকেলটা এই বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে, সন্ধ্যাবেলা হরেনের বাড়ী আবার সাড়ে বত্রিশ রকমের মৎস্য মাংস খেয়ে, ধর্ম্মশালায় ফিরে যেতে অমরের কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু উপায় কি, নিজের মান ত রাখতে হবে! তাই খাবার পর চেঁচিয়ে বলে গেল, "যাই, ভাই হরেন, মামী কত ভাবছেন। সকালে উঠেই পালিয়ে আসব এখন। এক পেয়ালা চা রেখো।" সকাল পর্য্যন্ত থাকতে পারবে কেন, ছটা বাজতে না বাজতে Amherst Villa-তে এসে হাজির! এদের তখনও রাত পোহায় নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ। অমর এক নরমগোছের সোফা বেছে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন আটটা বেজে গেছে। দেখে যে পাঁচ বন্ধুই জামা জোড়া এঁটে বসে চা-পানি করছেন। "Good morning all", বলেই এক লাফে উঠে সেও বসে গেল, আর এক মনে নানাবিধ ভোজ্য পানীয় সাবাড় করতে লাগল। নটার সময় বন্ধুমণ্ডলী চৌরাস্তায় সমবেত হলেন। আজ এগার জন। দেড় টাকা করে চারটে ঘোড়া ভাড়া করা হল। হরেন ও অন্য তিন জন ম্যাল চক্কর দিতে গেল। যেই তারা ফিরেছে, অমর একেবারে হরেনের কাছে গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে বললে "একবার আমায় চড়তে দাও না, ভাই!" হরেন ভাল মানুষ, কিছু বললে না, অমর ঘোড়ায় চড়ে বসল। খুব কেতা করে রাশ চাবুক ধরে যেই বের হবে কি পাহাড়ী সহিসটা দৌড়ে এসে রাস্তা আটক করে চেঁচাতে লাগল,

"তুম্ উতর যাও বাবু, তুম্‌কো ঘোড়া ভাড়া নেই দিয়া।" ব্যাপার বেশী দূর গড়াল না, কেন না অমর একটু ভয় পেয়ে মানে মানে নেমে পড়ল। কিন্তু বাইরের লোক চোখ টেপাটেপি করতে লাগল বলে Upper House নূতন বন্ধুটীর উপর একটু নারাজ হলেন। দুপুর বেলা পা-ব্যথা ইত্যাদি পাঁচ রকম ওজর দেখিয়ে অমর বন্ধুদের বাড়ীতেই খেতে বসে গেল। মনে করলে, এ বেলা ত ভাল করে খেয়ে নিই, ও বেলা বাজার থেকে দু-চার আনার জল খাবার কিনে খেলেই হবে! সন্ধ্যা নাগাদ কিন্তু আরও একটু সুবিধা হয়ে গেল। হরেন অমরকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ওহে, আমাদের সুরেশের তার এসেছে, তাকে কালই নেমে যেতে হবে। তোমার মামীমা যদি মত করেন, ত কাল থেকে এখানেই এস না।" বাঃ, এই ত চাই! পরদিন সকাল হতে না হতে অমরনাথ তার তোরঙ্গ বিছানা নিয়ে উপস্থিত হল। হরেনকে বললে, "যদি একটা আলাদা ছোট্ট ঘর দাও ত খুব ভাল হয়, ভাই। আমার বড় নাক ডাকে।" হরেন বন্ধুকে একটু ভালবাসত। বাক্স-পেটরা সরিয়ে একটা ঘর খালী করে দিলে। অমর বাঁচল। তার বড় ভয় যে এই সব বাবুলোক, এরা তার কাপড়চোপড়ের অবস্থাটা দেখে না ফেলে। আর এক দিন কাটল। হেসে, বেড়িয়ে, তাস খেলে, ভালমন্দ পাঁচ রকম খেয়ে অমর বেশ আছে। এরই মধ্যে মুখে একটু বেগুনী আভা দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে হরেন বেড়াতে বেড়াতে তাকে চুপি চুপি বললে, "তোমার কি ভাই আর কাপড়-চোপড় নেই?

রোজ এই নীল কোট আর ছাই রঙের পেণ্টলুন পরা নিয়ে এরা হাসাহাসি করছিল।" অমর কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর দিলে, "জান ত, হরেন, আমার অবস্থা!" মনে মনে স্থির করলে, একবার জুত পেলে হয়, দেখে নেব এই সব ফতো বাবুদের। শেষে ঠিক হল যে হরেনের এক plus four suit (খাটো পেণ্টলুন স্যুট) আছে, সেটা এরা কেউ দেখে নেই, সেইটে কেটে-কুটে অমর ঠিক করে নেবে। অমরের পুঁজির কথা ত পাঠক জানেন। যত সস্তায় পারে নীচে বাজারে কাটা-কুটো করে নিলে। তা ছাড়া আড়াই টাকায় এক রঙ্গীন চিত্র-বিচিত্র সোয়েটার, আর এক টাকায় এক গরম কুল মোজা কিনে আনলে। চমৎকার জিনিস, দেখে বোঝবার জো নেই যে পাটের তৈরী। পরদিন নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে যখন অমর বের হল, পাঁচ বন্ধুই সমস্বরে হুররে বলে উঠল। অমরও প্রসন্নমুখে গুড্ মর্ণিং বলে সম্ভাষণ করলে। আর তার বিশেষ কোন ভাবনা সঙ্কোচ নেই! দু-দুটো স্যুট, একটা রঙ্গচঙ্গে সোয়েটার, এতেই কদিন বেশ কেটে যাবে। তবে মুস্কিল হবে যদি মেয়ে মহলে মিশতে হয়। আপাততঃ তার কোন সম্ভাবনাও নেই, কারণ তার বন্ধুমণ্ডলী বড়লোকের ছেলে হলেও কোন রকম সামাজিক পাশে আবদ্ধ হতে একেবারে নারাজ। কজনই এক মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত, সাধ মিটিয়ে হৈ হৈ করবে। তবে তাদের হৈ হৈ, ঘরে কুরসীনশীন হয়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোমল, পাহাড়ে পাহাড়ে পাড়ি দেওয়া তাদের পক্ষে ত সম্ভব ছিল না! বাহিরে বেরোন দার্জ্জিলিঙ্গের একটা কুরীতি, তাই তারা রোজ

ছুবেলা চৌরাস্তায় আসত, আর কখনও কখনও ঘোড়া ভাড়া করে Mall-টা, মন্থরগতিতে চক্কর দিত। অমর ত ঠিক এই দরের লোক নয়। তার দু-চার দিনেই House of Lords-এর জীবন নিতান্ত একঘেয়ে মনে হতে লাগল। ব্যাট কাপড় সঙ্গে এনেছে, তার সাধ, কোথাও গিয়ে মাঝে মাঝে টেনিস খেলে আসে। রোজ সাজগোজ করে চৌরাস্তায় বসে থেকে তার মন উঠবে কেন! উপরন্তু গরীবের পেট, হরেনের বাড়ীর গুরুভোজন বিনা ব্যায়ামে আর বরদাস্ত হচ্ছিল না। বেঞ্চে বসে বসে দেখত, কত রঙ্গ-বেরঙ্গের ছোকরা সাহেব ব্যাট হাতে হেলতে দুলতে ক্লাবের দিকে চলেছে। লুব্ধ নয়নে দেখত, আর দেখে বড় হিংসা হত। কিন্তু সহায়ছাড়া সে কি করে ক্লাবে যাবে? একদিন হরেনকে কথাটা বলাতে সে হেসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে, অমরের আমাদের ক্লাবে গিয়ে সাহেবদের পা না চাটলে পেট ভরছে না। কেন, যাও না বাবু স্যানেটেরিয়মে, টেনিস খেলার যদি এত সখ!" অমর ভয়ানক চটে গেল মনে মনে। কথার ভঙ্গী দেখ না, চাঁদমারীতে বলে মামার বাড়ী পর্য্যন্ত একবার গেলাম না, ধর্ম্মশালা ছেড়ে জলাপাহাড়ে থাকতে এলাম, আবার টেনিসের জন্য ধুতি পরে কার্ট রোডে নেমে যাব! যাবই আমি জিমখানাতে, যেমন করে পারি! সুযোগ খুঁজতে লাগল। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ-মুপৈতি লক্ষ্মী!

একদিন চৌরাস্তায় বসে রয়েছে, দেখে যে তাদের কলেজের প্রফেসর মেজর রে ব্যাট হাতে ক্লাবের দিকে যাচ্ছেন। সাহেবদের

ভাষায় বলতে গেলে, অমর ঠিক বুঝত তার রুটীর কোন পিঠে মাখন মাখান। তৎক্ষণাৎ স্থির করলে মেজর সাহেবকে কাণ্ডারী করে ক্লাবে পাড়ি জমাবে। দৌড়ে গিয়ে খুব ভক্তিভরে নমস্কার করে নিবেদন করলে, "স্যার, আপনি এসেছেন জানতাম না। অনুমতি করেন ত কাল একবার গিয়ে প্রণাম করে আসব।" মেজর রে খুব অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। সকাল নটার আগে এসো। আমি Mrs. Monk-এর হোটেলে থাকি, সাত নম্বর ঘর। তুমি যে মস্ত সাহেব হয়েছ হে! আমি ত জানতাম না যে তুমি এমন smart কাপড়-চোপড় পর। টেনিস খেলছ? তুমি ত বেশ ভাল খেলতে পার!" সেদিন plus fours-টা পরা ছিল। অমর একটু সলজ্জ হেসে বললে "না স্যার। টেনিস খেলার আজও সুবিধা হয়ে ওঠে নেই।" "Right O! So long!" বলে রে সাহেব চলে গেলেন। অমর বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, "কি বাবা, এই ছুটির সময়েও তোমার প্রফেসার নইলে চলছে না!" অমর একটু কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলে, "ওঁর একটু কাজ আছে বলে সকালে আমায় ডেকেছেন।" রে সাহেবটী একটু খোসামোদপ্রিয় ছিলেন। কলকাতাতেও অমর তাঁর বাড়ীতে দু-চার বার গেছল। এখানে রীতিমত তোয়াজ আরম্ভ করে দিলে। রোজ ছোট-হাজরী খেয়েই তাঁর কাছে উপস্থিত হত, চিঠিপত্র টাইপ করে দিত, নোট নকল করে দিত। আবার নটার পর বন্ধুদের সঙ্গে জুটে পড়ত। সব দিক বজায় রাখতে হবে ত! হরেন কিন্তু একদিন একটু

বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি রে সাহেবকে অত আমড়াগাছী করছ কেন হে? রোজ কি করতে যাও ওখানে?" অমর জানালে যে সাহেবের কতকগুলো দরকারী নোট সে নকল করে দিচ্ছে। দিন চার-পাঁচ পরে মেজর রে অমরকে বললেন, "ওহে চ্যাটার্জী, তুমি ঐ ছোকরাদের ওখানে বেশ সুবিধামত থাকবার জায়গা পেয়েছ ত! নইলে আমার এখানে আসতে পার। একটা ছোট কুটরী খালী পড়ে রয়েছে।" কুটরীটা দেখলে। নিতান্ত ছোট, একটু অন্ধকারও বটে। তবু এই সাহেবী হোটেলে থাকতে আসা অমরের কাছে সব রকমে বাঞ্ছনীয়। হরেনদের উপর টেক্কা দেওয়া হবে। আবার স্যারের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে খাতিরও অনেক বাড়বে। রাজী হল। স্বর্গের সিঁড়িতে আর এক ধাপ চড়া হল। বন্ধুদের অশেষ ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করেও সেই দিনই অমর হোটেলে জিনিসপত্র নিয়ে এসে বসল।

বিকেলে গুরুমহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে ক্লাবটা দেখে এল। নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগল। বহুকাল আগে একবার ঢাকা ক্লাবে গেছল। তার কাকা সেখানে সরকার ছিলেন। কাকার দপ্তরে বসে লুব্ধনয়নে সাহেব-মেমদের খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদ অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল। মনে হয়েছিল যেন অমরাপুরী। সেই ক্লাবই ত! আজ সেও সাহেব হয়ে এসেছে, লেমন স্কোয়াশের গেলাস হাতে ধরে একটু বেঁকে বসে ইংরেজীতে কথা কইছে! তবে গলদ এই যে সত্যিকার সাহেব-মেম এখানে আর নেই। রাহুর তাড়নে শশীপ্রায় অন্তর্হিত। সাদা মুখ যে কটী এসেছে, তারা এক

পাশে বসে আছে! বেশীর ভাগই স্যারের মত সাহেব, বেঁকিয়ে ইংরেজী বলে মাৎ করে দিচ্ছেন। তা সে যাই হোক, আমাদের স্বদেশী মেম-সাহেবদের কিন্তু বড় সুন্দর দেখাচ্ছে! যদি বা একটু রঙের গোলযোগ থাকে, তা প্রসাধনের গুণে অমরের চোখে পড়ছে না। সব চেয়ে তার ভাল লেগেছে ঐ ছোট মেয়েটীকে, ফিরোজা রঙের সাড়ী পরা, মায়ের কাছ ঘেঁসে বসে রয়েছে। কি লাগে ওর কাছে কটা চুল, নীল চোখ! অমর স্থির করলে, যা থাকে কপালে, ওদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। বাড়ী ফেরবার পথে বন্ধুদের দেখলে চৌরাস্তায়। মন তখন নানা রকমে মশগুল। একটু পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু যাবে কোথায়! সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করলে, "ময়ূর, ময়ূরপুচ্ছ, দাঁড়কাক, সাহেববাবু, আরে শোনই না!" কি করে, গেল তাদের কাছে। নরেশ উপহাস করে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় গেছলে বাবা, চেয়েই দেখ না যে! এখনও ত হরেনের কাটলেট পেটে গজগজ করছে!" অমর শান্তভাবে উত্তর দিলে, "কোথাও যাই নেই, ভাই। রে সাহেবের সঙ্গে ওদিকটায় বেড়াচ্ছিলাম। আজ চমৎকার বরফ বেরিয়েছে।" নরেশ মুখ বেঁকিয়ে বললে, "তুমি বরফ নিয়ে কি করবে বাবা, তৈল জোগাড় কর। কোথাও না কোথাও মোসাহেবী নইলে তোমার ত চলবে না!" অমর চালাক ছেলে, কথা হজম করতে জানে। সে হরেন নরেশকে চটাবে কেন, চুপ করে রইল।

আরও দিন দুই কেটে গেল। মেজর সাহেব ছাত্রকে নিয়ে

দুবার টেনিস খেলে এসেছেন। কিন্তু দুপুর বেলায় নিয়ে গেছলেন, যখন সাহেব-সুবোর ভিড় কম। অমরের একটু একটু করে ক্লাব ও হোটেল জীবনটা অভ্যাস হয়ে আসছে। বড় সুখে আছে। তৃতীয় দিনে সেই মেয়েটীকে রাস্তায় দেখলে। নীল ফ্রেঞ্চ রেশমের সাড়ী খাটো করে পরা, এলোচুল হাওয়ায় একটু একটু উড়ছে, হাতে সবুজ রঙ্গের চিত্রবিচিত্র ছাতা। অমরের মনে হল যেন সুন্দর একটী প্রজাপতি ফুলের মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার প্রাণের ভেতর যেন কি মোচড় দিতে লাগল। মেয়েটীর মার মুখও বড় ভাল লাগল; কিন্তু সঙ্গে একটী দাদা যাচ্ছিল, সে যেন একটা আস্ত লেবঙ্গের গোরা। প্রায় সেই রকম লাল রঙ্গ, আর ঘুষো যেন উঁচিয়েই রয়েছে। তবু অমর আমাদের কি ছাড়বার পাত্র! সবুরে মেওয়া ফলে। বিশেষ তার নসীব এখন খুব জোর যাচ্ছে। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা খানার পর মেজর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে ছোকরা, তুমি একটা কালোগোছের সুট সঙ্গে এনেছ কি? পরশু আমার সঙ্গে লেডী B-র পার্টিতে যেতে হবে।" অমর একটু যেন লজ্জিত হয়ে বললে, "আজ্ঞা না, আমি সে রকম কাপড় ত কিছু আনি নেই।" সাহেব "বোয়, বোয়" করে হুঙ্কার ছাড়লেন। বেয়ারা আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার আর বছরের সেই নীল কাপড়টা এনেছিস কি?" "হাঁ হুজুর।" "সেটা এই সাহেবের ঘরে রেখে দে। কাল সকালে দরজীটাকে ডাকিয়ে সাহেবের গায়ে ফিট করে নিতে হবে।" "জো হুকুম, হুজুর।" পরদিন

সকালে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই সেই নীল সার্জের স্থট ঠিক হয়ে এল। বড় সাধ করে অমর নূতন কাপড় পরে বেড়াতে বের হল। কিন্তু নরেশটা এমনি অসভ্য বর্ব্বর যে বলে উঠল, "নূতন পুচ্ছ কোথায় জোগাড় করলে হে, বায়সপ্রবর?" ভাগ্যিস এরা ক্লাবে যায় না! তাহলে প্রাণটা অতিষ্ঠ করত। কাল সকালে ক্লাবে ladies-দের সঙ্গে টেনিস খেলতে হবে, মাষ্টার মহাশয় হুকুম করেছেন। সেই সময় নরেশের মত বখা ছেলে দর্শক থাকলেই হয়েছে আর কি! নরেশটা দিন দিন অমরের জুজু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে যে বড় জুজু গোকুলে বাড়ছে, তা ত আর বেচারা তখন জানে না!

পরদিন সকালবেলা যখন দশটার সময় অমর টেনিস বেশে সজ্জিত হয়ে ব্যাট হাতে ডাঃ রে-র সঙ্গে চৌরাস্তার উপর দিয়ে গশ গশ করে চলে গেল, নরেশ হরেনকে চোখ টিপে বললে, "ছেলে বটে, ঠিক বাগিয়েছে!" টেনিস কোর্টে গিয়ে দেখে সেদিনকার সেই মেয়েটী তার ভাইয়ের সঙ্গে বসে রয়েছে। আজও নীল সাড়ী। অমরের বুক দুড দুড় করে উঠল। ভাইটীর সেই মানোয়ারী গোরার মত মুখ, লাল টক্‌টক্ করছে। হাসির লেশ নেই। যে হাতে ব্যাট ধরে রয়েছে, সেটা যেন একটা বাঘের থাবা। ভগবান এমন বোনের এমন ভাই কি করে স্থষ্টি করলেন! অমরদের দেখে ভাই বোনকে ফিস ফিস করে বললে "Why is that fellow looking at you like a sick cow, Nellie? (তোর দিকে অমন রুগ্ন গরুর মতন

করে চেয়ে রয়েছে কেন রে, নেলী ?)" মেজর রে ছাত্রকে এদের সঙ্গে যথারীতি আলাপ করে দিলেন, "মিষ্টার ওমর চাটার্জী, মিষ্টার বোপেন রুডার, মিস নীলিমা রুডার।" নীলিমা ফিক করে হেসে ফেললে, বোধ হয় বয়সের দোষ! কিন্তু ভূপেন অমরের মুখের দিকে একটু কৃপা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "হাড়ুড়ু ?" অমর নত হয়ে দুজনকে নমস্কার করলে। ভূপেনের patronising চালের ঠিক অর্থ বোঝবার তার শক্তি ছিল না। আর বুঝলেও গায়ে মাখবার পাত্র সে নয়। কিন্তু সে যে আজ নেটিভ নয়, তা প্রমাণ করবার একটা সুযোগ মিলল হাতে হাতে। তারা যে কোর্টে খেলবে বলে স্থির ছিল, সেখানে দুজন আহেলেবেলায়ৎ সাহেব-লোগ খেলছিলেন। তাঁদের সেট্ শেষ হতে তাঁরা খেলা বন্ধ না করে আবাব নূতন সেট্ খেলতে লেগে গেলেন। এ কিছু একটা নূতন ব্যাপার নয়। এ রকম হয়েই থাকে, আর আমাদেরও বংশগত প্রকৃতি, আপৎ-কালে একটা বৈদান্তিক নিষ্ক্রিয় ভাব দেখান। অমব কিন্তু রসভঙ্গ করলে। একেবারে কোর্টের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এ আমাদের কোর্ট, আপনারা অন্যত্র খেলুন গিয়ে।" একজন সাহেব মৃদু হেসে উত্তর দিলে, "Must we, Baboo? তাই না কি, বাবু?" অমর মুখে আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু কোর্টও ছাড়লে না। সাহেবলোগরা তাকে নাছোড়বান্দা দেখে শেষ নিজেদের কোট হ্যাট নিয়ে সরে পড়লেন। অমরের জয় হল। সে একটু বুক ফুলিয়ে এসে নেলীকে বললে, "আসুন, এইবার

খেলা যাক।” ভূপেন, কি জানি কেন, খুশী হল না। ভুরু কুঁচকে অমরকে জিজ্ঞাসা করলে, “ওরা কি জানে যে আপনি মেম্বর নন?” এ সব সামান্য জিনিস হজম করতে আমাদের অমরনাথ খুব জানে। ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার ঘা সইতেই হয়। তার সামনে এত বড পুরস্কার, নেলীর সঙ্গে টেনিস খেলা। সে নেলীর ভাইয়ের দুটো কথা বরদাস্ত করবে না? টেনিস সুরু হল—ভাই বোন এক দিকে, আর মেজর সাহেব ও ছাত্র অন্য দিকে। অমর প্রথম সেট্‌টা খুব জোর খেললে। মেজর রে এক দিকে বদ্ধ সাহেব হলেও খেলাধূলোয় সুবিধা করে উঠতে পারেন না। ছাত্র তাঁকে এক রকম কোণ ঠাসা করেই রাখলে, একাই সর্ব্বত্র বল্ নিতে লাগল। অপর পক্ষে ভূপেন মন্দ খেললে না, কিন্তু তার মেজাজ কেমন ভাল ছিল না, খানিকটে চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিলে। ফলে অমর জিতিল, ৬—৩। আবার খেলা আরম্ভ হল। এবার অমর মাষ্টার মহাশয়কে সব ছেড়ে দিতে লাগল। যখন নিজে কোন বল্ মারে, ত সেও খুব আস্তে, নেলীর দিকে। ফলে দ্বিতীয় সেট্ ভাই বোন জিতল, ৭—৫। নেলী আনন্দে হাততালি দিতে লাগল, কিন্তু তার দাদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে, “ও ত তোকে ইচ্ছা করে জিতিয়ে দিলে। একে আবার টেনিস্ বলে!” খেলা হয়ে গেলে ডাঃ রে-র ইশারা পেয়ে অমর দৌড়ে নেলীর কোট এনে পরিয়ে দিলে, বসবার জন্য একটা বেশ নীচু দেখে চেয়ার এগিয়ে দিলে। বোপেন নীরস ভাবে ইংরেজীতে বললে, “ইস্কুলের মেয়ে, অত শিভাল্‌রী

(সম্মান) ওর অভ্যাস নেই, কেন ওর মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন, চাটার্জ্জী ?” ফিরে যাওয়ার পথে মেজর সাহেব ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন লাগল ওদের ? দিব্যি মেয়েটী না নীলিমা ?” অমর অকারণ লাল হয়ে উত্তর দিলে, “আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ। ওঁরা কোথায় থাকেন ?” “ওদের বাবার নিজের বাড়ী আছে। জলাপাহাড়ে ‘বেলা ভিষ্টা’ দেখ নেই ! ব্যারিষ্টার সতীশ রুডারকে চেন ত ? তাঁরই ছেলে মেয়ে ওরা। একদিন নিয়ে যাব এখন তোমায়।” অমরের বুকের ভেতরটায় যেন কে হাতুড়ী পিটতে আরম্ভ করলে।

ওদিকে ভাই বোনের বাড়ীর পথে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ভাই বললে, “চাটার্জ্জীটা একটা boor (বর্ব্বর), দেখলেই বোঝা যায় কখনও ভদ্রসমাজে মেশে নেই।” বোন চটে উঠল, “দাদা, তোমার ঐ কেমন দড়াম করে কথা বলা অভ্যাস। টেনিসে একবার হেরেছ, তাইতে এত রাগ !” “এক বার কেন, দুবারই হেরেছি। শেষ সেট্‌টা ত তোকে ইচ্ছা করে জিতিয়ে দিলে। আমি ওসব ন্যাকামি দেখতে পারি না। ওকে আবার টেনিস্ বলে !” “কিন্তু ভদ্রলোকের manners (আদব কায়দা) আমার বড় ভাল লাগল।” “তোর খোসামোদ করছে কি না, তাই চমৎকার ভদ্রলোক ! ইস্কুলে পড়িস, সবাই কান মলে দেয়, খোশামোদ বড় মিষ্টি লাগছে। দেখ না, এই কাল পরশু একদিন ওর সঙ্গে singles খেলে দেব ঠুকে love set, ৬—০।” বাড়ী গিয়েই নেলী মাকে চেঁচিয়ে বললে, “মা, একজন নূতন

টেনিস খেলোয়াড় ক্লাবে এসেছে। কি সুন্দর তার ষ্টাইল, কি ভীষণ জোরে মারে! তার কাছে দাদা আজ হেরে গিয়ে ভয়ানক চটে গেছে।" মিসেস রুডার উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে, ভূপেন? কেউ নূতন সিবিলিয়ান এসেছে না কি? এখানে নিয়ে আসিস।" ভূপেন খুব হেনস্তা করে উত্তর দিলে, "না মা, মোটেই নয়, ডাঃ রে তাঁর কলেজের এক ছাত্রকে খেলতে এনেছিলেন। Funny fellow! তাকে দেখলে আমার হাসি পায়, কখনও আমাদের সেট-এ মিশেছে বলে বোধ হয় না।" মা মনে করলেন, নাই হল সিবিলিয়ান, জমীদার বড়লোকের ছেলেও হতে পারে, দেখাই যাক না। প্রকাশ্যে বললেন, "তা হোক গে, তোদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, রে-কে বলব তাকে একদিন এখানে খেলতে নিয়ে আসতে।" ছেলে বললে, "তা নিমন্ত্রণ কর, কিন্তু নেলী বাঁদরীকে বলে দাও যেন তার সঙ্গে অত গায়ে পড়ে ভাব করতে না যায়।" নেলী মুখ লাল করে জবাব দিলে, "বেশ করব, খুব করব, তোমার কি? মা, দাদা খেলায় হেরে গেলে ওর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়।"

পরদিন লেডী বি—র পার্টি। অমর নীল স্যুট পরে, বুকে এক লাল টুকটুকে কার্নেশন ফুল গুঁজে, গুরুজীর সঙ্গে North Crag কুঠীতে গেল। পাহাড়ের মাথায় সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিদিকে বাগান। পরিষ্কার আকাশ, ঠাণ্ডাও বেশী নেই, তাই খোলা বাগানেই পার্টির বন্দোবস্ত হয়েছিল। গাছে গাছে লাল নীল আলো, রঙ্গ বেরঙ্গের নিশান টাঙ্গান। বাগানময় ছোট ছোট

চায়ের টেবিল। খানসামারা ঘুরে ফিরে পরিবেশন করছে। ডাঃ রে অমরকে লেডী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে দিলেন, "আমার ছাত্র ওমর চাটার্জী, খুব ওস্তাদ টেনিস খেলোয়াড়।" লেডী সাহেব বললেন, "একদিন খেলতে আসবেন এখানে।" অমর নমস্কার করে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। দূরে এক টেবিলে গিয়ে বসল। মাষ্টার মহাশয় সাদা রঙ্গের সাহেব মেমদের পরিচর্য্যায় মেতে গেলেন। তাঁর বিশ্বাস যে এই বিশাল বঙ্গদেশে তাঁর সঙ্গে সাহেবদের যেমন একটা understanding (বোঝা-পড়া) আছে, তেমনটী আর কারও সঙ্গে নেই। সে যাহোক, কিন্তু অমর বেচারার একা একা হংসমধ্যে বকো যথা অবস্থা হল। এ সব ব্যাপার ত তার সত্যি রপ্ত হয় নেই! তা নইলে কোন রকমে পাঁচ জনের সঙ্গে জমিয়ে নিত। সে বিরলে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময়, "এই যে আপনি, একলাটী কি করছেন?" বলে একগাল হেসে নীলবসনা নীলিমা লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হল। অমর, "আমি ত কাউকে চিনি না, বসুন আপনি," বলতে বলতে একটা চৌকী এগিয়ে দিলে। দুজনে বসলে পর অমর জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আপনি কি নীল রঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রঙ্গের সাড়ী পরেন না? কি করে জানলেন নীল রঙ্গ আপনাকে এমন মানায়?" নেলী হাসতে হাসতে বললে, "নীল আমি বরাবরই ভালবাসি, তবে সাড়ী ত এই দুতিন বছর হল পরছি। নীলিমা নাম কি না, তাই বোধ হয় মা নীল ফ্রক পরাতেন।" বলে আবার হাসতে লাগল। কেন যে এরা দিবারাত্র হাসে কে

জানে! অমর বেচারা হাসির তরঙ্গে যেন খাবি খেতে লাগল! এমন সময় হঠাৎ, "কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, উঠিল সে ধ্বনি," অর্থাৎ কি না বোপেন সাহেব এসে উপস্থিত হল। দেখলে, কার উপর বোনটী এত হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। মুখ বেঁকিয়ে বললে, "নেলী, মা তোকে খুঁজছেন, পালা। গুড ইভনিং চাটার্জী।" নেলী চট্ করে কথা শোনবার পাত্র কি না প্রায়! সে অমরের হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করলে, "আপনিও আসুন না মার টেবিলে।" অমর মরমে মরে গেল। নইলে দেখতে পেত বোপেনের দুটী চোখ কি রকম জ্বলছে, যেন বনবেরাল। নেলী মা বাবার সঙ্গে অমরের আলাপ করে দিলে, "মা, ইনিই আমার বন্ধু, মিষ্টার চাটার্জী। তোমায় ত বলেছি এঁর কথা।" মিসেস রুডার খুব মিহি সুরে ইংরেজীতে বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল। আপনি না কি টেনিসে মস্ত ওস্তাদ! ছেলেরা রোজ বিকেলে বাড়ীতে খেলে। একদিন আসবেন।" অমর কৃতার্থ হল, কিন্তু হঠাৎ দেখে পশ্চাতে বোপেন। সে বুঝতে পারে না কেন বোপেনটা এই রকম পুলিসের দারোগার মত তার পেছনে পেছনে ঘুরছে। কিন্তু বোপেন বাঙ্গলা কলেজে বরাবর পড়ে আসছে, অমরের type চেনে খুব ভাল করেই। ও চীজ বাড়ী থেকে একটু দূরে রাখাই ভাল, এই তার বিশ্বাস। সে যাই হোক, বোপেনকে দেখে অমর ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, "কাজ আছে, মাপ করবেন, গুড বাই," বলে সরে পড়ল। রে সাহেবকে চারিদিকে

খুঁজতে লাগল। শেষে দেখে তিনি জনা তিন চার হোমরা চোমরা ইংরেজ জুটিয়েছেন, আর তাদের সঙ্গে বসে তাস খেলছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে অমর বাড়ী রওয়ানা হল। নীল সাড়ী, কাল চোখের ধ্যান করতে করতে কত যে ঠোক্কর খেলে, তার ঠিকানা নেই। বাড়ী পৌঁছে এক আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির বর্ণনা আপন মনে আওড়াতে লাগল। আহা! বিদ্যাপতি ঠাকুর যেন ঠিক তারই জন্য সে বর্ণনা লিখেছেন,—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥

* * *

প্রকট হাস অব গোপন ভেল

* * *

চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

বেচারা অমর, নিজের খেয়ালেই আছে! সাহেবরা ত বলে যে প্রেমের দেবতা অন্ধ। নীলিমার হাসি যে অধর ও দুপাটি দন্ত ছেড়ে কোথাও গোপন হয় নেই, তা দেখবার চোখ কি অমরের আছে! আর চলন, তা মরালের চেয়ে মর্কটের সঙ্গেই বেশী মেলে। কথাবার্ত্তার, হাসির, এমনই তোড় যে বাড়ীর ছাদ কাঁপে। তা এ সব কে বলবে অমরকে? অনুমতি পেলে আমাদের বোপেন বলত, বেশ রগড়েই বলত। হয়ত বলবেও

একদিন। আপাততঃ অমর চেয়ারে বসে, চোখ বুজে, কিশোরীর রূপ ধ্যান করতে লাগল। মেজর কখন ফিরে এলেন জানতেও পারে নেই। হঠাৎ পিঠে এক প্রচণ্ড চাপড় পড়ায় লাফিয়ে উঠল। শুনলে সাহেব বলছেন, "Lucky Devil! খুব কপাল তোমার। কোথায় আজ গেছলে জান? North Crag আর লাট-কুঠিতে তফাৎ কি? ওখানে কি যে সে নিমন্ত্রণ পায়! By the way, পরশু কডারদের বাড়ী টেনিস ও চায়ের নিমন্ত্রণ। মিসেস কডার তোমার উপর ভারী সন্তুষ্ট। And that little monkey Nellie, she's clean gone on you. আর নেলী বাঁদরী, সে ত তোমার প্রেমে হাবুডুবু।) She will be an awf'lly pretty gal some day. (একদিন বড় সুন্দরী মেয়ে হবে হে)!" অমর ভাবলে, "Will be, হবে! এর অর্থ কি? মেজর সাহেবের চোখে চালশে ধরেছে, তাই নীলিমার অপরূপ সৌন্দর্য্য আজও চোখে পড়ছে না।"

এই সব ভাবতে ভাবতে ডাক্তার সাহেবকে গুড নাইট বলে সে শুতে গেল। কিন্তু তার চিরদিনের বন্ধু ঘুম আজ আর কিছুতেই ধরা দেয় না! ছোকরাটী যে স্বভাবতঃ প্রেমপ্রবণ, তা নয়। বরং, এত বয়স হল, এর আগে কখন কোনও স্ত্রীলোকের দিকে ভাল করে চেয়েও দেখে নেই। আজ কিন্তু হাড়ে হাড়ে, বুঝছে যে তার দফা রফা! তবে অমরের সব দিক ভেবে কাজ করাটা জন্মগত অভ্যাস। তাই সে নিজের মনোভাবটাকে পাকা ডাক্তারের মত dissect করছে (চিরে দেখছে)। নেলীকে

ভালবেসেছে ; বেশ ত, নেলীকে বিয়ে করবে ; রুদ্র কিন্তু জাতে কায়েত ; তা হলেই বা ! ব্রাহ্ম-সমাজ আছে। মা কিন্তু মত করবেন না ; তা কি হবে ! পালিয়ে বিয়ে করবে। একটা জিনিস সে ধরে নিচ্ছে, যে রুদ্র-বাড়ীতে কোনও গোল হবে না। এই ত বিকেলবেলা নেলী তাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে মার কাছে বন্ধু বলে আলাপ করে দিলে। আবার রে সাহেব বললেন, নেলী তার প্রেমে হাবুডুবু। এর মানে ত সে আমারই মত মশগুল হয়েছে ! আদুরে মেয়ে, সে জেদ করলে রুদ্র কি আর রুদ্রমূর্ত্তি ধরতে পারবেন ? আর বিয়ে হলেই ত তার বিলেত যাওয়ার পথ সুগম হল—তার চিরদিনের সাধ পূরল। আর কারও খোশামোদের দরকার নেই। কি শুভ মুহূর্ত্তেই দার্জ্জিলিং এসে-ছিল ! এই সব জল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তৎ-ক্ষণাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপন দেখলে যে বোপেন রুডার এক নীলাম্বরী সাড়ী পরে তাকে খ্যাংরা নিয়ে তাড়া করেছে। বেচারা অমর ! এই রকমে ঘুমে, স্বপনে, ভয়ে, ভালবাসায় তার রাত কাটল। ভোর হতেই মাথায় এক মতলব এল। সে তাড়া-তাড়ি কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা জনশূন্য। হন হন করে হেঁটে একেবারে মহাকাল বাবার পাহাড়ের মাথায় উপস্থিত হল। আজ মেঘ মোটে নেই, উঠন্ত সূর্য্যের সোনালী আলো পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা কি সুন্দরই দেখাচ্ছে ! কি আশ্চর্য্য রঙ্গের খেলা ! কিন্তু আমাদের নায়কের মন তখন ভরপুর, তার বরফ দেখার অবকাশ কোথায় ! সে করলে কি, যেখানটায়

নিশান, ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি টাঙ্গান আছে, সেইখানে ঢুকে পড়ে লামাকে নমস্কার করে নগদ চার আনা তাঁর সামনে রেখে দিলে। লামাজী দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তখন অমর ঈষৎ হেসে, জোড় হাতে, বড় সন্তর্পণে, তার প্রার্থনা নিবেদন করলে. "লামা মহারাজ, আমাকে আপনি বলুন, আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে না!" লামা কি বুঝলেন তা ভগবান তথাগতই জানেন, কিন্তু এক কথায় জবাব দিলেন, "বেশক!" অমর খুব খুশী হল, কিন্তু সে ত লামাদের হিন্দুস্থানীর দৌড় কতটা, তা জানত না। কে জানে হয় ত ভাষাটা গুলিয়ে গেল, "আহাম্মক" বলতে গিয়ে লামাজী "বেশক" বললেন! অমর আরও খানিকক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে নেমে এল। Amherst Villa-তে একবার ঢুঁ মেরে গেল। হরেনরা সবাই রয়েছে, বসে চা খাচ্ছে। তাকে দেখে নরেশ হৈহৈ করে উঠল, "কোথায় থাক বাবা, একেবারে ডুমুর-ফুল হয়েছ যে! কিছু একটা মতলব বাগাচ্ছ, বন্ধু। তোমাকে আমি খুব চিনি।" অমর একটু আমতা আমতা করে এক পেয়ালা চা খেয়েই গুড-বাই বলে পালাল।

টিফিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে বসেই জাবর কাটতে লাগল। কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় বেলা ভিষ্টায় উপস্থিত হল। নীলিমা বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল, লাফিয়ে নেমে এল। কাছে এসেই চীৎকার করতে লাগল, "মিষ্টার চাটার্জী, কি হয়েছে জানেন? দাদা পাঁচ টাকা বাজী রেখেছে যে আপনাকে Singles খেলে

হারাবে। খবরদার, হারতে দেবেন না। আমার টাকার বড় দরকার। একটা এমন সুন্দর ভুটিয়া কুকুর আজ বেচতে এসেছিল!" অমর মন স্থির করে এসেছিল যে বোপেনের কাছে আজ হারবে। স্বপনে দেখা ঝাঁটাধারী সেই চেহারাটা এখনও যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু উপায় নেই, প্রণয়িণীর হুকুম। প্রথম থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় খেলে ৬-২-তে হারিয়ে দিলে বোপেনকে। সে মুখখানাকে ভীমরুলের চাকের মত করে মার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। "ওকে আবার ভদ্র-লোকের টেনিস বলে না কি! হতভাগা জেতবার যত রকম ফন্দী জানে, সব চালিয়েছে।" নেলী পর্য্যন্ত তার উপর একটু দরদ দেখালে না, উল্টো তখনই পাঁচ টাকা চেয়ে বসল। ইতিমধ্যে মেজর রে এসে পৌঁছেছেন, রুডার সাহেবও আপিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন চারজন পুরুষ মানুষে দু সেট খেলা হল, কিন্তু বোপেন এমন হাঁড়িপানা মুখ করে রইল যে খেলাটা মোটে জমল না। রুডার গিন্নী অত-শত বোঝেন না, ডাঃ রে-কে ও অমরকে খেয়ে যেতে বললেন। বোপেন কিছু বললে না। "একটু বেড়িয়ে আসি," বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। আজ সকালে সে নরেশের কাছ থেকে অমর সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছে, আর মনে স্থির করেছে যে যত শীঘ্র পারে ও Humbug টার (জোচ্চোর) এ বাড়ী আসা বন্ধ করবে। সন্ধ্যার আলো জ্বলতেই রুডার আর রে দাবা খেলতে বসলেন। মিসেস রুডার ভেতরে চলে

গেলেন, বোধ হয় ঘরকন্নার কাজে। নীলিমা অমরকে ধরলে "একটা গল্প বলুন। খেতে এখনও অনেক দেরী।" দুজনে বারান্দায় এক বেতের সোফায় বসল। অমরের গল্পে লাল পরী, সবুজ পরী, নীল পরী, এই রকম কত কি ছিল! নেলী তন্ময় হয়ে গল্প শুনছে, এমন সময় অমর তার মুখ নেলীর কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "নীলপরী, ঘুমিয়ে পড়লে?" পরী হো হো করে হেসে উঠল। ঠিক সেই সময়ে বোপেন বেড়িয়ে ফিরে এল। অমরের মুখ শুকিয়ে গেল। গল্প হঠাৎ বন্ধ হল। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "এই নেলী, মা কোথা রে?" নেলী বললে, "তুমি নিজে দেখ না। আমি গল্প শুনছি, বিরক্ত কোরো না, বলছি।" বোপেন রাগে গরগর করতে করতে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে ঢং ঢং করে খানার ঘণ্টা পড়ল। সবাই খানা-কামরায় ঢুকলেন। অমরের জায়গা টেবিলের এক কোণে, নীলিমার জায়গা আর এক কোণে। এটা বোপেনের কারসাজী। সচরাচর বাইরের লোক থাকলে নীলিমা টেবিলে স্থান পায় না। আজ, বোধ হয়, নিজেই মাকে বলেছিল। খানা আরম্ভ হল। অমর একটু নিরাশ হয়েছে ত, তাই ভাল করে খাচ্ছে না। এমন কি টাটকা পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজা পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দিলে। নেলী চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। আমি ভয়ানক রাগ করব।" রে হেসে উঠলেন, "Sweet-heart, তুমি আমায় ছেড়ে দিলে না কি? আমি খাচ্ছি কি না খাচ্ছি, তা ত একবারও ফিরেও দেখছ না। Lucky

dog, চাটার্জী!" নেলী রাগের ভাণ করে বললে, "আপনাকে আমি কবে বললাম, যে আপনি আমার Sweet-heart!" বোপেনের রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, "নেলী, এই রকম চেঁচামেচি করবি, ত কাল থেকে কখনও টেবিলে আসতে পাবি না!" মা ছেলের অকারণ রাগ দেখে বললেন, "কেন ছেলে-মানুষকে খেপাচ্ছিস, ভুপেন! তুই নিজে খা ত।" বোপেন মনে মনে বললে, "বেশ, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব।"

খাওয়ার পর অমর নীলপরীর গল্পটা শেষ করতে বসল। রে চুরুট ধরিয়ে বিদায় নিলে, "আমি যাচ্ছি, তুমি বেশী দেরী কোরো না, অমর।" বোপেন সেই বারান্দায় চুপ করে বসে রইল এক কোণে। খানিক পরে অমর উঠল, সবাইকে গুড নাইট বলে বের হল। নেলী বললে, "সুন্দর চাঁদের আলো, চলুন আপনাকে ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।" পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, তবু নেলী ফেরে না। বোপেন এক লাফে উঠে বেরিয়ে গেল। দেখে, বোনটী অমরের সঙ্গে ফটকের বাইরে পায়চারি করছে, দুজনেই হাসছে। গম্ভীর গলায় ডাকলে, "নেলী, ভেতরে আয়, মা ডাকছেন।" নেলী উত্তর দিলে, "দাঁড়াও না বাপু, এই এলাম বলে এক মিনিটে।" বোপেন রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "না, এখনই চলে আয়। চালাকী চলবে না।" নেলী মুখ ভার করে ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। তার পর বোপেন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে অমরের কাঁধে হাত রাখলে। অমরের মনে হল যেন কাঁধটা জাঁতি-কলে পড়েছে। ফিরে দেখলে

চাঁদের আলোতে ভোপেনের চোক দুটো যেন জ্বলছে। ভোপেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "অমরনাথ বাবু, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এ বাড়ীতে ফের কখনও ঢুকবেন না! বুঝলেন আমার কথাটা? আর যেন বলতে না হয়!" একটুক্ষণ অমরের মুখে কথা সরল না। তার পর আস্তে আস্তে বললে, "ভূপেনবাবু, আমি যাচ্ছি। আর এ বাড়ীতে আসব না। কিন্তু শুনুন, আপনি বড় লোকের ছেলে বলে আপনার কোন অধিকার নেই আমাকে অপমান করবার। আমি ত যেচে আসি নেই আপনাদের বাড়ীতে। আমার কাঁধ ছাড়ুন।" ভোপেন অমরের কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সশব্দে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। অমরের সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে। অনেক কষ্টে টলতে টলতে **Amherst Villa**-য় গিয়ে পৌঁছল। ভাঙ্গা গলায় "হরেন, হরেন", বলে ডাকলে। হরেন বেরিয়ে এল। বন্ধুর মুখ দেখে শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, অমর?" অমর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "তুমি ভূপেন রুদ্রকে চেন?" "খুব চিনি। সে যে আমার সঙ্গে পড়ে!" "সে আমায় আজ বড় অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।" "তোমাকে অপমান করেছে? তা ভাই, আমার কথা যদি শোন, ত ওর পথ আর মাড়িও না। অত্যন্ত গোঁয়ার। আর বলাই চাটুজ্যের কাছে যা ঘুষো খেলা শিখেছে, সে অতি ভীষণ।" অমর শুকনো গলায় বললে, "তাহলে ভাই যদি আশ্রয় দাও, ত আজ তোমার এখানেই থাকি। কাল ডাঃ রে-র ওখান থেকে জিনিসপত্র

আনিয়ে নিয়ে নেমে যাব।" সে রাত্রি অমর Amherst Villa-তেই রইল। পর দিন হরেন মেজর রে-কে চিঠি লিখলে যে অমর তার বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আজই নেমে যাবে, যদি ডাক্তার সাহেব অনুগ্রহ করে মালপত্রগুলো পাঠিয়ে দেন। সেই দিনই অমর কলকাতা চলে গেল। ভবানীপুরে পৌছলে তাকে দেখে তার মা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন, "হ্যাঁ রে, এ কি চেহারা হয়েছে! সমস্ত মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে। এর নাম তোদের পাহাড়ে হাওয়া-বদল করতে যাওয়া?" অমর বোঝালে যে পেটে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছিল। হৃদয়ের ব্যাধির কথাটা কাউকেই বললে না!

মালকোষ

সেকালের দি গ্রেট রয়াল সার্কাসের নাম আপনারা শুনেছেন কি? হয়ত কখন শোনেন নেই। অনেক কালের কথা হয়ে গেল ত! কিন্তু তখনকার দিনে লোকে বলত—এমনতর আশ্চর্য্য সুন্দর ঘোড়ার খেলা আর কোন সার্কাসে দেখা যায় না, খাস বিলেতী সার্কাসেও নয়। এই সার্কাসের মালিক ছিলেন বাপু সাহেব গোখলে। শুধু মালিক নয়, তিনিই ছিলেন ট্রেনার, তিনিই ছিলেন প্রধান খেলোয়াড।

সাহেবী ইভনীং ড্রেস পরে, সলমা চুমকীর কাজ করা এক লাল মখমলের টুপী মাথায় দিয়ে, হাতে লম্বা চাবুক নিয়ে গোড়াতেই তিনি আসরে নামতেন। কাঁচা সোনার মতন রঙ্গ, বিশাল ছাতি, শাল গাছের মতন দীর্ঘ সরল দেহ—ভারী সুন্দর দেখাত ভদ্রলোককে রিং-মাষ্টারের সাজে! ছ-ছটা বড় বড় ওয়েলার ঘোড়া তাঁর চোখের ইশারায় দৌড়ত, লাফাত, ঘুরত, ফিরত, যেন ছাগল-ছানা! খানিকটা বাদে তিনি সাজ বদলে ব্রীচেস্ পরে চাবুক সওয়ারের বেশে আবার বেরোতেন এক দুর্দ্দান্ত বজ্জাত টাট্টু ঘোড়ায় চেপে। না ছিল রেকাব, না ছিল রাশ। ঘোড়াটাকে দুই হাঁটুর মাঝে টিপে ধরে তাকে যেমন খুশী খেলাতেন। ঘোড়া কখন বা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে

ভালুকের মতন হাঁটত, কখন বা পিঠটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে বারকতক ভীষণ লাফ মারত, কখন বা মাথাটা মাটি পর্য্যন্ত নামিয়ে পেছনের পা ঘন ঘন ছুড়ত। সওয়ারের দৃকপাতও নেই। অচল পাথরের মত বসে আছেন। মাঝে মাঝে উপহাস করে বলছেন "বাঃ, বেটা!" "সাবাস, জওয়ান!" দর্শক মণ্ডলী, বিশেষ করে গ্যালারীনশীন দর্শক, আনন্দে অধীর হয়ে হাততালি দিচ্ছে, আর "কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!" বলে তারীফ করছে।

গোখলের সার্কাসে এক প্রকাণ্ড জটাধারী কাফ্রীদেশের সিংহ ছিল। তাকেও খেলাতেন কর্ত্তা স্বয়ং। আর, সে খেলাও ছিল আজগুবি রকমের। বাপু সাহেব চুড়ীদার পায়জামা ও জলজলে নীল মখমলের ফতুই পরে, মাথায় ফিকে আসমানী রঙ্গের মুরেঠা বেঁধে সেতার হাতে সিংহের পিঞ্জরায় ঢুকতেন। ঢুকেই মাথা হেট করে সেলাম করতেন, আর সিংহটা ধীরে ধীরে কাছে এসে ভুঁইয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম' করত। বাপু সাহেব ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না! একটুক্ষণ দুজনের কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি কথা হত। তার পর বাপু সাহেব আসন-পীড়ি হয়ে বসে সেতার বাজাতে সুরু করে দিতেন। যত ক্ষণ রাগিণী আলাপ হত, সিংহ মহারাজ চুপ চাপ বসে শুনতেন। কিন্তু যেই ওস্তাদ গৎ ধরলেন, কি সিংহও উঠে মাথা নেড়ে তাল দিতে দিতে নেচে নেচে হেলে দুলে টহল দিতে আরম্ভ করলেন ওস্তাদের চারিদিকে। জটায় কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট ঘুঁঘুর বাঁধা থাকত, সেগুলো বাজতে লাগল ঝুমুর, ঝুমুর! লোকে মোহিত হয়ে যেত। বার

বার তালি পড়ত। কোন কোন দিন তিনটে চারটে গৎ পর্য্যন্ত বাজাতে হত। এ কি সহজ ব্যাপার! একটা জলজীয়ন্ত সিংহ দাড়ী নেড়ে তাল দিচ্ছে!

একটা গুজব রটে গেছল, বাপু সাহেব নাকি মন্ত্র-সিদ্ধ পুরুষ, জাদুর জোরে জানোয়ার পোষ মানাতে পারেন। কথাটা সত্য কি না, কে জানে! তবে এটা আমরা জানি যে তিনি দেশ বিদেশে আড়গড়ায় আড়গড়ায় ঘুরে, বেছে বেছে কুলক্ষণ বজ্জাত ঘোড়া জলের দরে কিনতেন। কিনে দুই একবার তার ঘাড়ে কাঁধে হাত বুলিয়ে দিলাসা দিতেন, কানে কানে চুপি চুপি কি বলতেন, হয়ত বা আদর করে এক আধ কুচো আক খাওয়াতেন, তার পরে তড়াক্ করে লাফ মেরে তার পিঠে চেপে বসতেন। বসামাত্র সেই পাজী ঘোড়া একেবারে সুবোধ বালক বনে যেত। তার সমস্ত আয়েব যেন উবে যেত। কিন্তু তাই বলে ছমাস পর্য্যন্ত তিনি নিজে বই আর কেউ সে ঘোড়ার ত্রি-সীমানায় ঘেসতে পারত না!

মন্ত্রতন্ত্রের কথা জানি না, তবে একটা কথা আপনাদিকে বলতে পারি। বাপু সাহেব সেতার কি বেহালা ধরলে, শুধু পশু কেন, মানুষ অবধি যেন কেমন কেমন হয়ে যেত, সাড় থাকত না। সময়ে সময়ে ভোরবেলায় উঠে তিনি সেতার নিয়ে তাঁর পশুর দলকে বিভাস, ভৈরোঁ, তোড়ী শুনিয়ে আসতেন। চাকর-বাকর-গুলোও এসে বসে যেত চারিদিকে, তন্ময় হয়ে বাজনা শুনত। বাজনা শেষ হয়ে গেলেই কিন্তু মনিব এক হুঙ্কার ছাড়তেন, "ওঠ,

ব্যাটারা! কাজকর্ম্ম করতে হবে না! সকাল থেকেই কুড়েমি!" হুড়মুড় করে পালাত সব, যে যার কাজে।

এই রকম করে দশটী বছর পশ্চিমে আদেন বন্দর থেকে পূর্ব্বে হংকং দ্বীপ পর্য্যন্ত দেশবিদেশে সার্কাস নিয়ে ঘুরে ঘুরে গোখলে বিস্তর যশ ও অর্থ সঞ্চয় করলেন। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে নিজের গ্রাম দেওগড়ে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসতেন। বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, কেউ ছিল না। ভাঙ্গা পেশোয়াই আমলের পৈত্রিক কেল্লাটীর একটী ঘরে একা একা তাম্বুরা সেতার নিয়ে কাটাতেন; বাপ, সরদার নানা সাহেব গোখলে, সর্ব্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে গেছেন। ছেলের সাধ ছিল যে ঘোড়া নাচিয়ে অর্থ সঞ্চয় করে একদিন সরদারী ঠাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু সে ঝোঁকও ইদানীং কমে গেছে। গেল বছর কাশীতে এক দৈবজ্ঞ বাপু সাহেবের হাত দেখে বলেছিল যে সম্মুখে তাঁর এক বিষম ফাঁড়া আছে—বন্য পশুর হাতে তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা—তিনি যেন শিকার খেলতে কখন না যান। শুনে বাপু সাহেব খুব হেসে উঠেছিলেন। দৈবজ্ঞ ঠাকুর ত জানতেন না যে তাঁর জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে নিত্য কারবার!

তাই বলে বাপু সাহেব কি ভয় পেয়েছিলেন? মোটেই না। ভয়-ডর কাকে বলে, তিনি জানতেন না। মরণকে তিনি ডরাতেন না। আপন মনে বলতেন, "পয়সা ঢের রোজগার করেছি, মজাও ঢের লুটেছি, এইবার না হয় মরব! আর, বুনো জানোয়ারের হাতে হঠাৎ মরা, রোগে ভুগে মরার চেয়ে সে ঢের ভাল।

আমি ত কম জুলুম করি নেই জানোয়ারগুলোর উপর! একদিন ওরা প্রতিশোধ নিতে চাইবে বই কি!"

এই রকমে গোখলের দিন কেটে যাচ্ছিল।

লাহোরের উপকণ্ঠে এক বড সরাই। বাহিরে সড়কের ধারে এক খোলা ময়দানে গোখলের সার্কাসের ডেরা পড়েছে। সন্ধ্যাবেলা, চারিদিকে কিট্‌সন বাতির রোশনাই। এক প্রকাণ্ড শামিয়ানা উঠেছে। তার ভেতরে ছুতোরের দল হাতুড়ী পেরেক নিয়ে ঠক্‌ঠকাঠক্ করে গ্যালারী আঁটছে। চাকর লোকজন রঙ্গ বেরঙ্গের পরদা নিশান টাঙ্গাচ্ছে। হৈ হৈ ব্যাপার লেগে গেছে। শামিয়ানার পেছনে খানিকটা জায়গা কানাত দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে রয়েছে যত জন্তু জানোয়ার। কাপড়ের তৈরী লম্বা লম্বা আস্তাবলে বাঁধা রয়েছে সারি সারি ঘোড়া। এক পাশে দুটো মস্ত মস্ত গরাদে দেওয়া পিঞ্জরা। তার একটাতে এক জটাধারী সিংহ, অন্যটাতে দুটো কালো রঙ্গের চিতা বাঘ। দূরে এক গাছতলায় বাঁধা গোটা তিনেক হাতী। ঘোড়ার হ্রেষারবে বাঘ সিংহ-হাতীর গর্জ্জনে সমস্ত জায়গাটা গম্ গম্ করছে। বাপু সাহেব খানিক আগে এসে পৌঁছেছেন। চারিদিক সব দেখে শুনে গিয়ে এইমাত্র সরাইয়ে বসেছেন। সেখানে তাঁর বাসের জন্য দুটো বড় বড় কামরা সাজান ছিল। তার সামনে বারান্দায়

লম্বা কেদারায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর কানে এল সেতারের আওয়াজ। মনে হল, যেন কেউ খুব নিকটেই সেতার বাজাচ্ছে। আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু। কি সুন্দর মিঠে হাত লোকটার! চাকরকে হাঁক মারলেন, "ওরে কে আছিস? দেখ ত, সেতার বাজছে কোথায়? পাশের কামরায় কেউ লোক আছে না কি?"

চাকরটা মিনিট খানেকের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, "হুজুর! ঐ কোণের কামরাটায় সেতার বাজছে। কিন্তু মানুষ কেউ নেই। আপনা হতে বাজছে।"

বাপু সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "ব্যাটা, ইয়ারকী করার আর জায়গা পেলি না! আজ সিদ্ধির মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছে বুঝি!"

লোকটা জোড় হাত করে জবাব দিলে, "দোহাই হুজুর, সত্যি কথা বলছি। এক হরফও বাড়িয়ে বলি নেই। কামরাতে কেউ নেই; সেতারটা আপনা হতে টুং টুং করছে।"

"আচ্ছা, একটা লণ্ঠন নিয়ে আমার সঙ্গে চলে আয়," বলে বাপু সাহেব উঠলেন। দোয়ার গোড়া অবধি গিয়ে কান পেতে শুনলেন,—"হ্যাঁ, এই কামরার মধ্যেই ত সেতার বাজছে! মানুষ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু কে যেন গুন গুন করে সেতারের সঙ্গে গাইছে। ব্যাপারখানা কি দেখতে হবে ত!"

চাকরটা ভয় পেয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাত

থেকে লণ্ঠনটা ছিনিয়ে নিয়ে বাপু সাহেব এক লাফে কামরায় ঢুকে পড়লেন। দেখলেন যে এক কোণে একটা সেতার দেওয়ালে ঠেসান রয়েছে। তার থেকে দিব্যি পরিষ্কার মালকোষ রাগ বেরোচ্ছে। পাশেই একেবারে দেওয়াল ঘেসে একজন লোক চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। ময়লা ইজার পিরান পরা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল! বাপু সাহেব ডাকলেন, "কে হে তুমি? এখানে কি করছ? ওঠ, ওঠ।" কোন জবাব নেই। বাপু সাহেব তাকে জোর করে এক ঠেলা মেরে ফের বললেন, "ওঠ, ওঠ, জলদী!"

লোকটা হুড়মুড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। উঠে সসম্ভ্রমে আদাপ করে জিজ্ঞাসা করলে, "হুজুর আমাকে কিছু হুকুম করছিলেন?" হঠাৎ সেতারের বাজনা থেমে গেল!

বাপু সাহেব দেখলেন, জোয়ান ছোকরা, চোখ দুটো জবা ফুলের মতন লাল। একটু কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ, আমি ডাকছিলাম তোমাকে। কে তুমি?"

লোকটা হাত জোড় করে উত্তর দিলে, "আমি গরীব মিস্কীন ভিখারী হুজুর। আমার নাম আহমদ খান। মেহেরবানি করে আজ রাতটা এই খানে পড়ে থাকতে দেন। কাল উঠে আবার পথ ধরব।"

"তুমি কি সেতার বাজাতে পার?"

"হ্যাঁ, জনাব, পারি একটু একটু। গান গেয়েই ত ভিক্ষা মেগে ফিরি।"

"আজ থেকে আর তোমাকে ভিক্ষা মাগতে হবে না। তুমি আমার কাছে থাকবে। আমি তোমাকে যত্ন করে গান শেখাব। কি বল?"

আহামদ জোরে মাথা নেড়ে জবাব দিলে, "না হুজুর, না, না! আমি ঘরে বাঁধা থাকব না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে আমি বড় ভালবাসি।"

"আমি ত ঘরে থাকি না, আহ্মদ! আমিও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। তোমাকে আমি ছাড়ছি না। না, বললে চলবে না। থাকতেই হবে আমার সঙ্গে। চল, সেতার তুলে নাও," বলে লণ্ঠনটা তুলে আহমদের মুখের সামনে ধরে বাপু সাহেব এক দৃষ্টে তার চোখের পানে তাকালেন।

আহমদের কেমন ঠিকে ভুল হয়ে গেল। তার মুখে কথা সরল না। সে সেতারটা হাতে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বাপু সাহেবের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বাপু সাহেব সে রাত্রি আহমদকে নিজের ঘরেই শুইয়ে রাখলেন। সেতারটাও সেই ঘরে রইল। কিন্তু কই রাত্রে ত আর বাজল না! বাপু সাহেবের কেমন ভাল করে ঘুম হল না। ভোর বেলা উঠে স্নানাহ্নিক সেরে এসে আহমদকে জাগালেন। বললেন "ওহে ওঠ, অনেক বেলা হয়ে গেল। আমার চাকরের সঙ্গে যাও। মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে এস। তার পর গল্পস্বল্প করা যাবে।"

আহমদ বেরিয়ে গেলে বাপু তার সেতারটা হাতে নিয়ে উলটে

পালটে অনেক পরীক্ষা করলেন। পরদা সরিয়ে দুচারটা গৎও বাজালেন। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখলেন না। খুব পুরোনো যন্ত্র, আওয়াজ খুব মিঠে, এই যা! "তা হলে কাল রাত্রের ব্যাপারটা কি রকম হল! সেতারে আপন হতে মালকোষ বাজছে, এ ত নিজের কাণে শুনলাম! ও ছোকরা ত তখন নিভাঁজে ঘুমোচ্ছিল।"

আহমদ ফিরে এলে তাকে আদর করে কাছে বসিয়ে এক বাটি চা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, মন স্থির হল? আমার কাছে থাকবে ত?"

"হুজুর, আপনার হুকুম অমান্য করবার সাধ্য আমার নেই।"

"বেশ, বেশ, আমি বড় খুশী হলাম। আমি তোমাকে খুব ভাল করে গান বাজনা শেখাব।"

"হুজুরের যেমন মরজী।"

"আচ্ছা, আহমদ! কাল রাত্রে আমি বুঝতে পারি নেই। তুমি বড় ঘরের ছেলে, না হে?"

"হ্যাঁ, জনাব।"

"দেখ আহমদ! আমি তোমার নামটা বদলে রাখতে চাই। আজ থেকে তোমার নূতন নাম হল, শেরদিল খান। আর দেখ, দাড়ীটা আর কামিও না। দাড়ী গোঁফ রাখলেই চেহারা অন্য রকম হয়ে যাবে। হঠাৎ তোমার আপনার লোক কেউ দেখলে চিনতে পারবে না।"

"সেই খুব ভাল হবে, হুজুর। আমি আপনার লোকের কাছে মুখ দেখাতে চাই না।"

"কেন, আহমদ? তোমার এ হাল হল কি করে? তোমার জীবনের কাহিনী আমাকে বলবে না?"

আহমদ হাত জোড় করে বললে, "থাক, হুজুর, সে সব কথা। আমাকে ভূতে পেয়েছিল।"

"আচ্ছা, থাক। কিন্তু একটা কথা শুধু আমাকে বল। তোমার এই যন্ত্রটা কি আপনা আপনি বাজে, আহমদ? কাল রাত্রে বাজছিল। আমি স্পষ্ট শুনেছি।"

"মালকোষ বাজে, জনাব, ওর যখনই প্রাণ চায়। ও আমার ওস্তাদজীর সেতার। তিনি মালকোষ-সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।"

"কে তোমার ওস্তাদ? কোথায় থাকেন তিনি?"

"তিনি ত আর এ দুনিয়াতে নেই হুজুর। আমার বড় দুঃখের দিনে গিয়ে তার পায়ে পড়েছিলাম। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন—", পাগড়ীর খুঁট দিয়ে চোক মুছে আহমদ ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "সেই থেকে আমি পথে পথে ঘুরছি, জনাব। আমার আর জীবনে কোন কাজ নেই। ও সব পুরোনো কথা যাক গে, সাহেব। আজ থেকে আমার নূতন কাজ হল, আপনার সেবা। আপনিই আমার ওস্তাদ, আপনিই আমার মালিক।"

"আচ্ছা, তোমার সে ওস্তাদের কথা আর কইব না, যদি তোমার তাতে কষ্ট হয়। তবে আমাকে এইটুকু বল। তিনি মালকোষ সাধনা করতেন কেন?

"আমি ত তা জানি না, হুজুর! আমি তাঁর সাকরেদ হওয়ার ঢের আগে থেকে তিনি ও সাধনা করেছিলেন। আমাকেও—", কি বলতে যাচ্ছিল, সামলে নিলে।

বাপু সাহেব একটু হেসে নূতন শিষ্যের মাথায় হাত রেখে বললেন, "ভগবান তোমাকে সুখী করুন, সাকরেদ। কিন্তু খবরদার, আমার কথা শোন। মালকোষ সাধনা বড় ভয়ানক জিনিস। ও পথে যেও না।"

আহমদ একটু চুপ করে রইল। তার পর উঠে বাপু সাহেবের পায়ের ধুলো নিয়ে জবাব দিলে, "জনাব, আপনি আমার মালিক। যে পথ আমাকে দেখাবেন, সেই পথেই যাব।"

পাঁচ বছর কেটে গেছে। আহমদ মনিবের সঙ্গে দেশ বিদেশ ঘুরছে। বেশ সুখেই আছে বলে মনে হয়। মুখের সে উদ্ভ্রান্ত ভাবটা কেটে গেছে। গায়ে একটু মাংসও লেগেছে, বোধ হয়। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় পরে বাপু সাহেবের কাছাকাছিই থাকে। রোজ সকাল বেলা নিয়মিত ঘণ্টাখানেক গানের বৈঠক বসে। ছুটির দিন কখন কখন সন্ধ্যাবেলাও সঙ্গীত-চর্চ্চা হয়। মাঝে মাঝে বাপু সাহেব তাঁর বন্ধুবান্ধবের বাড়ী শেরদিল খান ওস্তাদকে গাইতে নিয়ে যান। ওস্তাদের গলা ভারী সুরেলী, সুর তান লয় একেবারে নিখুঁত। তবে একটা

জিনিস অনেকেই লক্ষ্য করত। লোকটা গাইত যেন কলের পুতুল। গাইবার সময় মুখের ভাব এতটুকু বদলাত না। “ক্যায়সে কাটোঙ্গী রয়না পিয়া বিনা” গাইতেও মুখের ভাব যেমন, “বহুত দিননসে পিয়া ঘর আয়ো” গাইতেও মুখ সেই একই রকম। যেন গানের কথাগুলো তার মনের ভিতরই যাচ্ছে না। গান ধরবার আগে বাপুসাহেব রাগিণী ধ্যান করে হুকুম দিতেন “অমুক রাগ”, তার পর সে গান ধরত। তবু, আহমদ যে ওস্তাদ গাইয়ে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে জানে, হয়ত বাপু সাহেব ইচ্ছা করেই তাকে মনের কোন রকম স্বাধীনতা দেন নেই।

আহমদের সেই পুরানো সেতারটা আজ পাঁচ বছর বাক্সে বন্ধ আছে। মনিবের হুকুমে সে সেটার তারগুলো সব খুলে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আহমদ করুণ নয়নে বাক্সের পানে চাইত, কিন্তু মুখে কখন কিছু বলত না। একদিন বাপু সাহেব বলেছিলেন, “সাকরেদ, তোমার সেই পুরানো ভুতুড়ে সেতারটা বাক্স-বন্ধ করে রেখে দিয়েছি বলে তোমার মনে কষ্ট হয় না ত?”

আহমদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, “আমার আবার দুঃখ কি, হুজুর? আপনার হুকুম তামিল করাই আমার সুখ।”

মালকোষ রাগ সম্বন্ধেও বাপু সাহেবের সঙ্গে সাকরেদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছল। বাপু বলেছিলেন, “শেরদিল, তুমি এখন কিছুকাল মালকোষ গেও না। দেখ, মালকোষ,

হিন্দোল, বসন্ত, এ রাগগুলো আমি মোটে ভালবাসি না। ওগুলো পাগল উদ্ভ্রান্ত লোকের গাইবার রাগ। পঞ্চম স্বর বর্জ্জন করলে কি গানের বাঁধুনি থাকে? ওগুলো তুমি গেও না, বুঝলে?"

আহমদ তার নিত্য অভ্যাসমত উত্তর দিয়েছিল, "যে আজ্ঞে, ওস্তাদজী। আমি ও রাগগুলো গাইব না।" গাইতও না। কিন্তু মাঝে মাঝে চাঁদনী রাতে আকাশ পানে চেয়ে তার মনে হত যেন কে গুন গুন করে মালকোষ গাইছে! কে গাইছে? নীল আকাশে ঐ খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলো কি মালকোষ গেয়ে নাচতে নাচতে ভেসে বেড়াচ্ছে? না, আমি শুনতে চাই না ওদের গান! মেঘের মাঝে কার মুখ ঐ দেখা যাচ্ছে? যাও, তোমরা যাও, চলে যাও, আমি দেখতে চাই না ও মুখ!

বাপু সাহেব হয়ত ডাকলেন, "কি শেরদিল, ঘুম হচ্ছে না?"

আহমদ তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, "ঘুমোচ্ছিলাম ত, হুজুর! বোধ হয় স্বপন দেখে থাকব।"

এই রকম কয়েকবার হবার পর একদিন বাপু সাহেব সাকরেদকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, "আহমদ খান, তুমি রাত্রে শুয়ে কি বিড়বিড় কর, বল দেখিনি। আমার কাছে মনের কথা লুকিয়ে ভাল করছ না।"

"আমার পুরানো দুঃখ-কষ্টের কথা বলে আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করি না, জনাব। আপনার দয়াতে, আপনার আদর যত্নে, ধীরে ধীরে সব পুরানো কথা ভুলে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, বেশ, আমি আরও কিছুদিন তোমাকে সময় দেব। দেখি, তোমার মন আপনা থেকে শান্ত হয় কি না। কিন্তু মনে রেখো, আমার যে দিন ইচ্ছা হবে, সেই দিনই তোমার অন্তরের লুকানো কথা আমি টেনে বার করব। সে ক্ষমতা আমার আছে, জান ত?"

আহমদ জোড় হাত করে বললে, "হুজুর মালিক, গরীবকে দয়া করবেন।" এই কথাবার্ত্তার ফলে আহমদ হপ্তা দুই তিন কেমন মুষড়ে রইল। দিনের পর দিন মুখটী ম্লান করে ফিরত, যেন মনে একটা কি বিষম দুশ্চিন্তা এসে ঢুকেছে। ব্যাপারটা, বোধ হয়, বাপু সাহেবের নজরে পড়ল, কেন না একদিন তিনি আহমদকে তাঁর তাঁবুর ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "দেখ আহমদ, তোমার হল কি? চেহারা অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? রোজ সন্ধ্যাবেলা সার্কাসের সময় একলাটী বসে বসে কাটাও, তাই যত রাজ্যের ভাবনা চিন্তা তোমার মাথায় এসে ঢোকে! এ ত ভাল নয়! একটা নিয়মিত কাজে লেগে যাও না!"

"হুজুর হুকুম করলেই লেগে যাব। কিন্তু আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি না, কুস্তী-কসরৎও করতে পারি না। সার্কাসে আমার মতন লোকের দ্বারা কি কাজ হবে, জনাব?"

"আর কিছু না জানলেও গান বাজনা ত জান। আমার ব্যাণ্ড-এর ভার নেবে?"

আহমদ কোন উত্তর দিলে না। মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইল। বাপু সাহেব একটু ভেবে বললেন, "আচ্ছা, দরকার নেই

তা করবার। তোমার একটা কলাবন্ত বলে খ্যাতি হয়েছে। ব্যাণ্ড-এর বাজনদার হলে হয়ত ইজ্জতের হানি হবে।"

আহমদ তখনও নীরব। বাপু একটু হেসে বললেন, "দেখ শেরদিল, একটা কথা আমার মাথায় এসেছে। ওস্তাদের কাজ ত রাজা-বাদশাহকে গান বাজনা শোনান! তুমি আমার সিংহ মহারাজকে বাজনা শোনাবে?"

আহমদ এ প্রশ্নের অর্থটা ঠিক বুঝলে না। জবাব দিলে, "কেন শোনাব না, হুজুর? হুকুম হলেই শোনাব।"

"পিঞ্জরার ভেতরে গিয়ে কিন্তু শোনাতে হবে। রাজী আছ? ভয় করবে না ত?"

"হুজুর যার সহায় রয়েছেন, তার ভয় কি! হুকুম করুন, আমি এখনই যাচ্ছি পিঞ্জরার মধ্যে।"

"না হে, না! তোমাকে একলা যেতে হবে না। আমার সঙ্গে যাবে। আমি যেমন রোজ সেতার বাজাই, সেই রকম তুমি বাজাবে। আমি তোমার পাশে বসে থাকব। লোককে আমি দেখাতে চাই যে আমি যাকে খুশী সিংহের খাঁচার মধ্যে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার সেতার বাজাতে হবে। তোমার সেই ভুতুড়ে সেতারটাকে নিয়ে যাওয়া হবে না। বুঝলে? আর দেখ, গৎ যা বাজাবে, হালকা রকমের। ঝিঝিট কি খাম্বাজ কি ইমন কল্যাণ বাজাবে বেশ জলদ তালে। তোমার ঐ মালকোষ হিন্দোল চলবে না।"

আরও বছর দুই কেটে গেছে। আহমদ এখন রোজ সার্কাসে মনিবের সঙ্গে পিঞ্জরায় ঢুকে সিংহ মহারাজকে সেতার শোনায়। বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়—সিংহের খাঁচায় ওস্তাদ শেরদিল খানের জলসা! সবাই আসুন! সবাই শুনুন! আজব জিনিস! অভূত পূর্ব্ব!

আহমদের এ কাজে খুব উৎসাহ। কত নূতন নূতন গৎ সে যে মাথা থেকে বার করে, তার ইয়ত্তা নেই! বাপু সাহেব হাসি মুখে মাঝখানে আসর জমকে বসে থাকেন। যখন নাচ আরম্ভ হয়, তখন তাল দেন, আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলেন, "বাঃ বাঃ! সাবাস, সাবাস!" লোকের বিশ্বাস, নাচটা এখন আগের চেয়ে ঢের বেশী জমে। সত্য কথা! সিংহ যেন বুঝতে পেরেছে যে, এ সেতারী তার প্রভু নয়, তারই মতন কয়েদী, গোলাম। তাই দুজনের মধ্যে যেন একটা আন্তরিক স্নেহ সম্বন্ধ হয়েছে। নাচের সময় মাঝে মাঝে সিংহ একটু হেসে আড় নয়নে আহমদের দিকে তাকায়। সিংহ যে হাসে আপনারা হয়ত বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বাপু সাহেব ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন, কেন না একদিন আহমদকে ঠাট্টা করে বললেন, "সাকরেদ, এইবার একটা সিংহী কিনব, আর তোর সঙ্গে বিয়ে দেব।"

একদিন হল কি, আগরা শহরে সার্কাস হচ্ছে। সিংহের নাচ শেষ করে আহমদ একটা টুল নিয়ে ব্যাণ্ডের কাছে বসেছে। হঠাৎ তার নজর গেল সামনের বক্স-এর দিকে। সেই বক্স-এ বসে রয়েছেন এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক। পায়ের কাছে বসে

এক দাসী ধীরে ধীরে পাখা নাড়ছে। সুন্দরীর বয়স পঁচিশ আন্দাজ হবে। সর্ব্বাঙ্গে জড়োয়া গহনা। জরীতে ঝলমল করছে তার ওড়না কাঁচুলী।

আহমদ কিছুতেই সে দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। আজ সাত বছর হল সার্কাসে ত সে কত রূপসী দেখছে, কিন্তু কই কোন দিন তো তার মনটা এমন হয়ে যায় নেই! এ মুখ চেনা-চেনা কেন মনে হচ্ছে? ব্যাণ্ড-মাষ্টারকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "মাষ্টার! ঐ বক্স-এ যে বিবি বসে আছেন, উনি কে, জান?" জিজ্ঞাসা করেই কিন্তু বেচারার বুক দুড দুড করে উঠল। কে? কে?

ব্যাণ্ড-মাষ্টার হেসে জবাব দিলে, "খান সাহেব, তুমিও মরেছ! কত লোককে ধনে প্রাণে মেরেছে ঐ গুলবদন বাইজী! সাবধান, ভাই সাহেব, সময় থাকতে সাবধান!"

"গুলবদন! কে গুলবদন? হ্যাঁ, এ ত আমার শয়তানী গুলবদনই বটে! তাই বুক দুড দুড় করছিল ওকে দেখে, তাই মাথা দিয়ে আগুন ছুটেছে!" বলতে বলতে পালাল আহমদ ঊর্দ্ধশ্বাসে সার্কাস থেকে। "দেখতে হবে কোথায় ও যায়!" গেটের বাহিরে এক টঙ্গা ভাড়া করে তাইতে বেচারা বসে রইল। হুকুম না নিয়ে ডেরা থেকে বেরোচ্ছে, বাপু সাহেব যদি রাগ করেন? করুন গে রাগ! আহমদ কি কারও কেনা গোলাম!

চৌকের কাছে এক প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। সামনে সেপাই বরকন্দাজ। একখানা জুড়ী গাড়ী এসে

ফটকে দাঁড়াল। গুলবদন বিবি যেই গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন, কি একজন লোক পাগলের মত দৌড়ে এসে তার ওড়নার এক কোণ চেপে ধরলে। সেপাইরা "কোন হ্যায় রে! হট যাও, হট যাও," করে তেড়ে এল, কিন্তু বিবি তাদিকে ইশারা করে দূরে সরিয়ে দিলেন। লোকটাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি ?" সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বিবি, বিবি, গুলবদন! আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ?"

বিবি তার মুখখানা নজর করে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "শেরদিল খান ওস্তাদ না আপনি ? এখানে কেন এসেছেন ? বাপু সাহেব পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

"না, না, আমি শেরদিল নই। আমাকে কেউ পাঠায় নেই। আমাকে চিনতে পারছ না, গুল ? আমি তোমারই গোলাম, আহমদ খান। সেই যে, সাত বছর আগে, লক্ষ্ণৌয়ে—মনে পড়েছে, গুলবিবি ?"

বাইজী এক ঝট্‌কা মেরে ওড়না ছাড়িয়ে নিয়ে উপহাস করে বললেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই ছোকরা তুমি! একবার তোমাকে আমার মা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার কি মার খাবার সাধ হয়েছে না কি! সেপাইদের ডাকব ?"

আহমদ বুকে হাত দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙ্গা গলায় বললে, "না, গুল, সেপাই ডাকতে হবে না। আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।" সর্ব্বশরীর তার কাঁপছে। মাতালের মত টলতে টলতে সে সরে গেল।

বাইজী একটুক্ষণ আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আহমদকে শেয়াল কুকুরের মত দূর করে দিয়ে ত কই সুখী হতে পারলেন না! ভাবতে লাগলেন, "আপদ আর কি! এত বছর পরে এ ছোকরা কোথা থেকে ভূতের মতন এসে উপস্থিত হল? বাপু সাহেবের সঙ্গেই বা জুটল কি করে? অদ্ভুত কাণ্ড! বেচারা নিশ্চয় জানে না যে কার জন্য সেদিন ওকে মার খেয়ে বিদায় হতে হয়েছিল।" আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, "আজও কিন্তু ভুলি নেই আহমদকে। ভুলব কেমন করে—আমার প্রথম প্রেমিক, আমার প্রথম বসন্তের প্রথম কোকিল! কিন্তু ও গেছে, ভালই হয়েছে। গুলবদন বাইজী ওকে নিয়ে আর আজ কি করবে!"

এমন সময় একটা ডগ-কার্ট টপ্ টপ্ করে এসে দাঁড়াল। বাপু সাহেব তার থেকে লাফিয়ে নেমে গুলবদনের দিকে এগিয়ে এলেন। বাইজী বললেন, "সেলাম আলেকুম, জনাব! এরই মধ্যে এসে পড়লেন কি করে?"

"আপন গরজে এসেছি, বিবি! আজ ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে গান শুনতে চাই।"

"আপনার মত ওস্তাদের সামনে গান গাইতে বড় লজ্জা করে যে! আসুন, উপরে আসুন।"

দুজনে হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেলেন। আহমদ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করে ডেরার পানে ফিরে গেল।

ভোর তিনটার সময় বাপু সাহেব যখন এলেন আহমদ তখনও

জেগে। সে ফিরে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে, কে জানে কেন, তার পুরানো সেতারটা বার করে তাতে তার বেঁধে তৈরী করে রেখেছে। কাল থেকে আবার বাজাতে আরম্ভ করবে। মনিব আপত্তি করেন, চলে যাবে, আবার পথে পথে ভিক্ষা করে খাবে! বাপু সাহেব কাপড় চোপড় বদলে তার বিছানার পাশ দিয়েই শুতে গেলেন, কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না।

পরদিন সকালে আহমদের ডাক পড়ল মনিবের তাঁবুতে। মনিব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "শেরদিল, তুমি কার হুকুমে কাল রাত্রে ডেরা ছেড়ে শহরে গেছলে!"

আহমদ সোজা মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে, "নিজের ইচ্ছায় গেছলাম হুজুর!"

বাপু সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে সিংহ-গর্জ্জনে বললেন, "নিজের ইচ্ছায়! বটে! তোর কি ইচ্ছা বলে একটা পদার্থ আছে না কি, গোলাম?"

"কাল অবধি ছিল না, জনাব। আজ আছে। তাই আমি জানতে চাই, আপনি কি জন্য কাল গুলবদনের কাছে গেছলেন, আমার গুলবদনের কাছে! বলুন, রাও সাহেব, জবাব দেন আমার কথার!"

বাপু সাহেবের রাগে কথা বেরোচ্ছিল না। বজ্র মুষ্টিতে আহমদের দুই কাঁধ চেপে ধরে তার চোখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আহমদ হেসে উঠল, "না জনাব, আর জাদু চলবে না! আপনি আমার সওয়ালের জবাব দেন।"

"তোর কথার জবাব দেব আমি, বেয়াদব! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমি কোথায় যাই না যাই, তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোর কাছে!"

"কোন কৈফিয়ৎ চাই না, সাহেব, যদি না আপনি আমার গুলবদনের কাছে যান।"

বাপু সাহেব একটুক্ষণ আহমদের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। ভাবলেন "লোকটা পাগল হয়ে গেল না কি!" তার পর খুব শান্ত ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আহমদ, গুলবদনের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?"

"আমার কি সম্বন্ধ, বাপু সাহেব! শুনতে পারবেন মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে? আচ্ছা বলি তবে, শুনুন। বুলবুলের গোলাপ যা, চকোরের চাঁদ যা, পতঙ্গের দীপশিখা যা, মজনুর লয়লা যা, গুল আমার তাই ছিল! তাকে প্রথম দেখেছিলাম যখন সে পনের বছরের ফুটন্ত ফুল। দেখবামাত্র বুঝলাম যে আমার শুষ্ক হৃদয় এতদিন যার—না, অত কথা আপনাকে আজ বলে কি লাভ! বুঝে নিন, সাহেব, যে আমি প্রথম দর্শনেই দেওয়ানা হয়ে গেলাম। একটা ছুতো খুঁজে আলাপ করতে সময় লাগল না। তার পর, তেতলার ছাদের উপর আমাদের দুজনার দেখা হত। কখন আমাদের ছাদে, কখন ওদের ছাদে। দুই ছাদের মাঝে ছিল এক আলশে, মাত্র তিন হাত উঁচু। সেটা কিছু আমাদিকে আটকাতে পারত না। আমাদের কখন দেখা হত ভোরে, কখন হত এক প্রহর রাত্রে। কত গান ও আমায় শুনিয়েছে, কত গান

আমি ওকে শুনিয়েছি, কত গান দুজনে এক সঙ্গে গেয়েছি! কখন কখন কথা কইতে ভুলে যেতাম, দুজনে দুজনার হাত ধরে চাঁদের আলোয় বসে থাকতাম!"

আহমদ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। তার পর আবার বলতে আরম্ভ করলে, "মাপ করবেন, জনাব। অন্যমনস্ক হয়ে গেছলাম। এই রকমে নেশায়, স্বপনে, আমাদের তিনটী মাস কাটল। গুল আমাকে কেবলি বলত,—তুমি আমাকে এখান থেকে লুকিয়ে নিয়ে চল কোথাও।

আমি মূর্খ, ভাবতাম,—অত লুকোচুরীতে কাজ কি? দু দিন যাক্, সুবিধা বুঝে বাপ মাকে বলব যে পাশের বাড়ীর মেয়েটীকে আমি বিয়ে করতে চাই। অমন সুন্দর মেয়ে বাবা কখন আপত্তি করবেন না। মাও আদুরে ছেলের মনে কষ্ট দিতে পারবেন না। গুলের মায়ের ত আপত্তি হতেই পারে না, কেন না আমি বড় মানুষের ছেলে, একমাত্র সন্তান।

গুলকে বুঝিয়ে বলতাম, কিন্তু সে বুঝতে চাইত না। বলত,—তুমি জান না, আহমদ। আর দেরী কোরো না। আমাকে নিয়ে চল কোথাও।

একদিন হল কি, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের একজন চাকর আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল,

'আমাকে মা বন্ধ করে রেখেছে। তুমি আজ রাত এগারটার সময় আমাদের ছাদে এসে. আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামবে। সিঁড়ির পাশের ঘরেই আমাকে রেখেছে।

দোয়ারে তালা লাগান নেই, শুধু কড়ি বন্ধ আছে। আজ রাত্রেই আমি পালাতে চাই।'

হাতের লেখা গুলেরই। ঠিক চিনতে পারলাম। আগেও আমাকে দুই একবার চিঠি লিখেছিল। খাওয়া দাওয়ার পর বাবা শুতে গেলে আমি ছাদে গিয়ে বসলাম। নীচের ঘড়ীতে টং টং করে এগারটা বাজল। চারিদিক নিঝুম। আলশে টপকে গুলদের ছাদে গিয়ে পৌছলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই কোথাও। অন্ধকারে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে যেই দোতলায় নেমেছি, কি তিন চার জন লোক চারিদিক থেকে এসে আমাকে ধরে ফেললে। একজন তাড়াতাড়ি আমার মুখের ভেতর রুমাল গুঁজে দিলে, যেন কোন রকম চেঁচামেচি না করতে পারি। তার পর সবাই মিলে আমাকে বেদম মার দিলে। বেহোস হয়ে পড়ে যাবার আগে এইটুকু দেখতে পেলাম যে দূরে বারান্দার কোণে কে দুজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। মনে হল, গুলবদন আর তার মা। হায় রে নসীব! দুনিয়াতে কি কাউকে বিশ্বাস নেই!

যখন জ্ঞান হল, দেখলাম নদীর কিনারায় পড়ে রয়েছি, রাত পোহাতে আর দেরী নেই। কোন রকমে উঠে নদীর জলে মুখ হাত বেশ করে ধুয়ে নিলাম। তার পর চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম। যেমন বোকা আমি, তেমনি সাজা হয়েছে! কিন্তু বাড়ী আর ফিরে যাব না, কিছুতেই না। কি বলব বাবা মাকে? বলব, তোমাদের ছেলে চোরের মতন পাশের বাড়ীতে ঢুকেছিল,

তাই তারা তাকে ধরে মার দিয়েছে? ঐ পথে যাব আসব, আর গুলবদন জানালায় বসে দেখবে, হাসাহাসি করবে! না, তার চেয়ে ঢের ভাল, যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাই। অপমানের প্রতিশোধ কোন দিন নিতে পারি, ত নেব!"

বাপু সাহেব গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রতিশোধ নিয়েছ?"

"কার উপর প্রতিশোধ নেব, সাহেব? গুলবদনের মা মরে গেছে। গুল যে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, এ কথা আমি আর বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় আমার দেখতে ভুল হয়েছিল।"

"এ সব ঘটেছিল লক্ষ্ণৌতে, না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি, বাপু সাহেব, কি করে জানলেন? গুল বলেছে বুঝি?"

"না, গুলবদন কিছু বলে নেই। তোমার গল্প ত তুমি করলে, সাকরেদ। এখন আমার গল্প শুনবে? তোমাকে কে মার দিয়েছিল, জান? তারা আমার লোকজন। মার দিয়েছিল আমারই হুকুমে। বুঝেছ, আহমদ? সত্যি কথা! গুলবদনের উপর আমার নজর পড়েছিল কিছুদিন আগেই। তার মা অনেক চেষ্টা করেও মেয়েকে রাজী করাতে পারে নেই। তুমিই ছিলে আমার পথের কাঁটা। তাই বাধ্য হয়ে তোমাকে সরাতে হল। তুমি যদি পরদিন বাড়ী ফিরতে, ত আরও কঠিন সাজা তোমাকে ভোগ করতে হত। এ রকম ত সংসারে হয়েই থাকে, সাকরেদ!"

আহমদ দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে বললে, "একটা কথা বলুন,

রাও সাহেব। তার পরে আমি চলে যাই। আপনি যখন আমাকে লাহোরে আশ্রয় দেন, তখন কি জানতেন আমার পরিচয়?"

"না সাকরেদ, তা জানতাম না। তুমি তোমার গল্প বলার আগে পর্য্যন্ত আমার মনে কখন কোন সন্দেহ হয় নেই। লক্ষ্ণৌয়ে আমি তোমাকে দেখিও নেই, তোমার নামও জানতাম না। আচ্ছা এখন ত পূর্ণ পরিচয় পেলে! আমার উপর কি রকম প্রতিহিংসা নিতে চাও, আহমদ?"

"কিছুই চাই না হুজুর। আমাকে রোখসৎ দেন, আমি চলে যাই। আপনার নিমক অনেক খেয়েছি।"

বাপু সাহেব একটু চিন্তা করে জবাব দিলেন, "না তোমাকে আমি এখনই ছেড়ে দিতে পারব না। ছেড়ে দিলে তুমি আমার আর কি করবে, তবে গুল বিবিকে বিরক্ত করবে। আরও বছর খানেক, বছর দুই, তোমাকে আমি নজরে নজরে রাখতে চাই। তত দিনে পুরানো কথা সব ভুলে যাবে।"

আহমদ নত হয়ে আবার সেলাম করে বললে, "কয়েদী করে রাখবেন? খুব ভাল কথা, হুজুর! ধরে রাখতে পারেন, রাখবেন। আমিও পালাতে পারি, ত পালাব। আপনার সঙ্গে আমার এই করার হল ত? আমি খুব রাজী।"

"আচ্ছা আহমদ, আমিও রাজী। পালাতে পার, পালিও। সার্কাসে খেল করতে চাও? ইচ্ছা না হয়, ত তাও করার দরকার নেই।"

"সে কি কথা, জনাব! খেল করব বই কি! নিমকের কর্জ্জ আর বাড়িয়ে কাজ কি?"

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আহমদ সোজা গেল সিংহের কাছে। পিঞ্জরার বাহিরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "শের ভাই! দুনিয়াতে তুমিই আমার একমাত্র দোস্ত। তোমাকে জানাতে এলাম যে আমি সব ভুলে, সব মাপ করে, চলে যেতে চেয়েছিলাম। মনিব কিছুতেই রাজী হলেন না। আমারও আর কোন জবাবদিহি রইল না। আজ মজলিসে আমি তোমাকে মালকোষ বাজিয়ে শোনাবই! আমার ওস্তাদজীর সেতারে বাজিয়ে শোনাব। তিনি মরবার সময় আমাকে কি বলে গেছলেন, জান? 'আহমদ, আমার এই যন্ত্র তোকে দিয়ে গেলাম। এই তোর শত্রুনাশ করবে। নাই বা আমি রইলাম!' দেখি, আজ তিনি কি করেন।"

সিংহ আস্তে আস্তে সামনের একটা পায়ের থাবা গরাদের ভেতর দিয়ে বার করে আহমদের হাতে রাখলে। দুজনের মধ্যে কি বোঝাপড়া হল, কে জানে!

—০—

সন্ধ্যাবেলা। সার্কাসের আসর। দশটা বাজতে না বাজতে রঙ্গ-বেরঙ্গের উর্দ্দী পরা চাকরের দল সিংহের খাঁচাটাকে টেনে এনে রিং-এর মাঝখানে রেখে বেরিয়ে গেল। ব্যাণ্ড-এ খুব মৃদু মৃদু একটা বিলেতী নাচের সুর বাজতে আরম্ভ হল। পশুরাজের

দৃকপাত নেই। তিনি পিঞ্জরার এক কোণে শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে, চোখ বুজে। দর্শকবৃন্দ নীরব। কেবল একটা জ্যাঠা ছোকরা গ্যালারীর মাথা থেকে একবার চেঁচিয়ে উঠল, "অত আফিঙ্গ খাইয়েছ কেন, বাবা, ওকে?" কিন্তু তখনই আবার সে লজ্জায় চুপ করে গেল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতেই বাপু সাহেব হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন মখমলের পরদার পেছন থেকে। সঙ্গে ওস্তাদ শেরদিল খান। ওস্তাদের হাতে ঘেরাটোপ ঢাকা সেতার। দুজনে দর্শক-মণ্ডলীকে নমস্কার করে পিঞ্জরার দিকে এগোলেন। ব্যাণ্ড থেমে গেল। বাপু সাহেব আস্তে আস্তে দরজা খুললেন। সিংহ চেয়ে দেখলে, কিন্তু উঠল না। দুজনে ভেতরে ঢুকে "সেলাম আলেকুম, শের মহারাজ!" বলে তিনবার দরবারী কৈতায় কুর্ণিশ করলেন। তখন সিংহ গম্ভীর চালে উঠে এগিয়ে এল। ভুঁইয়ে মাথা ঠেকিয়ে বাপু সাহেবকে প্রণাম করলে। একটা থাবা তুলে দিলে শেরদিলের হাতে। ওস্তাদ থাবাটাকে ধরে খুব নাড়া দিয়ে শেক্ হ্যাণ্ড করলে। তার পর তিন জনেই বসলেন। আহমদ আস্তে আস্তে গিলাবের ভেতর থেকে সেতার বার করলে। যন্ত্র দেখে বাপু সাহেব চমকে উঠলেন। আহমদের হাত জোরে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘসে বললেন, "বেইমান! এ সেতার কেন আনলি? আমার সেতার কোথায় গেল?"

আহমদ হেসে চুপি চুপি জবাব দিলে, "এই সেতারই আমি আজ বাজাব, জনাব! এত লোকের সামনে একটা ঢলাঢলি করবেন না। ইচ্ছা হয়, কাল আমাকে দূর করে দেবেন।"

বাপু সাহেব আহমদের দিকে তাকালেন। চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

আহমদ মেজরাপ পরে সেতারে ঘা দিতে না দিতে মালকোষের ঠাট বেজে উঠল। সিংহ উঠে দাঁড়াল। খুব ঢিমে তালে গৎ বাজতে লাগল। সিংহ রোজকার মত ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে নাচতে নাচতে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে। বাপু সাহেব একটুক্ষণ কেমন হতবুদ্ধি হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ কর, বেয়াদব! থামা তোর ভুতুড়ে রাগ।"

আহমদ শুধু বললে, "খবরদার, রাও সাহেব!"

সেতার খুব দ্রুত তালে বাজতে আরম্ভ হল। সিংহও মশগুল হয়ে নাচতে লাগল। দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল। পিঞ্জরার ভেতরে যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তা তারা শুনতে পাচ্ছিল না ত!

এমন সময় দেখা গেল, শামিয়ানার চূড়া থেকে খানিকটে সাদা ধোঁয়ার মত পদার্থ ধীরে ধীরে ভেসে ভেসে নেমে আসছে! এসে খাঁচার ভেতর ঢুকল, যেন ছোট এক খণ্ড সাদা মেঘ। সেই মেঘের মাঝে বাপু সাহেব কি দেখলেন কে জানে! তিনি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আহমদের সেতার ধরে এক হেঁচকা টান মেরে বললেন, "রাখ তোর সেতার, বেইমান! নইলে মেরে ফেলব।"

আহমদ কাতরকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "শের ভাই! আমার বাজনা ভেঙ্গে দিলে। বাঁচাও বাঁচাও।"

চকিতের মধ্যে সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করে এক লাফে বাপু সাহেবের ঘাড়ে পড়ল। পড়তে পড়তে বাপু সাহেব পিস্তল বার করে এক গুলি মারলেন। তার পর সিংহ, বাপু সাহেব, ও সেতার গড়াগড়ি যেতে লাগল সেই পিঞ্জরার মধ্যে।

লোকজন দৌড়ে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তখন দেখা গেল সিংহও আর নেই, বাপু সাহেবও আর নেই। সেতারটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

ওস্তাদ শেরদিল খান সেতারের সেই ভাঙ্গা টুকরোগুলো বুকে করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শেরদিল এখন নওপাড়ার পাগলা গারদে। আর তার সমস্ত খরচ-পত্র দিচ্ছেন আগরা শহরের বিখ্যাত নর্ত্তকী গুলবদন বিবি।

দিক্‌শূল

দশ বছর বয়স থেকে আমি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পড়ে আসছি। আজ আমার বয়স পঁচিশ বছর। এই দীর্ঘকালব্যাপী গভীর অধ্যয়নের ফলে আমি স্থির বুঝতে পেরেছি, যে বিধাতা বাঙ্গালীকে যখন তখন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে হটহট করে বাড়ীর বাহিরে দৌড়তে নিষেধ করেছেন। এই ত অম্বুবাচী পড়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, তিন দিন বাড়ীতে বসে আছি। এটা ত পাঁজি পড়েছি বলেই! নরেন নামে আমার এক বন্ধু আছে, জাতে পৈতা-ছেঁড়া বামুন,আমার পাঁজিকে বলে কি না গুপ্তপ্রেস গঞ্জিকা! ভগবান তাকে গত বছর তেমনই শাস্তি দিয়েছেন। ছোকরা বি-এ পরীক্ষা দিতে গেল ত্র্যহস্পর্শের দিন। একেবারে দাঁড়িয়ে ফেল হল। তবু কি তার চৈতন্ত হল! আমাকে বলতে লাগল, "মূর্খ! সবাই ত এই ত্র্যহস্পর্শের দিন পরীক্ষা দিতে গেছল। কজন ফেল হয়েছে!"

ওরকম ষ্টুপিডের সঙ্গে তর্ক করে কি হবে! ওকে কি করে বোঝাব যে যারা হিন্দু, তারা নিশ্চয়ই মাহেন্দ্রযোগ কি অমৃতযোগ দেখে যাত্রা করেছিল। যাত্রা করা মানে কি? গর্গ বলে গেছেন, "গৃহাৎ গৃহান্তরং।" সেটা ত সহজেই করা যেতে পারে! এক বেলা রান্না-ঘরে কি ভাঁড়ার ঘরে বসে থাকলেই হল।

আমি নিজে কিন্তু ও সব গোঁজামিলও কখন দিই না। আপন রাশির সঙ্গে মিলিয়ে সব গ্রহনক্ষত্রের স্থান দেখে তবে বাড়ী থেকে বের হই। ফলে অদৃষ্ট চিরদিন আমার উপর সুপ্রসন্ন। বি-এল পর্য্যন্ত সব পরীক্ষাগুলো ডঙ্কা বাজিয়ে পাস হয়েছি। চাকরীর চেষ্টা করছি। চেষ্টা মানে কি ঐ উল্লুকদের মত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখা! তা নয়। রীতিমত স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি, করাচ্ছি। ষ্টুপিড নরেনটা এই নিয়ে আবার শাস্ত্র আওড়াতে আসে। বলে কি না,

"ভগবানকে একমনে ডাক, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। ও সব ভূত-প্রেতের খোসামোদ করিস কেন?"

ওরে মূর্খ, ভগবানকে কি ডাকলেই হল! ডাকার অধিকার চাই। তোর অধিকার ত ঘেঁটু পূজা পর্য্যন্ত! যাকগে ও সব কথা। পাঠককে আমার দুর্দ্দশার গল্পটা বলি এখন।

একদিন লোকমুখে শুনলাম যে হাইকোর্টে খুব ভাল এক চাকরী খালী আছে। দৈবজ্ঞের কাছে গিয়ে, ঠিক শুভ সময়টা জেনে নিয়ে, ছেড়ে দিলাম এক দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের নামে। দু-দিন বাদ এক চিঠি পেলাম হাইকোর্ট থেকে। বুধবার দশটা বেজে পনের মিনিটের সময় দেখা করতে হবে বড় সাহেবের সঙ্গে। "মঙ্গল উষে বুধে পা, যেথা ইচ্ছা সেথা যা।" বুধবার সকাল-বেলায় যখন সাহেব-সন্দর্শন হবে, তখন সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সুফল ফলবেই। খনার বচন কি মিথ্যা হয়!

আমি থাকতাম সাঁকারীটোলায় মামার বাড়ীতে। মামা খুব

নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। পূজা, জপ, তপ, কত কি রোজ করতেন। মাথায় একটা ছোট টিকিও ছিল। আপিস যাওয়ার সময় পমে-টম দিয়ে আঁচড়ে সেটাকে চুলের ভেতর বসিয়ে দিতেন। কিন্তু বাড়ীতে সেটা ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তীর মত পত পত করে উড়ত। মামা খুব রাশভারী লোক ছিলেন। মামাতো ভাই বোন, আমি, এমন কি মামী পর্য্যন্ত, আমরা সবাই তাঁর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকতাম। রোজ সকাল উঠে পাঁজি দেখে মামাবাবু ঠিক করে দিতেন সেদিন কি কি রান্না হবে। আমরা নিজের মরজী মত বেড়াতে যেতে পেতাম না। মামা ঠিক করে দিতেন কোন দিকে যাত্রা আছে, কোন দিকে নেই। খুব ছোট থাকতে এই সব বিধি নিষেধ বড় খারাপ লাগত। কিন্তু একটু বয়স হতেই বুঝতে পারলাম যে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্ব পঞ্জিকামধ্যে নিহিত।"

দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে আমি মামার বাড়ীতে থাকতে এসেছিলাম। আমার বাবা ভুবনমোহন গাঙ্গুলী হাইকোর্টে এটর্নী ছিলেন। বেশী দিন কাজ করেন নেই, কিন্তু তারই মধ্যে বেশ্ নাম কিনেছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবার শরীর ভেঙ্গে গেছল। তার পরে একদিন হঠাৎ তিনিও গেলেন, হৃদরোগে। ঐ অল্পবয়সেই বাবা প্রায় বিশ হাজার টাকা জমিয়েছিলেন। উইলে লিখে গেলেন, যে সেই টাকার সুদে আমার লেখাপড়া চলবে, পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আমি আসল টাকায় হাত দিতে পারব না, তত দিন পর্য্যন্ত আমি আমার মাতুলের আজ্ঞাধীন থাকব। সেই আদেশমত পনের বছর আমি সব

রকমে মামাবাবুর আজ্ঞাধীন রয়েছি বাবা ছিলেন প্রায় ব্রাহ্ম, আর আমি হয়েছি ঘোর সনাতনী। নরেনটা বলে, "সয়তানী।" তবে ওর কথা কে গ্রাহ্য করে! আর জন্মে ও নিশ্চয় ব্যাস কাশীতে মরেছিল।

হাইকোর্টের চিঠি নিয়ে মামার কাছে গেলাম। তিনি নাকে চশমা এঁটে এক হিসাবের খাতা দেখছিলেন। আমায় দেখে বললেন, "শশাঙ্ক, তোর টাকার হিসেব দেখছিলাম। আসলের প্রায় অর্দ্ধেক খরচ হয়ে গেছে। অত খরচ করিস না। একটু বুঝে সুঝে চলিস। নইলে লোকে আমায় দুষবে যে!"

আমি টাকা কড়ির কি বুঝি। চুপ করে রইলাম। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর হাতে ওটা কি?"

আমি চিঠিখানা তাকে দিলাম, তিনি পড়ে বললেন, "বাঃ, বেশ বেশ! ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে, বুঝলি? ওসব বড় সাহেব-দের ভারী বিশ্রী মেজাজ। একবার পাঁজিখানা দে দেখি।"

খানিকক্ষণ পাজি উলটে গালে হাত দিয়ে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হল, মামাবাবু?"

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "তোর যেমন কপাল! নইলে আর এই বয়সে পিতৃমাতৃহীন হস! বুধবার দিন সকাল হতে দুপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি।"

"মামা, তাহোলে কি হবে? হাইকোর্ট ত এখান থেকে সোজা পশ্চিম মুখে।"

"হবে আর কি ছাই? যাওয়া হবে না।"

"আচ্ছা, মামা, এক কাজ করলে হয় না ? আজই শিবপুরে মাসীমার কাছে চলে যাই। বুধবার দিন সেখান থেকে পূর্ব্ব মুখ হয়ে হাইকোর্টে আসব।"

"হ্যাঁ বাবা, তা হতে পারে। আজ দেখছি দিন খুব ভাল। মাহেন্দ্রযোগ দেখে মাসীর বাড়ী চলে যা।"

সেইমত কাজ করলাম। মাসীমার কাছে তে-রাত্রি বাস করে, বুধবার সাড়ে আটটার সময় বের হলাম পূর্ব্বদিকে মুখ করে। একেবারে গঙ্গারঘাটে এসে পানসীতে উঠে বসলাম নদী পার হওয়ার জন্য। মাঝ-গঙ্গায় পুলিশের এক ষ্টীম-লঞ্চ এসে বিষম ধাক্কা মারলে আমাদের পানসীকে। পাঁজি দেখে বেরিয়েছিলাম ত। তাই নৌকা উলটে গেল না। কিন্তু, লঞ্চে ছিল এক প্রকাণ্ড লালমুখো সাহেব। সে "ড্যাম ইউ", বলে পানসীতে লাফিয়ে উঠে লেগে গেল আমাদের মারধর করতে। আমি বললাম, "স্যার, আমি মাঝি নই আমার কি দোষ ?" কে শোনে কার কথা ! "চুপ রও", বলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। মাঝিদের ছেড়ে দিলে। থানাতে ভাগ্যিস এক বাঙ্গালী দারোগাবাবু ছিলেন। তাঁকে হাইকোর্টের চিঠিখানা দেখিয়ে, হাতে পায়ে ধরে, ছুটি পেলাম সাড়ে দশটার পর। পানসী ভাড়া বলে যে আটগণ্ডা পয়সা বের করেছিলাম, সেটা এক পাহারাওয়ালাকে বকশীশ দিয়ে এলাম।

হাইকোর্ট পৌঁছতে এগারটা বেজে গেল। ফটকের কাছে কে যেন ডাকলে, "দাদাবাবু !" "ফিরে দেখি, মামার চাকর, শিবু !

সে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে চলে গেল! খুলে দেখি, মামা লিখেছেন,

"শশাঙ্ক, তোমার মত গণ্ডমূর্খ আর নেই। সেদিন আমার হাতে নূতন পাঁজির বদল গেল বছরের পাঁজিখানা দিলে। তাই দেখে তোমার যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলাম। ঘটনাক্রমে আজ নূতন পাঁজি দেখতে দেখতে ভুল ধরা পড়ল। এখন আর উপায় কি? আজ পূর্ব্বে যাত্রা নাস্তি। উপরন্তু ত্র্যহস্পর্শ। আজ সাহেবের সঙ্গে কিছুতেই দেখা কোরো না।

আশীর্ব্বাদক মামাবাবু।"

কিন্তু ফিরে যেতে মন চাইলে না। রেজিষ্ট্রারের আপিসে গেলাম। বড়বাবু মুখ খিচিয়ে উঠলেন, "সে কাজ আর একজনকে দেওয়া হয়েছে। তোমার জন্য কি চাকরী বসে থাকবে না কি!"

সিঁড়ি নামতে নামতে মনে এই খটকা লাগল, "আচ্ছা, আজ যদি ত্র্যহস্পর্শ, ত অন্য লোকটা চাকরী পেলে কি করে? বোধ হয়, মুসলমান কি খৃষ্টান হবে।"

মাথা ঠাণ্ডা করব বলে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে গঙ্গার ধারে এক বেঞ্চে বসলাম। ঘণ্টাখানেক বসার পর মনে পড়ল, আজ ভাত খাওয়া হয় নেই ত! উঠে পড়লাম। কিন্তু আজ অদৃষ্টে ভাত খাওয়া নেই। রাস্তা পার হচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে লাগল এক ভীষণ ধাক্কা। পড়ে গেলাম। তার পর কি হল, কিছুই জানি না।

যখন চোখ খুললাম, দেখি যে এক অপরিচিত ঘরে শুয়ে

আছি। আসবাব পত্র থেকে বুঝলাম সাহেব-বাড়ী। পাশে বসে এক পাগড়ী চাপকান পরা মুসলমান বেয়ারা ঢুলছে। উঠে বসতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মাথায় বড় যন্ত্রণা। লোকটা লাফিয়ে কাছে এসে আমায় ধরে শুইয়ে দিলে। বললে, "উঠতে যাবেন না, বাবু। চোট লাগবে। আমি মিসি সাহেবকে ডেকে আনি।"

মিসি সাহেব এলেন। আচ্ছা, এ কি হল? চিরদিন শিখে এসেছি যে এই মিসি নামধারী জীবদের মুখ দেখতে নেই, এদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অথচ একে দেখে এমন চোখ জুড়িয়ে গেল কেন? কি সুন্দর মুখ, কি চমৎকার চোখ, আবার কপালে একটী খয়েরের টিপ! সুন্দরী আমার শিয়রের কাছে এসে, একটী ছোট্ট চুড়িপরা হাত আমার কপালে রেখে বললেন, "কেমন আছেন? এইবার একটু দুধ খান, বরফে বসিয়ে খুব ঠাণ্ডা করে রেখেছি।" কোন উত্তর দিলাম না। মুখে কথা জোগাল না। এমন চেহারাও কখন দেখি নেই, এমন মিঠে আওয়াজও কখন শুনি নেই। হঠাৎ ঝড়ের মত মাথার ভেতর এল, ঐ চুড়ীপরা হাতখানিকে দু হাতে চেপে ধরি আর বলি, "দুধ চাই না গো! কিছুই চাই না! তুমি আমার পাশে বসে একটী গান গাও।" ছি, ছি, পাগলের মত এ কি সব ভাবছি! সত্যি কেউ এসেছে, না স্বপন দেখছি? জোর করে চোখ বুজে, জিব দাঁতে কামড়ে, শুয়ে পড়ে রইলাম। একটু পরে আবার শুনলাম সেই আওয়াজ, বুলবুলের গানের মতন মিঠে, "মুখটা

খুলুন দেখি। একটু দুধ খাইয়ে দিই।" ভরসা করে চোখ চাইলাম। মানুষের ঠোঁট এমন সুন্দর হাসতে পারে কে জানত! সেই হাসির দিকে চেয়ে আমিও হাসলাম।

"আচ্ছা, তুমি—আপনি কে? কাদের বাড়ী আমি রয়েছি?"

"দুধটুকু খেয়ে ফেলুন, বলব।"

দুধ শেষ করে বললাম, "এইবার বলুন।"

মেয়েটী কাছে চেয়ারে বসে এলো চুল মাথায় জড়াতে জড়াতে উত্তর দিলে, "এটা হচ্ছে ব্যারিষ্টার এন, কে, বানার্জী সাহেবের বাড়ী। আমি তাঁর মেয়ে, রমা। আপনি এখানে কি করে এলেন, সে গল্পটা পরে বলব। এখন আর একটু বিশ্রাম করতে হবে।"

সব গল্পটা শোনবার জন্য অস্থির হয়েছিলাম। কিন্তু নার্সের হুকুম অমান্য না করে পাশ ফিরে শুলাম। বোধ হয় একটু ঘুমও হল। যখন বেলা পড়ে এসেছে, তখন সাহেবী কাপড় পরা দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "হ্যালো, গুড আফ্‌টারনুন। একটু ভাল বোধ হচ্ছে?" পেছনে রমা। চওড়া কালা পেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী পরা, পায়ে ছোট্ট লাল টুকটুকে মখমলের চটি। একটু হেসে মুখটী লাল করে চুপি চুপি সাহেবকে বললে, "বাবা, তুমি বল।"

বানার্জী সাহেব তখন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "আমার এই আদুরে মেয়েটী আজ গঙ্গার ধারে আপনাকে মোটারের ধাক্কা লাগিয়েছিল। বিনা লাইসেন্সে গাড়ী হাঁকাচ্ছিল,

তাই পুলিস আসবার আগেই আপনাকে তুলে নিয়ে বাড়ী পালিয়ে আসে। আপনার কাছে মাপ চাইছে।”

আমি হাত জোড় করে বললাম, “আমার কাছে মাপ চাইবার কোন কারণ নেই। আমাকে নিয়ে নিজেই বিব্রত হয়েছেন। রাস্তায় ফেলে রেখে আসেন নেই, এই আমার পরম ভাগ্য। ত্র্যহস্পর্শের দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, এই রকম একটা কিছু হওয়ারই কথা!”

রমা হেসে বললে, “ত্র্যহস্পর্শ বলে নিজের সাফাই আমি আর কি করে গাই, বলুন! কি রকম মোটার হাঁকাই তা ত জানেন না!”

“সে আপনি পুলিসের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন, যদি কখনও ধরা পড়েন।”

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার নামটী কি?” আমি উত্তর দিলাম, “আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশশাঙ্কমোহন গাঙ্গুলী। পিতার নাম ৺ভুবনমোহন গাঙ্গুলী।”

সাহেব লাফিয়ে উঠলেন, “কে? ভুবন গাঙ্গুলী, যিনি এটর্নী ছিলেন? মাই ডিয়া বোয়, তুমি ভুবনের ছেলে! জান, তিনি আমার কত বন্ধু ছিলেন? আমার প্রথম ব্রিফ তাঁর কাছ থেকেই পাই। You are most welcome here, lad. এ তোমারই বাড়ী ঘর বলে মনে কোরো।”

তিনি বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “কলকাতায় কোথায় থাক?”

"আজ্ঞে, মামার বাড়ী", বলে মামাবাবুর নাম ও ঠিকানা দিলাম।

বানার্জী সাহেব বেরিয়ে গেলে রমা কাছে এসে বসল। বললে, "শশাঙ্ক দাদা, তাহলে আমাকে মাপ করলেন ত ?"

"হ্যাঁ রমা, মাপ করব যদি আমার কাছে একটু বস।"

"নিশ্চয় বসব, সে ত নার্সের কর্ত্তব্য। ভাগ্যিস্ আপনার হাড়গোড় ভাঙ্গে নেই। তাহলে আমি যে কি করতাম, জানি না। তখন যা ভয়টা হয়েছিল !"

সেই দিন সন্ধ্যা-বেলাই মামাবাবু খবর পেয়ে আমায় দেখতে এলেন। একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি! আমি তখনও বিছানা ছাড়বার হুকুম পাই নেই। উঠে বসলাম। রমা কাছেই চৌকীতে বসে ছিল। দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না। মামা বোধ হয় তাইতে আরও বিরক্ত হলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "বাঁদরামি করতে গেলে এই রকম ভুগতে হয়! আমার চিঠি পেয়েই বাড়ী চলে এলে না কেন ? ধর্ম্মের সঙ্গে ইয়ারকী চলে না। সে কথা যাক গে। এঁদের বাড়ী খাওয়া দাওয়া চলছে ত ?"

"ভাত এখনও খাই নেই। আর খেলেই বা কি ? এঁরা ত ব্রাহ্মণ !" আমার বড খারাপ লাগছিল রমার সামনে এই সব কথাবার্ত্তা।

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, মস্ত বড় কুলীন ব্রাহ্মণ! তা খুব খাও তুমি ওঁদের ভাত। কিন্তু গোবর না খেয়ে আবার

আমার বাড়ী ঢুকতে যেও না। আমি এই বয়সে জাত দিতে পারব না।” বলে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন।

রমা অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বললে, “শশাঙ্কদা, সত্যি কিন্তু আমরা কুলীন বামুন। তুমি বাবুর্চ্চির ভাত নাই বা খেলে, আমি রেঁধে দেব। এখনও দু-তিন দিন ত চলা ফেরা হবে না, ডাক্তার কড়া হুকুম দিয়ে গেছেন।”

“সে যা হোক হবে এখন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, রমা। রাঁধতেই বা যাবে কেন? আমি রুটী, মাখন, দুধ, খেয়ে থাকব।”

“আচ্ছা দাদা, তোমার মা নেই, না? থাকলে মামা অমন করে কথা কইতে পারতেন না।” রমার গলাটা একটু ভারী।

“না ভাই, মা নেই। অনেকদিন স্বর্গে গেছেন। তুমি মামার উপর বিরক্ত হয়ো না। ওঁর কথাবার্ত্তা একটু রূঢ, কিন্তু অন্তরটা ভাল। তোমারও মা স্বর্গে গেছেন, না রমা?”

“না শশাঙ্কদা, মা আমার নেই। আমি যখন খুব ছোট, তখনই গেছেন। আমার প্রায় মনে নেই।” আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রমা আবার বললে, “আমাদের দুজনের মাঝে এই একটা বন্ধন হল, শশাঙ্কদা। দুজনেই মাতৃহীন।”

রমার বয়স বছর কুড়ি হবে। কিন্তু যখন মার কথা বলছিল, ছোট্ট মেয়েটীর মত দেখাচ্ছিল। আমি রমার হাত হাতে নিয়ে বললাম, “হ্যা রমা, আজ থেকে আমরা দুটী বন্ধু, দুজনার দুঃখে দুঃখী।”

এমন সময় বানার্জী সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, "শশাঙ্ক, তোমার মামা অত্যন্ত ছোটলোক, cad! বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে এসেছিলেন। আমাকে শাসিয়ে গেলেন যে তোমার প্রায়শ্চিত্তের খরচ দিতে হবে। আমি বললাম, দিতে হয় দেব কিন্তু আপনি দূর হয়ে যান আমার বাড়ী থেকে। একটু মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে কথা কইলেই ভাল হত। কিন্তু হঠাৎ রক্ত মাথায় চড়ে গেল, সামলাতে পারলাম না! এখন বড় লজ্জা হচ্ছে।"

আমি বললাম, "মশায়, এই সবই সেই ব্রাহ্মস্পর্শের ফল। আমার গ্রহের ফের। আপনি কি করবেন!"

ব্যারিষ্টার সাহেব পকেট থেকে একখানা ফোটো বের করে আমার হাতে দিলেন, "দেখ দেখি, চিনতে পার কি না।"

আমি উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে, এ ছবি আমাদের বাড়ীতেও আছে। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আপনি বুঝি? আপনাদের খুব আলাপ ছিল তাহলে!"

"আলাপ কি হে! তোমায় ত বলেছি, ভুবন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তবে হঠাৎ চলে গেল। নইলে তোমার guardian আমাকে করে যেত। কাল তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা আছে। আজ ঘুমিয়ে পড়। আয় রমা, আমরা খেতে যাই!"

পরদিন সকাল বেলা সাহেব আমার ঘরে বসেই চা টোষ্ট খেলেন, আমাকেও খাওয়ালেন। খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, "Look here, my boy, I am your uncle—আজ থেকে

আমি তোমার নগেন কাকা। আচ্ছা, আমাকে বল দেখি, তোমার বাবা কি টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন? অন্য সম্পত্তি তাঁর ছিল না, আমার মনে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ হাজার টাকা রেখে গেছেন। তার অর্দ্ধেক খরচ হয়ে গেছে।"

"খরচ হয়ে গেছে! কি করে খরচ হল?"

"তা ত জানি না, কাকা। মামা সেদিন বলছিলেন।"

"Don't be a fool, my boy—বোকার মত কথা কয়ো না। বিশ হাজার টাকার শতকরা ছটাকা স্থদ পেলে মাসে একশো টাকা আয় হয়। তোমার মাসিক খরচ পঞ্চাশের বেশী হতেই পারে না, যখন মামার বাড়ীতে থাক। বাকীটা নিশ্চয় জমেছে! তোমার মামা তোমায় ভয় দেখিয়েছেন মাত্র। আজ আমি খোঁজ করব এখন। ভুবন উইল করে গেছলেন ত?"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ কাকা মামার কাছে গেলেন, আগের দিনের ব্যবহারের জন্য মাপ চাইতে। মামাও বোধ হয় মনে মনে লজ্জিত ছিলেন। তাই তাঁকে খুব ভদ্রভাবে আদর অভ্যর্থনা করলেন। দুজনের প্রথমটা ভাল ভাবেই কথাবার্ত্তা চলল। কিন্তু যখন কাকা বললেন যে রেজিষ্ট্রী আপিসে বাবার উইলের নকল দেখে এসেছেন, তখন মামা রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, "আপনার কি সম্পর্ক সে উইলের সঙ্গে? আর শশাঙ্কেরই বা কি অধিকার কিছু বলবার?"

ব্যারিষ্টার সাহেব জবাব দিলেন, "একটু কি ভুল করছেন

না? কাল বুধবার শশাঙ্ক ছাব্বিশ বছরে পড়েছে। সে এখন টাকার পূর্ণ মালিক। তার তরফেই আমি আপনাকে বলছি যে হিসাব ঠিক করে রাখবেন। কাল এটর্নী মারফৎ যথারীতি নোটিস দেওয়াব।"

"কি, সে হতভাগার এত বড় আস্পর্দ্ধা! তাকে দুধ ভাত খাইয়ে পনের বছর মানুষ করলাম কি এই জন্য!"

"না, সে বেচারা এখনও কিছুই জানে না। কিন্তু আমি ছাড়ব না। সে আমায় কাল যখন বললে যে তার সবে দশ হাজার টাকা আছে, তখন আমার মনে সন্দেহ হল। তাই আপনার কাছে এলাম।"

"ব্যারিষ্টার বাবু কি তাহলে আমার ভাগনের টাকাটা হাতাবার চেষ্টায় আছেন না কি?"

নগেন কাকা আজ স্থির করে গেছলেন যে রাগারাগি করবেন না। ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "দেখি, আগে আপনার কবল থেকে ত উদ্ধার করি।" দিয়ে চলে এলেন।

রমা আমায় বলেছিল যে কাকা সাঁকারীটোলা গেছেন। তাই আমি একটু ব্যস্তই ছিলাম, কি হয় জানবার জন্য। সে রাত্রে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। পরদিন সকাল যা যা হয়েছিল বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বল? মোকদ্দমা জুড়ে দিই?"

আমি তাঁর পায়ে ধরে বললাম, "মামার সঙ্গে ঝগড়া করব না, আমাকে মাপ করুন।"

রমা সেইখানেই বসেছিল। সেও বললে, "বাবা, ওঁর যখন অত অনিচ্ছা, ছেড়ে দাও না টাকাটা।"

ব্যারিষ্টার সাহেব কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন, "No my children, আমি ছাড়বার পাত্র নই। টাকা উদ্ধার করবই। তার পর শশাঙ্কের ইচ্ছা হয়, বিলিয়ে দেবে।"

আরও দুদিন কাটল। আমি এখন বারান্দায় উঠে বসবার অনুমতি পেয়েছি। রমা কাছে কাছে থাকে, কত যত্ন করে। ভাত রেঁধে দুদিন খাইয়েছে। কাকা আর কিছু বললেন না যে মামার সঙ্গে কি হচ্ছে। রমা আর আমি বসে বসে জটলা করি। একদিন রমা বললে, "টাকা পাও না পাও, কি এসে যায়? পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছ, নিজে রোজগার করবে। দেখ শশাঙ্কদা, তুমি এইখানে থাকলেই ত হয়, যত দিন না নিজের কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা হয়। কি বল?"

আমি বললাম, "টাকার জন্য আমিও ভাবি না, রমা। কিন্তু মামার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল! দিক্‌শূলের হিসেব না করে বেরিয়ে এইটী ঘটল।"

"আচ্ছা শশাঙ্কদা, এই যে দিবারাত্রি ত্র্যহস্পর্শ দিক্‌শূলের কথা বলছ, একবার ভেবে দেখেছ কি, যে বুধবার থেকে তোমার কোন লাভ হয়েছে কি না, এতটুকুও লাভ?" বলতে বলতে কে জানে কেন রমার মুখটা অকারণ লাল হয়ে উঠল। একটা লাল পেড়ে গরদের শাড়ী পরে ছিল, তার পাড়ের সঙ্গে মুখের রঙটা ঠিক মিলে গেল। কি সুন্দর! আমি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলাম, কিন্তু,

অল্পবুদ্ধি আমি, বুঝলাম না কিছুই। রমা "আসছি," বলে উঠে ঘরের ভেতর গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, মামা কি সত্যি আমায় আর বাড়ী ঢুকতে দেবেন না?

এমন সময় বেয়ারা এসে একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। খুলে দেখি, মামা লিখছেন।

"শশাঙ্ক, তোমার বাপের গচ্ছিত কুড়ি হাজার টাকার চেক আজ তোমার কৌঁসিলীকে দিয়েছি। আইন অনুযায়ী রসিদ পাঠিয়ে দিও।

আমি আর তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। বেম্মোর ঘরজামাই হয়ে বেম্মোদের মাঝে বাস কোরো। হিঁদুর ঘরে আর তোমার স্থান নেই।

রক্তের দোষ যাবে কোথা? তোমার বাপ বেম্মোঘেঁষা ম্লেচ্ছ-প্রকৃতি মানুষ ছিল। তুমিও তাই হয়েছ।

আশীর্ব্বাদক মামা।"

চিঠিখানা বার বার পড়লাম। মামা তাহলে আমায় ত্যাগ করলেন! কোথায় থাকব? ব্রাহ্মের ঘর-জামাই কথাটার মানে কি হল? হঠাৎ, রমার সিঁদুরবরণ মুখখানি মনে পড়ল। ওঃ, কি মূর্খ আমি! আস্তে আস্তে উঠে দোরগোড়ায় গিয়ে ডাকলাম, "রমা!" সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে আমায় টানাটানি করতে আরম্ভ করলে, "এ কি! আপনাকে ডাক্তার না ঘুরে বেড়াতে বারণ করেছে। চলুন, বসবেন চলুন।"

আমি তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা রমা,

তুমি ত বললে না, ত্র্যহস্পর্শে মোটার হাঁকাতে বেরিয়ে তোমার কি লাভ নোকসান হল।”

রমা আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে। আমার চোখে তার চোখে কি কথা হল, জানি না। কিন্তু আবার তার মুখে সেই রক্তরাগ! আমি থাকতে পারলাম না। তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, “এখন থেকে যেন রোজ ত্র্যহস্পর্শ হয়।”

রমা আমার কানে কানে বললে, “তথাস্তু।”

পরদিন ব্যারিষ্টার সাহেব আমাকে তাঁর আপিস ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বিশ হাজার টাকার চেক দিলেন। বললেন, “বাবাজী, কোন রকমে রফা করে এই টাকা পেয়েছি। জানি, তুমি টাকার জন্য মোকদ্দমা করবে না।”

“আজ্ঞে না, আমি মোকদ্দমা কিছুতেই করতাম না। মামা আজ আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। আর আমার মুখ দেখবেন না।”

সাহেব হেসে বললেন, “তা না দেখুন। তুমি ত আর জলে পড় নেই! রমা বলছিল, তোমার সঙ্গে তার একটা কি বোঝাপড়া হয়েছে। ব্যাপারটা কি, বল ত।”

আমি উঠে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম, “আপনি পুত্র বলে আমাকে গ্রহণ করুন।”

“Very happy indeed, my son. তোমাকে দেখে, excuse me, একটু বোকা ভাল-মানুষ মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, টাকার বিষয়ে না হোক, অন্য বিষয়ে you know

your business, নিজের কাজটা বেশ বোঝ! তা তোমার নসীব ভাল। রমা is a ripping girl, অতি চমৎকার মেয়ে!" বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার পর রমার ডাক পড়ল। সেও এসে বাপের পায়ের ধূলা নিলে।

পরের ঘটনাবলী খুব সোজা। হিন্দু মতে বিয়ে। হাইকোর্টে উকীল বলে নাম লেখান। বিলেত যাত্রা। দেড় বছর পরে ব্যারিষ্টার হয়ে প্রত্যাগমন। কথায় বলে রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ। আমার তাই হল। অথচ সবটাই দিক্‌শূল ও ত্র্যহস্পর্শের ফল!

দরিয়ার ক্ষুধা

অনেক বছর আগের কথা। আমি কোকনের রত্নাগিরি বন্দর হতে "গোদাবরী" জাহাজে বোম্বাই যাচ্ছি। সারারাত্রির পথ। আর আমাদের দলটাও বেশ ভারী। তাই কোম্পানীর অনুমতি নিয়ে সেলুনে একটু হাত পা মেলে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। কেবিনগুলো নিতান্ত ছোট ছোট। জাহাজখানা খোলা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার উপযোগী হলেও আকারে বড নয়। হাজার দুই-আড়াই টনের হবে।

তৃতীয় শ্রেণীর স্থান নীচে তলায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বেশীর ভাগ উপর তলার খোলা ডেকের উপর যে যার বিছানা পেতে শুয়েছে। যে বেঞ্চ দখল করতে পেরেছে, সে বেঞ্চেই শুয়ে পড়েছে। সমুদ্র সেদিন বেশ শান্ত। জাহাজটা ধীরে ধীরে দোল খেতে খেতে চলেছে। সেলুনের জানালা দিয়ে মৃদু মন্দ হাওয়া আসছে। চাঁদ উঠেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঢেউগুলো হুস হুস করে জাহাজের গায়ে ঢিমে তালে ভাঙ্গছে। আমি আরামে বসে আপন মনে তামাক খাচ্ছি।

এমন সময় সেলুনের দরজার কাছ থেকে কে ডাকলে, "ডক্টার, ডক্টার!" চেয়ে দেখি রঙ্গীন পায়জামা সুট পরা একজন গোয়ান ভদ্রলোক। আমি উঠে বললাম, "এখানে ত ডাক্তার কেউ নেই, মশায়। সেলুনে সব আমার দলের লোক।"

ভদ্রলোক বললেন, "মেজর নগরকর এই জাহাজে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে বিকেল বেলায় তাঁর আলাপ হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে? এত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার খুঁজছেন কেন?"

"মশায়, জাহাজের পিছনের দিকটায় সেকেণ্ড কেলাস ডেকে এক হিন্দু পরিবার যাচ্ছেন, তাঁদের একটী ছোট ছেলের বড় অসুখ।"

অত রাত্রে চেঁচামেচি করে জাহাজ-সুদ্ধ লোকের ত আর ঘুম ভাঙ্গান যায় না! বিজলী টর্চ্চ নিয়ে দুজনে এদিক ওদিক সন্ধান করতে লাগলাম। শেষ দেখি এক জায়গায় "মেজর নগর-কর" নাম লেখা এক রাশ আসবাব পত্র। সেই খানে দাঁড়িয়ে "ডাক্তার! ডাক্তার!" বলে বার দুই হাঁকতেই এক বেঞ্চ থেকে একটী ফিটফাট প্রিয়দর্শন তরুণ ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। দামী রেশমের পায়জামা সুট পরা। সাহেবের মত বাঁকা বাঁকা ইংরেজী কয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমায় ডাকছেন আপনারা? আমি ডক্টার নগরকর, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল।"

গোয়ান ভদ্রলোকটী বললেন,"আপনার ঘুম ভাঙ্গালাম,ডাক্তার। কিছু মনে করবেন না। কিন্তু এই জাহাজে একটী বাচ্চার বড় শক্ত অসুখ। যায় যায় অবস্থা। একবার আসুন।"

ডাক্তার সাহেব গজগজ করতে লাগলেন, "আমাকে দেখলেই ত আর ব্যারাম ভয়ে পালিয়ে যাবে না! ঔষধ-পত্র নেই, একটা ষ্টেথস্কোপ নল পর্য্যন্ত সঙ্গে নেই, আমি গিয়ে করব কি!"

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম,'ডাক্তার মানুষের কি ও কথা বলা সাজে! একবার যে যেতেই হবে!" সাহেব আমার মান রাখলেন। খৃষ্টান ভদ্রলোকটীর সঙ্গে মন্থর গতিতে জাহাজের পেছন দিকে গেলেন। আমি কাপ্তানের কেবিনে গিয়ে তাঁকে জাগালাম।

মিনিট পাঁচেকে ডাক্তার ফিরে এলেন। বললেন,"তড়কা হচ্ছে, বোধ হয়। ও ছেলে বাঁচবে না। দেখুন, যদি গরম জলে পা ডুবিয়ে কিছু হয়।" বলে তিনি শুতে চলে গেলেন। কাপ্তান ও তাঁর লোকেরা অনেক শুশ্রূষা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। ডাক্তার আর দ্বিতীয়বার উঠলেন না। তাঁকে ডাকতে তিনি চোখ বুজেই উত্তর দিলেন, "Nuisance! জ্বালাতন! আমি কি করব!"

একটু পরে যখন আমি কাপ্তানের সঙ্গে গেলাম ওদের দেখতে, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মরা ছেলেকে কোলে করে তার মা বিছানার উপর বসে রয়েছেন। পাথরের মত নিশ্চল। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। দেখে বোধ হল ব্রাহ্মণের মেয়ে। বয়স বছর পঁচিশেক। রূপসী, বেশভূষার বেশ চটক আছে। পাশে বসে রয়েছে একটি বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা! সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তারও কাপড়-চোপড় ভদ্রলোকের মতন, তবে আমার মনে হল না যে ব্রাহ্মণের ছেলে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। যা হোক তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,"ছেলেটী কত দিন অসুখে ভুগছিল?"

সে কিছু বলবার আগেই স্ত্রীলোকটী উত্তর দিলেন, "জন্মাবধি

রোগা ছেলে! অর ত প্রায় হচ্ছিল!" ছোকরাটী মুখ তুললে, যেন কি বলবে। কিন্তু তার স্ত্রী তার পানে তাকাতেই চুপ করে গেল। আমরা দু একটা সান্ত্বনার কথা বলে সেলুনের দিকে ফিরলাম। যেতে যেতে আমি কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওদের কি স্বামী-স্ত্রী বলে আপনার মনে হল, না ভাই-বোন, না চাকর-মনিব?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না, ওরা স্বামী-স্ত্রী। আমি জানি। সন্ধ্যেবেলা ওদের সঙ্গে যে আমার আলাপ হল। রত্নাগিরি বন্দরে পাড়াও নৌকা থেকে জাহাজে ওঠবার সময় ওই মেয়েটীর কেমন পা পিছলে গেছল, আর একটু হলেই বাচ্চাটী হাত থেকে ফসকে জলে পড়ে যেত। আমার খালাসী একজন খপ করে বাচ্চার পা ধরে ফেললে, তাই বেঁচে গেল! বেঁচে আর গেল কই, তবে তখনকার মতন রক্ষা পেলে! আপনি তার আগেই সেলুনে গিয়ে বসেছেন! আমি ওদের দুজনকে খুব ধমকে দিলাম। মেয়েটী খালাসীকে এক টাকা বকশীস দিলে।"

"আচ্ছা, বোম্বাই বন্দর পৌছে এই লাশ সম্বন্ধে আপনাকে কি করতে হবে?"

"জাহাজ তফাতে দাঁড় করিয়ে রেখে, এতেলা দিতে হবে! তখন বন্দরের সাহেবরা আসবেন। তাদের ডাক্তার আসবেন। পুলিস আসবেন। তাঁরা ছাড়পত্র দিলে তখন জাহাজ পোস্তায় লাগবে, যাত্রীরা নামতে পাবে। তিন চার ঘণ্টা আটক থাকতে হবে।"

"তা হলে ত আমি আর ট্রেন ধরতে পারব না! নাগপুর মেল এগারটার সময় ছাড়ে। শুধু শুধু একটা দিন আবার বোম্বাই-এ হোটেলে পড়ে থাকতে হবে।"

"তা এক কাজ করা যায়, সাহেব। খোলা দরিয়ায় পেসেঞ্জার মারা গেলে কাপ্তান সে লাশ জলে ফেলে দিতে পারে। সে অধিকার আছে। একটা Inquest report—পঞ্চায়ৎনামা করার ওয়াস্তা মাত্র। ডাক্তার সাহেব, আপনি ও আমি পঞ্চায়ৎ-নামায় সহি করব। তাতে লেখা থাকবে যে ছেলেটার মৃত্যুর আগে ও পরে ডাক্তার সাহেব তাকে দেখেছেন, মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে।"

ডাক্তারকে জাগান গেল। বোম্বাই বন্দরে তিন চার ঘণ্টা আটক থাকতে হতে পারে, শুনে তিনি চটপট চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। পঞ্চায়ৎনামা করতেও রাজী হলেন। ছেলেটাকে আবার গিয়ে দেখে এলেন। এসে বললেন যে মৃত্যুর কারণ জ্বর ও convulsions, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাপ্তান বললেন, "ওই কথা স্পষ্ট করে রিপোর্টে উল্লেখ করলেই হবে।"

মেয়েটীর নাম সীতাবাঈ, ছোকরাটীর নাম রামচন্দ্র বিনায়ক ধারকর। বাড়ী রত্নাগিরি জেলায় ডোঙ্গরপুর গ্রাম। পঞ্চায়ৎনামা লিখে দুজনকে পড়ে শোনান হল। রামচন্দ্র তখনও কাঁদছে। খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে সে জিজ্ঞাসা করলে, "ডাক্তার সাহেব, স্বাভাবিক—কারণ, ছাড়া—অন্য কোনও কিছুর জন্য—কি convulsions হতে পারে?"

সীতাবাঈ চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠল, "তোমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! হাকীমদের সামনে কি আবল-তাবল বকছ! চুপ করে শুয়ে থাক।" তার পর খুব নম্রভাবে ডাক্তারকে বললে, "হঠাৎ এই ব্যাপার হওয়ার দরুন ওঁর মাথার ঠিক নেই। অপরাধ নেবেন না, সাহেব।" ডাক্তার মুখের সিগারেটটা বেঁকিয়ে ধরে অবজ্ঞাভরে বললেন, "Hysteric fool! বায়ু-গ্রস্ত, গাড়ল!"

কাপ্তান সীতাবাঈকে বুঝিয়ে দিলেন যে জাহাজের প্রথা-অনুসারে ছেলেকে কেম্বিসের থলির ভেতর পুরে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করা হবে। অবশ্য এ কাজ তিনি হিন্দু খালাসীদের দিয়ে করাবেন, তবু ছেলের বাপ ইচ্ছা করলে থলির এক কোণ ছুঁয়ে থাকতে পারবেন। সীতাবাঈ বললে, "ওঁর অবস্থা ত দেখছেন, আমিই থলি ধরে থাকব।"

জাহাজ থামিয়ে ডেকের রেলিং খানিকটা খুলে ফেলা হল। খালাসীরা "রাম বোলো, রাম রাম," হেঁকে থলি ফেলে দিলে সাগরগর্ভে। একটা বড় পাথরের চাঙড়া বাঁধা ছিল, থলিটা তৎক্ষণাৎ তলিয়ে গেল। সীতাবাঈ গিয়ে বসল স্বামীর পাশে। আবার ঝিকি-ঝিকি করে ইঞ্জিন চলল।

আমরা তখন খান্দেরী দ্বীপের কাছ দিয়ে চলেছি। আশে-পাশে সমুদ্র জেলেডিঙ্গিতে ভরা। হঠাৎ অ-জায়গায় জাহাজ থামতে দেখে জেলেরা সবাই মুহূর্ত্তেক তাকিয়ে দেখলে, ব্যাপার কি! কি বুঝলে, কে জানে! জাহাজ ছাড়লে আবার মাছ ধরতে লেগে গেল।

বোম্বাই বন্দরে আমাদের আর কোন গোলযোগ হল না। আমি দুপুরে নাগপুর মেল ধরে দেশে চলে গেলাম।

দেখতে দেখতে তিন মাস ছুটি কেটে গেল। আবার কর্ম্মস্থানে ফিরছি। বোম্বাই ষ্টেশনে নেমে ঝট করে এক ট্যাক্সি নিয়ে বন্দরে চলে গেলাম, যদি সম্ভব হয় ত ডাক জাহাজটা ধরব। তা হলে এক প্রহর রাত্রে বাড়ী পৌঁছতে পারব। ডক-এ গিয়ে দেখি, সেই "গোদাবরী" জাহাজ। ছাড়ব ছাড়ব করছে। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে উঠে পড়লাম। কাপ্তান সাহেব হাসি-মুখে স্বাগত করলেন, "এস, সাহেব। দেশে বেশ আনন্দে দিন কাটল? বাড়ীর সব ভাল?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ কাপ্তান, সব মঙ্গল। তোমাদের খবর কি, দরিয়া কি বলে!"

"দরিয়া কদিন খুব গরম যাচ্ছে। তবে তোমার কি সাহেব, তুমি ত একেবারে পুকুরের মতন ঠাণ্ডা দরিয়া ভালবাস না।"

"না, তা বাসি না বটে। তবে জাহাজ দুললেই পেসেঞ্জার-গুলো যা কাণ্ড করে! তার মাঝে বসাই দুষ্কর।"

"তুমি আমার কাছে ব্রিজের উপর এসে বস। কেম্বিসের আরাম-কেদারা পেতে দেব। দিনের বেলার সফর, তাতে কিছু কষ্ট হবে না!"

"বেশ, তাই করা যাবে, কাপ্তান সাহেব। ভাল কথা, তোমার জাহাজে আর কেউ পেসেঞ্জার মরে-টরে নেই ত?"

"কেন, আপনার আবার ভূতের ভয় আছে না কি? না, আর কেউ মরে নেই। কিন্তু এক মজার কথা, সাহেব। সেই রামচন্দ্র ধারকর আর তার স্ত্রী আজ আবার এই জাহাজে উঠেছে যে! তারা গোয়া যাচ্ছে। মেয়েটার চেহারা এমন বিশ্রী হয়ে গেছে যে কি বলব! কি খুব-সুরত ছিল মনে আছে ত, সাহেব?"

আমার কেমন একটু কুতূহল হল। বললাম, "চলুন না, ওদের দেখে আসি।"

একেবারে জাহাজের পিছন দিকে যেখানে কাছিগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলে রেখেছে, সেইখানে দেখি, দুজনে বসে রয়েছে। মেয়েটা ধুঁকছে, যেন সবে রোগশয্যা থেকে উঠেছে। রামচন্দ্র আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠল। হেসে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে চিনতে পারছ, সাহেব? তুমি অমুক, না?" বেশ সপ্রতিভ ভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে রামচন্দ্র, দেশে ফিরছ না কি? বোম্বাইয়ে কাজকর্মের সুবিধা হল না? বাঈ-এর কি অসুখ-বিসুখ করেছিল?"

"না, ওর শরীর ত ভালই আছে! আমারই বরং বোম্বাইয়ের আবহাওয়া সহ্য হল না। গোয়া যাচ্ছি। সেখানে কাজকর্মের একটু সুবিধা হয়েছে। তবে জান ত সাহেব, দুনিয়া আজব জায়গা, কখন কি হয় বলা যায় না!"

সীতাবাঈ এর চোখে কেমন একটা চকিত সন্ত্রস্ত চাহনি। স্বামী আমাদিকে যা যা বলছে, এক মনে শুনছে। কাপ্তান

রামচন্দ্রকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাঈ ছেলের শোক এখনও ভুলতে পারেন নেই, না ?" রামচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল। এতে হাসির কথা কি আছে ? বড় বিশ্রী শোনাল সে হাসি। লোকটা নেশা-টেশা ধরেছে না কি !

জাহাজ ছাড়লে আমি ব্রিজ-এ গিয়ে বসলাম। কাপ্তান লোকটী ভাল। তার সঙ্গে গল্পগুজব করে সকালটা বেশ কেটে গেল। গল্পের ভাণ্ডারও তার অফুরন্ত। সে পোর্ত্তুগীজ রাজ্যের প্রজা। বাড়ী গুজরাতের দমন বন্দর। বাপ-দাদার আমল থেকে তাদের এই এক ধান্দা, সেরাঙ্গগিরি। সেকালের নৌকাডুবির কথা, ঝড়-তুফানের কথা, লুটপাটের কথা কত কি বললে! মরাঠা, হাবসী, পোর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, সকলের চাকরীই এরা করেছে। সবাই ত এক কালে বোম্বেটেগিরি করত !

"এই যে সামনে খান্দেরীর বাতি-ঘর দেখছ, সাহেব, এও একটা মস্ত বোম্বেটের আড্ডা ছিল। এর ভেতর কত লুকানো খাড়ী আছে, গুহা আছে, দরকার পড়লে আট দশখানা ডিঙ্গা একেবারে গা-ঢাকা দিতে পারে। আমার দাদার একবার হয়েছিল কি—"

গল্প বেশ জমেছে, ভাত খাওয়ার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি, এমন সময় নীচে একটা ভয়ানক শোরগোল উঠল। চীৎকার শোনা গেল, "জলে পড়েছে, মানুষ জলে পড়েছে—" "ধরে রাখ ব্যাটাকে"—"কাপ্তান, কাপ্তান, কাপ্তান সাহেব !"

কাপ্তান ঝাঁ করে জাহাজ থামিয়ে দিলেন। দুজনে ছুড় ছুড়

করে নেমে গেলাম। সেকেণ্ড কেলাস ডেকের পিছনের দিকটায় ভয়ানক গোলমাল। কাছে গিয়ে দেখি দুজন মাল্লা জোর করে রামচন্দ্র ধারকরকে ধরে রয়েছে। কয়েকজন পেসেঞ্জার রেলিং ঝুঁকে কি দেখছে। "ওই, ওই দেখা যাচ্ছে ঢেউয়ের উপর।" "না হে, না, কি যে বল! ওটা ত একটা কাঠের তক্তা। লাশ এতক্ষণ কোথায় তলিয়ে গেছে।"

কাপ্তান তাড়াতাড়ি একে তাকে দুচার কথা জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন যে, রামচন্দ্র তার স্ত্রীকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দুজন খালাসী লাইফ বেণ্ট নিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। একখানা বোট জলে নামান হল। ছোট কাপ্তান স্বয়ং সেই বোটে নামলেন। আধ ঘণ্টা ধরে চারিদিকের দরিয়া তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করেও সীতাবাঈয়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

রামচন্দ্র এতক্ষণ যেন বসে ঝিমোচ্ছিল। ছোট কাপ্তান ফিরে আসতেই হা হা, হো হো! করে হেসে উঠল। "কোথায় পাবে তাকে! ডাইনী আমার ছেলেকে খুঁজে আনতে গেছে।"

একজন মুসলমান পেসেঞ্জার সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। জাহাজ ভয়ানক দুলছিল। বেশীর ভাগ যাত্রীই যে যার বিছানায় চোখ বুজে পড়েছিল। এ ভদ্রলোকের দরিয়া লাগে না। একখানা কেতাব হাতে করে বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন। খান্দেরীর কাছ বরাবর দেখলেন, সীতাবাঈ দাঁড়িয়ে উঠে টলতে টলতে রেলিং এর কাছে গেল। বোধ হল, বেচারীর ঘুর লেগেছে।

রেলিং ধরে মুখ বাড়িয়ে যেই দাঁড়িয়েছে, কি রামচন্দ্র এক লাফে গিয়ে তার পা দুটো জাপটে ধরলে। সীতাবাঈ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি কিছু করি নেই গো! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!"

"যা রাক্ষসী, আমার ছেলে নিয়ে আয়!" বলে রামচন্দ্র তার পা দুটো টেনে তুলে মারলে এক ঠেলা।

"বামনীকে জলে ফেলে দিলে। বাঁচাও, বাঁচাও!" বলে চীৎকার করতে করতে মুসলমানটী দাঁড়িয়ে উঠলেন। দু তিনজন লোক দৌড়ে গেল সেই দিকে, কিন্তু ততক্ষণে সীতাবাঈ সমুদ্রের অগাধ জলে।

রামচন্দ্রের অট্টহাস্য শুনে কাপ্তানেরও মাথা গেল বিগড়ে। তিনি তাকে লাথি মারতে মারতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হারামজাদা, নিজের আওরৎকে খুন করে আবার হাসি! বে-শরম!"

আমি কাপ্তানের পিঠে হাত রেখে বললাম, "ছিঃ, কাপ্তান সাহেব, আপনি জাহাজের কর্ত্তা। আপনার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।" তিনি সামলে নিলেন।

তখন রামচন্দ্রও একটু শান্তভাবে বলতে আরম্ভ করলে, "এতে রাগের কথা কি আছে, মশায়? আম্মার ছেলেটাকে ও রাক্ষসী খেয়েছে। এনে দিক, যেখান থেকে পারে।

মাগী আমার আওরৎও নয়, কেউ নয়। এক গ্রামের বাসিন্দা, এই যা। নইলে, ও বামনী, আমি ভাণ্ডারী, ওর সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ! জানেন, ও আমাকে ফুসলে নিয়ে বোম্বাই যাচ্ছিল? মাগী যাদু জানে, মশায়। আমাকে একেবারে ভেড়া

বানিয়েছিল। আমি লেখাপড়া জানা মানুষ, বড়োদায় থাকি। সেখানে কলাভবনে ছবি-আঁকা শিখছি। ছুটিতে বাড়ী আসি মাঝে মাঝে। কেমন করে, কে জানে, ওর খর্পরে পড়ে গেলাম!

একদিন বললে—আমারও সোয়ামী নেই, তোরও বৌ নেই, তোকে আমি বিয়ে করব।

আমি ভাবলাম—বেশ ত, ফাঁকতাল্লায় অমন সুন্দর বৌ পাব! না হয়, গাঁয়ে আর নাই বা ফিরলাম! বোম্বাইয়ে ছবি বিক্রী করে খাব।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা ওদের খিড়কীর দরজায় ধরা পরে গেলাম। ওর ভাসুর দেওর আমাকে বেদম জুতো-পেটা করলে। তাদের কাছে দিব্যি করতে হল যে আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। মনে বড় ধিক্কার হল!

ভোর রাত্রে মাগী আমার বাড়ী এসে বললে—চল, দুজনে বোম্বাই পালাই। সেখানে নূতন ঘরকন্না পেতে সুখে থাকব।

আমি খোকাকে আনতে গেলাম, কিন্তু ও ডাইনী খ্যাঁক করে উঠল—না, না, ও সব ফ্যাসাদে কাজ নেই। একা চল। ওইটুকু ছেলের হাঙ্গাম পোহাবে কে! আমি পারব না।

কত রকমে আমাকে বোঝাতে লাগল, খোকা এখন তার কাকী পিসীর কাছে থাকুক, একটু বড় হলে নিয়ে গেলেই হবে। আমি কত তর্ক করলাম। যখন কিছুতেই শোনে না, তখন ভারী রাগ হল। বলে দিলাম, আমি একলা যাব না, বাস্, তুই বাড়ী ফিরে যা।

মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল মাগী, কিন্তু দশ পনের মিনিট পরে ফিরে এসে বললে,—চল, তাই চল। খোকাকে নিয়ে এস।

আমি বোকা মানুষ, ওর ছল কি বুঝব! গাঁয়ের বাহিরে গরুর গাড়ী তৈরী ছিল। তখনই তিন জনে রওয়ানা হলাম।"

কথা বলতে বলতে রামচন্দ্র ক্রমশঃ বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। কাপ্তানের দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে বললে, "আগ-বোটে চড়বার সময় কি কাণ্ড করছিল, সে ত তুমি চোখে দেখলে, কাপ্তান সাহেব! তখনই আমার সন্দেহ হল। তার পর রাত কাটল না। রাক্ষসী ছেলেকে কি খাইয়ে দিলে, কে জানে!

তখনকার মতন তোমাদিকে সব বোকা বুঝিয়ে দিয়ে দিব্যি পার পেয়ে গেল। কিন্তু আমার ছেলেকে ও খেয়েছে, আমি ছাড়ব কেন! বোম্বাইয়ে পৌঁছে ওকে আমি বেশ করে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি দিনে দিনে তিলে তিলে ওকে মারব। শেষ মুহূর্ত্তে ওর গলা টিপব, কি ক্ষুর দিয়ে টুঁটি কেটে দেব, তা তখনও ভেবে ঠিক করি নেই।

একটা পালাবার পথ ওর আমি খোলা রেখেছিলাম। বলে দিয়েছিলাম যে যদি ও আমাকে ছেড়ে চুপচাপ দেশে ফিরে যায়, ত আমি কিছু বলব না। কিন্তু সে সাহস ওর হল না! সেখানে জ্ঞাতিরা যে ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাস্তায় বার করে দেবে!

আজ গোয়াতে নিয়ে যাচ্ছিলাম ইংরেজ রাজত্বের বাহিরে, সেইখানে ওকে নিকেশ করব বলে। পোর্ত্তুগীজ পুলিসকে ঘুষ-

ঘাষ দিয়ে পালান যায়, শুনেছি। মিথ্যে নিজের প্রাণটা কেন দেব!

কিন্তু খান্দেরীর বাতি-ঘর দেখে আমার আর তর সইল না। ওইখানেই ত ডাইনী আমার ছেলেকে খেয়েছিল! সুবিধাও হল। নিজেই উঠে রেলিং-এর কাছে গেল। দিলাম পা দুটো ধরে—

যাক্, কাজ সাবাড় করেছি। আর বেঁচে থেকে ফাঁসী গিয়ে কি হবে!"

এই না বলেই রামচন্দ্র ঝটকা মেরে মাল্লা দুজনের হাত ছাড়িয়ে রেলিং-এর দিকে এক লাফ মারলে। কিন্তু কাপ্তান বোধ হয়, সতর্ক ছিলেন। বাঘের মতন ঘাড় মটকে ধরে বললেন, "ও সব চালাকী চলবে না, রামচন্দ্র। চল, তোমাকে কেবিনে তালা বন্ধ করে রাখিগে।"

লোকটাকে কেবিনে বন্ধ করে রেখে এসে কাপ্তান আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ত এ সব ব্যাপার আমার চেয়ে ভাল বোঝ, সাহেব। সীতাবাঈ কি সত্যি ছেলেটাকে মেরেছিল? তোমার কি বিশ্বাস?"

আমি আনমনা হয়ে উত্তর দিলাম "তা কে জানে, কাপ্তান? মারুক আর না মারুক, ফল ত একই দাঁড়াল! দরিয়ার ক্ষুধা যে বড় ভয়ানক জিনিস!"

বাঁদরী

আমার নায়িকার নাম মাধুরী। বয়েস সতের বছর। মাথায় খাটো, ছিপ ছিপে গড়ন। হঠাৎ দেখলে তেরো, চোদ্দ বছরের মেয়ে বলে মনে হয়। হরিণীর সঙ্গে তার চলা-ফেরা হাবভাবের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু হরিণ-নয়নী তাকে বলা চলে না। চোখ দুটী ছোট্ট ছোট্ট, কিন্তু সর্ব্বদা সাঁঝ তারার মতন ঝিকমিক করছে। কোঁকড়া কোঁকড়া, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক রাশ কালো চুল মুখ-খানিকে ঘেরে হাওয়ায় উড়ছে। মুখখানি বড় সুন্দর, কিন্তু তাকে চাঁদপানা বলা শক্ত। চাঁদ অমন আশ্চর্য্য দীপ্তি পাবে কোথায়!

মেয়েটী কালো কি ফরসা, তা ত বলা হল না! হয়ত ছেলেবেলায় খুব বাদাম-বাঁটা, দুধের সর মাখালে ফরসাই হত! কিন্তু আপাততঃ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের বেশী বলা চলে না। পাড়া-গাঁয়ে পুকুরে সাঁতরে, রোদে দৌড়-ঝাঁপ করে, বড় হয়েছে। বর্ণ-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

মা-মরা মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে বাপ তাকে মামা মামীর কাছে ফেলে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন রোজগার ধান্দার চেষ্টায়। মামী চিররুগ্না। ভাগনীকে আদর দেওয়ার বেশী কিছু করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। মামা শম্ভুবাবু ছিলেন ইস্কুল মাষ্টার।

কিন্তু মামুলী ধরণের মাষ্টার নয়। ছেলে মেয়ে মানুষ করা সম্বন্ধে তাঁর নানা আজগুবি খেয়াল ছিল। সেই সমস্ত খেয়ালগুলি চালিয়েছিলেন এই ভাগনীটার উপর।

ফলে, মাধুরী প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করে পনের টাকা জলপানি পেলে। ইস্কুলে ফার্ষ্ট হওয়ার জন্য সোনার মেডেল পেলে। কিন্তু শুধু তাই নয়, লাঠিখেলা, জুজুৎসুতেও তার সামনে ইস্কুলের কোন ছেলে কখনও দাঁড়াতে পারে নেই। বাবুদের খিড়কীর পুকুরটা সে না থেমে অক্লেশে পনের বার সাঁতরে পার হত। গাছে চড়ার ত কোনও মেডেল ছিল না! থাকলে মাধুরী যে সেটাও পেত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর একটা কথা। পাঠক নিশ্চয় মনে করছেন, এই অদ্ভুত জীবটির নাম বাপ মা মাধুরী কেন দিয়েছিলেন! তা বাপ মা ত দেন নেই! মা কোন কালে স্বর্গে চলে গেছেন। বাপ যে মেয়ের খুব বেশী খোঁজ খবর রাখতেন, তাও নয়। নাম রেখে-ছিলেন মামাবাবু। মাধুর্য্য-সম্বন্ধে তাঁর মতামত একটু অসাধারণ ছিল। মেয়েটাকে, গান দূরে থাক, মোহিনী ফ্লুট পর্য্যন্ত বাজাতে শেখান নেই। 'প্রলয় নাচন' নাচটা অবধি কোন দিন নাচতে শেখান নেই। এই নিয়ে মামী কতবার গজ গজ করেছেন। মামার বাঁধা বুলি ছিল, "দেখবে গো দেখবে! দিন কতক যাক, কত রাজপুত্তুর এসে তোমার দোর গোড়ায় ধরনা দেবে!"

ইস্কুলের ছেলেগুলো লেখা-পড়া, খেলা-ধুলো, সবেতেই হেরে গিয়ে কিন্তু গায়ের জ্বালায় মেয়েটার এক নূতন নাম দিয়েছিল—

বাঁদরী। প্রথম প্রথম মাধুরী এ নাম শুনলে ভয়ানক ক্ষেপে উঠত। দুচারজন ছেলে মেয়েকে চুলের মুঠি ধরে উত্তম মধ্যমও দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে এমন দিন এল, যে কেউ তাকে বাঁদরী বলে না ডাকলে তার মনে দুঃখ হত। একদিন মামাকে গম্ভীরভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "মামা আমার নূতন নাম কি হয়েছে, জান?" মামা গাল টিপে দিয়ে বললেন, "তোর নাম ত অনেক। খুকী, হাঁড়িগাকী, পোড়ারমুখী।" "তার চেয়েও অনেক ভাল নাম, মামা। কি বল, দেখি! ইস্কুলের ছেলেরা দিয়েছে। তোমাদের মাধুরী তার কাছেও লাগে না।" "আমি জানি না। কি, হনুমান?" "প্রায় ঠিক হয়েছে। আর একটু ভাব।" "না, আমি আর এখন ভাবতে পারি না। তুই বল।" "এই দেখ," বলে ভারতবর্ষের ইতিহাসখানা খুলে দেখিয়ে দিলে। লেখা রয়েছে—বাঁদরী বন্দ্যোপাধ্যায়, থার্ড কেলাস।

মামা চুলের ঝুঁটি ধরে খুব নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোফা নাম! বাঃ! কে দিয়েছে বল, তাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে লুচি মণ্ডা খাইয়ে দেব।"

এই সময়টায় একবার অনেক কাল পরে পূজার ছুটীতে মাধুরীর বাবা সত্যবাবু দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। মেয়ে তাঁকে আনতে—মামার সঙ্গে ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল পথ গেছল। বাপকে দেখেই মেয়ে লাফিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে "বাবা, বাবা!" করে ঝুলতে আরম্ভ করলে। ষ্টীমার ঘাট লোকে লোকারণ্য। তার মাঝে বারো বছরের এত বড় মেয়েটা করে কি! বেচারা

সত্যবাবু একটু ঘেবড়ে গেলেন। কলকাতার মতন সুসভ্য শহরে তাঁর বাস কি না! কিন্তু বড় মিষ্টি লাগল। মেয়েকে বুকে চেপে ধরে আদর করে বললেন, "তোর জন্য একটা মেম পুতুল এনেছি, খুকী।"

"মাগো! তুমি যেন কি, বাবা! আমার কি আর পুতুল খেলার বয়স আছে? ঘরের কত কাজকর্ম্ম করি আমি!" মামা হেসে বললেন, "ঘরের কাজ করেই মেয়ের হাল হয়ে গেল, দাদা! বাড়ী গিয়ে সব গুণের কথা শুনবে। আপাততঃ বলি, মাধুরী নামটা বাতিল করে বাঁদরী নাম রাখা হয়েছে। বেশ মানিয়েছে, না?" "তুমি ও সব কথা শুনো না, বাবা। এস, দেরী হয়ে যাচ্ছে", বলে মেয়ে হিড়হিড় করে বাপকে টেনে নিয়ে গেল এক ছই-দেওয়া গরুর গাড়ীর পানে।

দেখতে দেখতে একটা মাস কখন কেটে গেল! কলকাতা রওয়ানা হওয়ার সময় সত্য মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। মেয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "ছি! কচি খোকার মতন কেঁদো না, বাবা! আমি ত বছর তিন পরে কলকাতায় আসছি তোমার কাছে।" তার পর মামার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "তখন আবার তোমরা কত কাঁদবে, মামা। মাগো মা! এমন জ্বালাতনও হতে হয় মানুষকে!"

মানুষটী নিজেও বেশ এক চোট কাঁদলে। নিরিবিলি, রাত্রিবেলায়, বালিশে মুখ গুঁজে। পাছে মামী শুনতে পান! বেচারী রোগা মানুষ, শুনলে আবার কেঁদেকেটে অসুখ করবে।

সত্যবাবুর কলকাতায় ফিরে কিন্তু আর কিছুতেই মন বসল না। এত দিন নিজের কাজ কারবার নিয়ে বেশ ছিল বেচারা। আপন কাঠগোলাতে একটা গোলার ঘরে পড়ে থাকত। হোটেলে খেত। মেয়ে একটু বড় হয়ে অবধি হপ্তায় একখানা করে চিঠি লিখত। তাইতেই বাপ মহা খুশী ছিল। কিন্তু এত কাল পরে এবার মাধুরীকে দেখে, তার কাছে এক মাস থেকে এসে, কাঠগোলার ঘর, হোটেলের ভাত, সব যেন সত্যর বিষবৎ মনে হতে লাগল। মেয়েটা কি সুন্দরই হয়েছে, ঠিক যেন তার মায়ের ছবিটী! দেশে দিন কটা কেটে গেল যেন স্বপনের মতন। নাঃ, আর একা কলকাতায় থাকতে পারব না। কিছুতেই না। দেখি একবার শম্ভুকে লিখে। ওদের মত নইলে ত আর খুকীকে আনতে পারি না। ওরা নিতান্ত না মত করে, ত কারবার তুলে দিয়ে আমিও দেশে চলে যাই। দিন চারেক বাদ শম্ভুর এই চিঠি এল—

"জামাইবাবু, অত অধীর হলে চলে কি! কারবার তুলে দিয়ে এখনই আপনার এখানে আসা হতে পারে না। সেটা অত্যন্ত ছেলেমানুষী কাজ হবে। খুকীর জন্য বেশ কিঞ্চিৎ টাকা জমাতে হবে। আজ কাল বরের বাপেরা কি রকম চশমখোর হয়ে উঠেছে, জানেন ত! তার পর দু বছর বাদে খুকী যখন কলকাতায় কলেজে পড়তে যাবে, তখন থাকবে কোথায়! বাসা করতে হবে। হোষ্টেলে থাকা আমার মত নয়। কলেজে পড়ানর খরচও ঢের। অতএব টাকা চাই।

আমি নিজে গরীব গুরুমহাশয় মাত্র। তাই বাধ্য হয়ে টাকাকড়ির কথা উত্থাপন করতে হল।

মেট্রিকের আগে আমি খুকীকে ছাড়তে পারব না। এখনও তাকে অনেক কিছু শেখান বাকী। আমি আমাদের কথা ভাবছি না। আমাদের যা হয়, হবে। কিন্তু খুকীর বাল্য-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা প্ল্যান বরাবরই আছে। আশা করি, সেটা আপনি পণ্ড করবেন না। আপনার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছি। কিন্তু দুটী বছর বই ত নয়! ইচ্ছা হয়, তিন চারবার এসে খুকীকে দেখে যাবেন, ইতি।"

মাধুরী লিখলে, "বাবা, তোমার চেয়ে আমার ঢের ঢের বেশী মন কেমন করছে, তা জান! আমি কি করে তোমাকে ছেড়ে রয়েছি! দু বছর পরে মামা মামীকে অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, তবে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। এখন হঠাৎ চলে গেলে, মামী ত মরেই যাবে, মামারও কি হবে, জানি না। তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বড়, তোমাকে একটু কষ্ট ভোগ করতে হবে বই কি!

ছুটী পেলেই আবার এসো কিন্তু।"

সত্যবাবু দেখলেন উপায় নেই, কোনও রকমে দুটী বছর ধৈর্য্য ধরে থাকতেই হবে। তিন চারবার দেশে গিয়ে মেয়ের মুখখানি দেখে দেখে এলেন। প্রতিবারই ফিরে আসতে বেশী কষ্ট বোধ হত। ভদ্রলোক ভেবে পেতেন না, যে এত দিন এই মেয়েকে ভুলে ছিলেন কি করে! এই কয় বছরে সত্য ব্যবসা-বাণিজ্যের

খুব ফেলাও করেছেন। টাকাও হাতে অনেক জমে গেছে। ভবানীপুরে ছোটখাটো দেখে সুন্দর একখানি বাড়ী কিনলেন, মেয়ে এসে থাকবে বলে।

* * *

যথা-সময় মাধুরীর মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হল। শম্ভুবাবু এসে তাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মেয়ে অনেক ধরাধরি করলে, "মামা, দিনকয়েক থেকে যাও!" মামা বললেন, "নাঃ, আর মায়া বাড়িয়ে কি হবে! মেয়েছেলে সব নিমকহারাম। তোর বাবা বোঝে না, তাই বুড়ো বয়সে সাধ করে গলায় ফাঁস পরছে।"

মাধুরী খুব জোরে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "আমাকে তোমরা তাড়িয়ে না দিলে আমি বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, গো! আর,—মামা, মামী বেচারীকে একটু দেখো শুনো—" বলতে বলতে মেয়ের গলা ধরে এল। জোর করে হেসে উঠল, "আচ্ছা মামা, মামীও তাহলে নিমকহারাম! নিজের বাপ-মাকে ফেলে তোমাদের বাড়ী এতদিন রয়েছে!" মামাও হাসলেন, "সাধে কি তোর নাম বাঁদরী দিয়েছি। বেটী, মামীকে গালাগাল!" কান্নার মেঘ কেটে গেল। সকলে হাসতে লাগল।

সত্যবাবু জীবনে কখন সাধ করে ছুটী নেন নেই। এবার মেয়েকে নিয়ে দার্জ্জিলিঙ্গ ঘুরে এলেন। মাধুরীর পাহাড় খুব ভাল লাগল। প্রাণ ভরে চারিদিকে লম্বা লম্বা পাড়ি দিতে লাগল। বাপ বেটীতে হাসতে হাসতে ঘুরে বেড়াত যেন ছুটী

সমবয়স্ক বন্ধু। পাহাড়ী মেয়েদের দেখে মাধুরী মোহিত হয়ে গেল। বাপকে একদিন বললে, "বাবা দেখ দেখিনি কেমন হেসে হেসে নেচে নেচে ওরা ঘুরে বেড়ায়! নাকমুখ থ্যাবড়া বটে, কিন্তু কি চমৎকার গড়ন, কি সুন্দর স্বাস্থ্য! আর আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের দেখ না! রঙ্গ-বেরঙ্গের কাপড় পরাই সার। একটু দৌড়ঝাঁপ করবার মুরদ নেই!" বাপ হেসে উত্তর দিলেন, "তুইও ত বাঙ্গালীর মেয়ে! তুই অত লাফিয়ে বেড়াস কি করে?" "আমি! আমার কথা ছেড়ে দাও। সেদিন শুনলাম এক গিন্নী বলছেন—ওই সেই ধিঙ্গী মেয়েটা! সেনিটেরিয়ামে আমার দিকে সব কি রকম কটমট করে তাকায় দেখ নেই?" বাপ বললেন, "নে, কটা দিন দৌড়াদৌড়ি করে নে, কলকাতায় গিয়ে ত এ সব চলবে না!" "ইস্, তাই বই কি! কলকাতায় আমি হকী খেলব।" বাপ হাসলেন।

কলকাতায় ফিরে মাধুরী আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হল। মাস দুই যেতে না যেতে সেখানেও তার বাঁদরী নামটা প্রচার হয়ে গেল। তাদের দেশের দুটী মেয়ে ওই কলেজে পড়ত। তারাই বলে দিয়ে থাকবে। কলেজে পড়ছে বলে মাধুরী যে হঠাৎ খুব শান্ত গম্ভীর হয়ে গেছল, তা ত নয়! অন্য মেয়ের খোঁপা খুলে দেওয়া ইত্যাদি ছোটখাটো দুষ্টুমির জন্য লেডী প্রিন্সিপাল উমা দেবীর কাছে আরম্ভেই দু একবার বকুনি খেতে হয়েছিল। তবে, অল্প-দিনেই অধ্যাপকেরা দেখলেন যে মেয়েটী অসাধারণ বুদ্ধিমতী, সব ক্লাসেই ফার্ষ্ট হতে আরম্ভ করলে। প্রিন্সিপাল কেবলই

বলতেন "খুব পড়, এবার ইউনিভার্সিটীতে ফার্ষ্ট হও দেখিনি!" কলেজের মেয়েরা প্রথম থেকেই বাঁদরীকে ভালবাসত। যার যা দুঃখ কষ্ট, সব তাকে গিয়ে বলত। সেও যেমন করে পারে সকলের সাহায্য করত। এই বাবতে বাপের মাসিক বিশ পঁচিশ টাকা বেরিয়ে যেত। দুই একজন জেঁকো বড়লোকের মেয়ে কলেজে আসত, যারা গরীব মেয়েদের চাল চলন কাপড় চোপড় নিয়ে বড় ঠাট্টা তামাশা করত। বাঁদরী করলে কি, একদিন তাদের একজনার সাড়ীতে দিলে লাল কালী ঢেলে। আর একদিন একজনকে পায়ে পা লাগিয়ে কাদায় ফেলে দিলে। তারা নালিশ করলে। উমা দেবীর কামরায় আসামীর ডাক পড়ল। বাঁদরী ত দোষ অস্বীকার করবার পাত্র নয়! সে সব কবুল করলে। বকুনিও খেলে খুব, কিন্তু বলতে ছাড়লে না, "এইবার হতে নিরীহ গরীবের মেয়েদের তাহলে আপনি বাঁচাবেন জুলুম থেকে!" প্রিন্সিপাল হেসে ফেললেন। বললেন, "মিস্ বাঁদরী, এই কলেজের কর্ত্তা তুমি না আমি?"

মাধুরী যে স্বভাবতঃ অবাধ্য ছিল, তা নয়। দেশে মামা মামীর কথায় উঠত বসত। কলকাতায় এসে অবধি বাপের সামান্য ইচ্ছাটী পূর্ণ করবার জন্য সদাই ব্যস্ত ছিল। কলেজের উমা দেবীকেও সে ভালবাসত, ভক্তি করত। তিনি জানতেন, এ জাতের মেয়েকে কি করে বাগ মানাতে হয়। অনেক সময় কলেজের পর উমা দেবী মাধুরীকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতেন, শক্ত পড়াশুনো বলে দিতেন, দেখিয়ে দিতেন। তিনিই

মাধুরীকে হকী খেলার বাতিক থেকে নিরস্ত করলেন। হেসে বললেন, "বাঙ্গালী মেয়েদের ত হকী-ক্লাব নেই। নাই বা ও খেলা শেখা হল! ছুটীর সময় দেশে গিয়ে খুব সাঁতার দিও, গাছে চড়ো, হা-ডুডু খেলো।" মাধুরী হতাশ ভাবে বললে, "মামী আর গাছে চড়তেও দেন না, আর হাডুডু খেলতেও দেন না, উমা দিদি!"

সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পর একদিন দেখা গেল মাধুরী মোটা খদ্দর পরে কলেজে এসেছে। উমা দেবী তাকে দেখবামাত্র চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ আবার কি নূতন ঢঙ্গ? তোমাকে ত এ বেশে কখনও দেখি নেই!" বাঁদরী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, "এখন থেকে খদ্দর ছাড়া কিছু পরব না, ঠিক করেছি, উমা দিদি। শুধু তাই নয়। আমি দেশ-সেবিকার দলে নাম লিখিয়েছি যে!" "তাই না কি! তাহলে ত এবার ব্রিটিশ রাজত্বের মহা বিপদ!" বাঁদরী গর্জ্জন করে উঠল, "উমাদি! আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন!" "না গো না, ঠাট্টা করি নেই। রাগ করিস না। কিন্তু এর চেয়ে যে তোর হকী খেলা ছিল ভাল!"

উমা দেবী বেশ একটু চিন্তিত হলেন। বাঁদরীর মাথায় একবার খদ্দরী খেয়াল ঢুকলে তাকে অল্পে নিরস্ত করা যাবে না। আর যে দিনকাল পড়েছে, এ খেয়াল কোথায় গিয়ে থামবে, তারই বা ঠিক কি! তবু দিন কয়েক সবুর করা ভাল, এখনই বাধা দিতে গেলে একেবারে বেঁকে দাঁড়াতে পারে।

সত্যবাবুও মেয়ের খদ্দর-ব্রত নেওয়ার প্রস্তাবে প্রথমটা ঘেবড়ে

গেছলেন। তবে বেচারা ভাল মানুষ, নিজে খদ্দর পরেন, তাই মনে করলেন, "ছেলেমানুষ, একটা সখ চেপেছে, দিন কয়েক করুক না। বাড়াবাড়ি না হলেই হল!" মেয়েকে বললেন, "তুই এই মোটা চটের মতন কাপড় পরতে পারবি রে?" মেয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, "তোমরা মেয়েটাকে যে রকম সৌখীন বাবু করে মানুষ করেছ, গা ছড়ে যেতে পারে!" বাপও খুব একচোট হাসলেন। সন্ধ্যাবেলায় দোকান থেকে এক গাদা নানারকমের খদ্দরের কাপড় জামা এনে দিলেন।

অল্পদিনেই কিন্তু দেখা গেল, মাধুরী শুধু যে খদ্দর পরছে, তা নয়, সেবিকা-সঙ্ঘ নিয়ে রীতিমত মেতে উঠেছে। পড়া-শুনোরও যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে! একদিন উমা দেবীর কাছে একজন পুলিসের লোক এসে বলে গেল যে, মাধুরী যে সব মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় তাদের অনেকে পুলিসের দাগী লোক। উমা দেবী সত্যবাবুকে এক চিঠি লিখলেন। পরদিন সকালবেলায় দুজনের মাধুরী-সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল। বাপ বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন। এত বড় মেয়েকে জোর করতেও তাঁর সাহস হচ্ছিল না। অথচ পুলিসের নজর যখন পড়েছে তার উপর, তখন বিপদ আসতে কতক্ষণ! ভদ্রলোক বিষম ফাঁপরে পড়লেন।

* * *

একদিন বেলা এগারটার সময় সত্য কাঠগোলা থেকে ফিরে এসে সামনের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন, আর চিন্তা

করছেন। মেয়ে সারা সকালটা কি সভা-সমিতি করে এই একটু আগে খেয়ে দেয়ে কলেজ গেছে। এমন সময় গায়ে আধময়লা উড়ানী-জড়ান এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলে, "মহাশয়ের নাম কি সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়? মহাশয়ের কি শ্রীমতী মাধুরী নামে এক কন্যা আছেন?" সত্য চমকে উঠলেন, "কে রে, বাবা! পুলিসের লোক না কি!" কোনও রকমে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

"মহাশয়, আমি ঘটক। একটী খুব ভাল বরের সন্ধান এনেছি।"

পুলিসের লোক নয় জেনে সত্য প্রকৃতিস্থ হলেন। চাকরকে হাঁক ছাড়লেন, "ওরে, ব্রাহ্মণের হুঁকোয় তামাক দে ত!" তার পর আস্তে আস্তে ঘটক ঠাকুরকে বললেন, "আমার মেয়ে এখনও ছেলেমানুষ। অন্ততঃ আরও বছর খানেক না গেলে বিয়ে দেব না।"

"তাহলে ত মুস্কিল! তত দিন ত এ সম্বন্ধ হাতে থাকবে না, বাবু!"

সত্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথাকার বর?" ঘটক ঠাকুর মেবারী চারণের মত সুর করে গেয়ে গেল, "চৌধুরীপাড়ার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমীদার ৺রুদ্রনারায়ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র, সিবিলিয়ান, কাঁকুড়গাছির জয়েণ্ট মেজিষ্ট্রেট, রামনারায়ণ চৌধুরী ওরফে R. N. Chowdhury Esq. I. C. S."।

সত্য ভাবলেন, "তাই ত! এমন ঘর, এমন বর, হাত

ছাড়া করা কিছু নয়। আর মেয়েটা একবার মেজিষ্ট্রেটের গৃহিণী হলে পুলিসের হাঙ্গামা সব চুকে যাবে।" কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি একা থাকবেন কি করে!

বাবুকে চিন্তান্বিত দেখে ঘটক বললে, "কি আর ভাবছেন, বাবু! সোনার চাঁদ ছেলে! অনুমতি করুন, কনে দেখিয়ে দিই।"

"আচ্ছা, কাল সকালে এস, মেয়েকে একবার জিজ্ঞাসা করি।" ঘটক নমস্কার করে বিদায় নিলে।

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সত্য মেয়েকে বললেন সম্বন্ধের কথা। মেয়ে মাথা হেট করে রইল, কোনও উত্তর দিলে, না। বাপ আবার বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তাদের আসতে বলি? কি বলিস মা?"

মাধুরী এবার মাথা তুললে। বাপের মুখের পানে সোজা তাকিয়ে বললে, "সভা-সমিতিতে যাই বলে আমাকে জেলে আটকাবার ব্যবস্থা করছ, নয় বাবা?"

বাপ একটু কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলেন, "এত ভাল সম্বন্ধ ত সহজে পাব না, খুকী! তাই ছেড়ে দিতে মন চাইছে না।"

"এই যে তোমাদের এত সাধ ছিল, আমি P. R. S. হব! সে সব ছেড়ে দিলে এক কথায়?"

বাপ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "P. R. S. ত আর তোর দ্বারা হবে না খুকী! তুই যে রকম খদ্দর নিয়ে মেতে উঠেছিস!"

খুকীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, "খদ্দর নিয়ে মেতে ওঠা কি একটা অন্যায় কাজ, বাবা?"

বাপ একটু হেসে উত্তর দিলেন, "সে তোর শ্বশুরবাড়ীর ওরা বুঝবে এখন !"

এতক্ষণে মাধুরীও হাসলে, "তুমি মেয়েকে নিয়ে এলে গেছ, তাই বল না ! বেশ, দাও, কার হাতে তুলে দেবে।"

দু দিন বাদে মিঃ রামনারায়ণ আর তার দাদা ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ কনে দেখতে এলেন। মাধুরী ঠিক দশ এগার বছরের কনেটীর মতন মাথা হেট করে বসে তাঁদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলে। তাঁরা বিদ্যা ও বিনয়ের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। পরদিন ডাক্তার চৌধুরী ঘটককে দিয়ে প্রস্তাব করে পাঠালেন, মেয়ের ইণ্টার পরীক্ষা হয়ে গেলেই তাহলে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক ! মেয়ের বাপ রাজী হলেন।

সেদিন কলেজের পর মাধুরী উমা দেবীর বাড়ী গেল। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললে, "উমাদি, আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হল ত ! এইবার আশীর্ব্বাদ করুন যেন যথারীতি বাঁদীগিরি করতে পারি।"

উমা দেবী মাধুরীর মাথায় হাত রেখে বললেন, "ষাট ! অমন কথা বলতে আছে, বাঁদরী ! আমি আশীর্ব্বাদ করি তোর বাঁদরামি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।"

মাধুরী হেসে ফেললে। মুখে আঁচল দিয়ে বললে, "বেচারা সিবিলিয়ানটীর ওপর একটু দয়া হচ্ছে না, উমাদি !"

বিয়ের সময় মামা মামী এলেন। শম্ভুবাবু ভাগনীকে একান্তে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, বল ত, মা ?"

মাধুরীর চোখ ছলছল করে এল। উত্তর দিলে, "কিছুই না, মামাবাবু। বাবার আদেশ পালন করছি। কিন্তু তাই বলে রামা শ্যামা সকলের হুকুম ত আর শুনতে পারব না! তোমরা আমার ডানা কেটে দিচ্ছ, তা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু আর কেউ ডানায় হাত দিলে—বুঝতেই ত পারছ, মামা! নিজে হাতে বাঁদরী গড়েছ।"

বাসি-বিয়ের দিন শম্ভু জামাইকে কিছু সদুপদেশ দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত মেজিষ্ট্রেট সাহেব কি কখনও গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের উপদেশ শুনতে পারেন! একটু মুরুব্বিয়ানা চালে সাহেব বললেন, "ও কি জানেন! অনেক গড়ে পিটে নিতে হবে।" মামা প্রমাদ গণলেন। বাঁদরীকে গড়ে পিটে নেবে এই সাহেবের অপভ্রংশ!

* * *

রামনারায়ণ বনেদী ঘরের ছেলে বটে। কিন্তু চিরদিন কলকাতায় গরীব ভাবে মেসে থেকে পড়াশুনো করেছে। কলেজের কবছর এক পড়া মুখস্থ ছাড়া আর কোন কাজই করে নেই। খেলাধূলো ত করেই নেই। বোধ হয়, কখন খেলা দেখতেও যায় নেই। থিয়েটার বায়োস্কোপের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। এক কথায়, সে একটী রীতিমত কেতাবের পোকা ছিল।

বি এ পরীক্ষাতে ফাষ্ট হয়ে সেই বছরই সে I. C. S. পরীক্ষা দিলে। অনায়াসে পাস হয়ে গেল। এই পাস হওয়ার পর থেকে

কিন্তু তার চরিত্রের খুব দ্রুত পরিবর্ত্তন হতে লাগল। কোথায় চলে গেল সেই ঝুলঝুলে দাড়ী, উস্কোখুস্কো চুল! কোথায় গেল তার আধ-ময়লা টুইলের কামিজ আর মোটা মিলের ধুতি! বিলেতে ভার্সিটীতে তার কাপড়-চোপড় সাজ-সজ্জা দেখে ইটন্ হ্যারোর ছেলেরাও হিংসায় মরত। তার কলেজের রুমের (কামরার) আসবাব-পত্রেরই কি বহর!

দু বছর পরে যখন সে দেশে ফিরল, তখন তাকে চৌধুরী বাড়ীর রামনারায়ণ বলে চেনবার কোন উপায় ছিল না। দাঁড়াবার, চলবার, হাসবার, কথা কইবার কি অনুপম কায়দা!

এ ব্যাপারটা কতক বাঁধা-গরু ছাড়া পাওয়ার ফল, আর কতক উত্তরাধিকারীর সূত্রে প্রাপ্ত বনেদী মেজাজেরই রূপান্তর। যাই হোক, রামনারায়ণের এই পরিবর্ত্তন তার আত্মীয়স্বজনকে বড় কষ্ট দিয়েছিল। সব চেয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন তার মা শিবানী দেবী। তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ ছিলেন। ছেলেবেলায় বনেদী চালের চূড়ান্ত দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বড় হৃদয় না হলে বড়লোক হয় না। তাই যখন দেখলেন যে তাঁর হাকীম ছেলে বিলেত থেকে শিখে এসেছে শুধু একটা নির্লজ্জ হৃদয়হীন বাবুগিরি, তখন তাঁর মাথা লজ্জায় হেট হয়ে গেল।

যে দাদা প্রাণপণ খেটে এত বছর ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ জুগিয়ে এসেছেন, সেই দাদাকেও রামনারায়ণ যথাযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধা দিতে পারত না। পাড়াগেঁয়ে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বই ত নয়!

বৌদিদি সাবিত্রী দেবীকে ত কতকটা কৃপাচক্ষেই দেখত! বিলেতী মেমসাহেবদের বিদ্যা বুদ্ধির নানা গল্প বলে তাঁকে খাটো করে দিয়ে দেবর একটা রীতিমত আনন্দ পেত।

শিবানী দেবী দুচার বার এই ব্যাপার দেখে একদিন বড ছেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে পরামর্শ করলেন। ফলে দুজনারই মত এই হল যে দেখে শুনে একটী মানুষের মতন বৌ ঘরে আনলে হয়ত রামনারায়ণের চরিত্রের উন্নতি হবে। শিবানী পাকা গিন্নী হলেও চিরদিন স্পষ্ট কথা কয়ে এসেছেন। ছোট ছেলেকে ডেকে তাঁর মতামত খুলে বললেন। ছেলে মাকে বেশ একটু ভয় করত, কেন না মনে মনে ঠিক জানত যে এই গম্ভীর-প্রকৃতি স্বল্পভাষিণী বিধবা কোন দিন এতটুকু হেনস্তা বরদাস্ত করবে না। তাই সে বিনা আপত্তিতে বিয়ে করতে রাজী হল।

ছমাস ধরে সারা বঙ্গদেশ উলট পালট করে শেষ মাধুরীকে পছন্দ করলে। মাধুরীর মুখখানি বেশ লাগল বটে। কিন্তু তাকে পছন্দ করবার প্রধান কারণ এই যে গরীবের ঘরের মেয়ে, অবাধ্য হবে না। আমাদের চৌধুরীর মতন সাহেবদের এই একটা বিশেষত্ব। মুখে খুব বিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দী করেন, কিন্তু পরিবারটী হওয়া চাই পঞ্চদশ শতাব্দীর। বাহিরে নয়, অন্তরে। পুতুলটীর মতন সেজেগুজে সাহেবের সঙ্গে খানা খেতে যাবে, চা-পার্টিতে যাবে, মোটারে বেড়াতে যাবে, কিন্তু বিনা অনুমতিতে মুখটী খুলবে না। বাসি-বিয়ের দিন মামা সাবধান করে দিতে গেলেন বটে, কিন্তু জামাই মনে মনে বললে, "Tommy Rot!"

রামনারায়ণকে আমাদের বাঙ্গালী হিসেবে সুপুরুষ বলা চলে। অর্থাৎ রঙ্গটা বেশ ফরসা। তবে অতিরিক্ত বিদ্যাভ্যাসের ফলে কুঁজো হয়ে গেছে, একটু টাক পড়েছে, আর চোখে দুটো খরতালের মতন চশমা পরতে হয়েছে। ধরণ-ধারণও কেমন যেন বুড়টে! বাঁদরী ফিলসফী পড়ে নেই বটে, কিন্তু তার রসবোধ যথেষ্ট ছিল। প্রথম দর্শনেই সে স্বামী-সম্বন্ধে বেশ একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিয়েছিল। বুঝেছিল যে লোকটা বেরসিক।

কলকাতায় ফুলশয্যার রাত্রেই রামনারায়ণ স্ত্রীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মস্ত লেকচার দিলে। বুঝিয়ে দিলে যে সিবিলিয়ানের পরিবারের ইজ্জৎও যত, দায়িত্বও তত। তার কাঁকুড়গাছির কুঠী, আসবাব-পত্র, ঘোড়া-গাড়ী, বেয়ারা-খানসামা, চাপরাসী-কনেষ্টবল ইত্যাদির একটা জ্বলন্ত চিত্র এঁকে স্ত্রীর সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "পারবে ত, ডার্লিং, এ সব চালাতে?"

মাধুরী মুখে আঁচল দিয়ে ভয়ানক হাসতে লাগল। স্বামী একটু বিরক্ত হয়ে বললে, "এ হাসির বিষয় নয়। সেখানে সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে করে নেবে, তাহলেই ভুল-চুক হবে না। বুঝলে? দেখো, ঢলিও না যেন!"

স্ত্রী তখনও হাসছে। আস্তে আস্তে বললে, "আমি এখন তোমার সঙ্গে যাব না, মনে করছি। আরও দুবছর পরে বি এ পরীক্ষাটা দিয়ে তার পর মেমসাহেব হব। কি বল?"

"আমি তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারব কেন, মাধুরী ?"

"তা না পার, মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে আমাকে দেখে যেও। কিন্তু এরই মধ্যে আমি হাকীম-গিন্নী হতে পারব না। সব গুলিয়ে ফেলব। তা ছাড়া, আমার এক সেবিকা-সঙ্ঘ আছে, তার সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে। সে সব কে করবে ?"

"সেবিকা-সঙ্ঘের কাজ তুমি করবে! তুমি যে সিবিলিয়ানের স্ত্রী! আমার চাকরীর দফা রফা করবে, দেখছি।"

"আমি দেশের কাজ করলে, তোমার চাকরী যাবে কেন? তুমি গবর্ণমেণ্টকে বোলো যে আমার উপর তোমার কোন হাত নেই।"

"আমার হাত আছে কি না দেখবে? তোমাকে কথাই কইতে দেব না"—বলে রামনারায়ণ স্ত্রীকে সজোরে বুকে চেপে ধরে, তার মুখ বন্ধ করে দিলে। মাধুরীর বড় ভাল লাগল। আপন হতে কেমন চোখ বুজে এল। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "ওগো, তবে একটা কথা শোন। তোমাকে এখনই বলা উচিত। আমাদের, কি জান, যাকে বলে একটা গুপ্ত-সমিতি আছে। কেউ জানতে পারলে তোমার চাকরীর গোল হবে না ত!"

হাকীম সাহেব এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন, "গুপ্ত-সমিতি! কোথায়? কে কে তার মেম্বর?"

মাধুরী হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, "সে সব কিছুই বলব না। তবে তোমার বেশী ভয় হয়ে থাকে ত আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।"

স্বামী গম্ভীর ভাবে বললেন, “নিয়ে যেতেই হবে। তোমাকে আর একটী দিনও কলকাতায় রাখছি না। কিন্তু এ সব কথা কাউকে বোলো না, খবরদার!”

মাধুরী তখনও হাসছে, “আচ্ছা, যদি আমি কাঁকুড়গাছিতে খদ্দর preach, প্রচার, করি!”

“তুমি একটী আস্ত পাগলী।”

“পাগলী নয় গো, পাগলী নয়। আমার ইস্কুল কলেজের নাম বাঁদরী, তা তুমি জান না!”

“Oh! you dear little monkey!” বলে সাহেব পরিবারের গাল টিপে আদর করলেন।

চৌধুরী-পাড়ার ভাঙ্গা জমীদার বাড়ী মাধুরীর বড় ভাল লাগল। তার চেয়েও ভাল লাগল সেই বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। কি সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, কি মায়া মমতায় ভরা চোখ! মাধুরীর মন গলে গেল। এই ত আমি মা পেয়েছি, আর আমার কিসের ভাবনা! “এস, আমার ঘরের লক্ষ্মী এস!” বলে শিবানী দেবী বৌকে চুমু খেয়ে ঘরে তুললেন।

রাত্রিবেলা মাধুরী স্বামীকে বললে, “কত বাঁদরামি করব, মনে করে এসেছিলাম! কিন্তু আর কিছুই পারব না। দেখবে, কেমন লক্ষ্মী কনেবৌটীর মতন থাকি!”

“এখানে আর থাকা হচ্ছে কই! সোমবারেই ত আমরা কাঁকুড়গাছি যাচ্ছি।”

“তুমি যাও। আমার মাকে ছেড়ে যেতে মন সরছে না। এখানে ত আর খদ্দর প্রচারের ভয় নেই গো!”

"দেখ মাধুরী, আমি যত শীঘ্র সম্ভব তোমার শিক্ষা আরম্ভ করে দিতে চাই। আর সময় নষ্ট করে কি হবে?"

"তুমি আবার আমাকে কি শেখাবে! বরং, আমি বলি, তুমিও ছুটি নিয়ে দিন কতক মায়ের কাছে থাক, অনেক কিছু শিখবে।"

"By jove! কোথায়, এখানে? এই ভাঙ্গা বাড়ী, এঁদো পুকুর, মেলেরিয়া, এর মাঝে দু দিন টিকতে পারব না! আর তোমাদের এই বাঙ্গলা খাওয়া—পুঃ!"

"আমি যে এদিকে তোমার আনকোরা সাহেবী বাঙ্গলোতে টিকতে পারব না, তার কি? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এমন মায়ের ছেলে হয়ে পৈতী সাহেবী কর কি করে?"

স্বামী উপহাস করলেন, "সে তুমি ইণ্টারমিডিয়েটের বিদ্যা নিয়ে বুঝতে পারবে না।"

"আচ্ছা, তুমি ঘুমোও। আমি কাল মাকেই জিজ্ঞাসা করব এখন।"

একটা কি রকম ঘোঁক্ আওয়াজ করে সাহেব পেছন ফিরে শুলেন। বাঁদরী হেসে উঠল।

পরদিন সকালে শিবানী দুই বৌকে কাছে বসিয়ে সংসার-সম্বন্ধে কত কি উপদেশ দিলেন। বেশ করে বোঝালেন যে হিন্দুর ঘরের গিন্নী সর্ব্বদা আপন মান বাঁচিয়ে চলবে, কখনও নিজেকে খেলো করবে না। স্বামীর কাছেও না। এই তার কর্ত্তব্য। চৌধুরী বংশের পূর্ব্ব গৌরবের কথা সব নূতন বৌকে বললেন,

"পয়সা-কড়ি ত সবই গেছে, মা! কিন্তু এ বংশের কেউ কোন দিন মান ইজ্জৎ খোয়ায় নেই, এই আমাদের মস্ত গৌরব।"

দুপুর বেলা শাশুড়ীর চরণসেবা করতে করতে মাধুরী হঠাৎ তাঁর পায়ে মাথা রেখে বললে, "মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, অপরাধ নেবেন না। আমি ওঁর অনুমতি নিয়েছি। আমার বড় আশ্চর্য্য লাগছে, যে উনি আপনাদের ঘরের ছেলে হয়ে এমন হলেন কি করে!"

শিবানী বুঝলেন যে বৌ বুদ্ধিমতী, এরই মধ্যে অনেক কথা আন্দাজ করেছে। হাসতে হাসতে বললেন, "ও কিছু নয়, মা! বিলেত গিয়ে, বড় চাকরী পেয়ে, একটু সাহেবী মেজাজ হয়েছে। তুই শক্ত হলেই দুদিনে সেরে যাবে।"

সেদিন রাত্রে মাধুরীর শুতে যেতে অনেক দেরী হল। শাশুড়ীকে খাওয়াতে-দাওয়াতে প্রায় এগারটা বাজল। স্বামী ততক্ষণে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন, "তুমি খুব আড্ডা দিতে ভালবাস, না! এত রাত পর্য্যন্ত গল্প চলছিল বুঝি!"

মাধুরী উত্তর দিলে, "আড্ডা দিতে খুবই ভালবাসি। তবে আজ দেরী হল মাকে খাওয়াতে-শোওয়াতে।"

"কেন, সে সব ত বৌদি করেন!"

"এতদিন ত আমি ছিলাম না। তাই, তিনি একা করতেন। কেন গো, হাকীমের মেমসাহেবের এ সব করতে নেই না কি!"

রামনারায়ণ খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তাঁর ছেলে পৈতী সাহেব হল কি করে?"

"হ্যাঁ, করেছিলাম। তিনি কি জবাব দিলেন, তা বলব না।"

"তুমি কি জান, মাধুরী, যে আমাকে দুরস্ত করবার জন্য এরা ঘরে বৌ এনেছেন? আমি কিন্তু কারও শিক্ষা নেওয়ার পাত্র নই।"

"বেশ গো বেশ, তুমি নিও না! এখন ঘুমোও দেখি, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

"মাথায় হাত বুলোতে হবে না। তুমি আমার কাছে এস।"

ভোরবেলা উঠে যাওয়ার সময় মাধুরী স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "তোমার ভয় নেই, সাহেব! আমি তোমার সঙ্গে সোম-বারে যাব।"

বৌ ছেলের সঙ্গে কাঁকুড়গাছি যাচ্ছে, শুনে শিবানী আশ্বস্ত হলেন। বড় ছেলেকে হেসে বললেন, "বেটীর ভারী বুদ্ধি! রামকে ও ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে। তবে মেজাজও খুব। রাগারাগি করে পালিয়ে না আসে!"

কাঁকুড়গাছিতে মাধুরী সুখে ছমাস স্বামীর ঘর করছে। সুখেই বলতে হবে, কেন না দিনের পর দিন বেশ একটা রঙীন নেশার মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে। সাহেবী-জীবনের নিত্য করণীয় কাজ-গুলো সে দিনগত পাপ ক্ষয় হিসেবে করে চলেছে। সে গুলো যাচিয়ে দেখবার ফুরসৎ বা প্রবৃত্তি তার নেই। নেটীবের প্রাপ্য ছোট ছোট অপমান হেনস্তা আছেই। তবে মাধুরী সেগুলো ধরতে পারে না, তার স্বামী সেগুলো গায়ে মাখে না।

মোটের উপর মাধুরী বেশ খুশী আছে। শাশুড়ীকে সেদিন লিখেছে, "উনি বেশ ভাল আছেন, মা। বাড়ীতে অনেকটা সময় কাটান। দুজনে মাঝে মাঝে সাহেবদের ক্লাবে যাই। তারা আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করে। আর কয়েকদিন পরে আমরা তাঁবুতে ঘুরতে বেরোব। তখন, বোধ হয়, আরও ভাল লাগবে। গ্রামের গরীব দুঃখীদের জন্য কিছু হোমিওপেথিক ঔষধ সঙ্গে নিয়ে যাব, ইত্যাদি।"

দুচার দিনে শাশুড়ীর উত্তর এল, "তোমার উপর আমার অনেক ভরসা, বৌমা! কাঁকুড়গাছির ইঞ্জিনিয়ার বাবুর স্ত্রী সে দিন এসেছিলেন। এই গ্রামে তাঁর মামার বাড়ী। তিনি তোমার অনেক প্রশংসা করলেন। বললেন, যে তোমার জন্য আমার রামেরও এখন সুখ্যাতি হয়েছে। বেঁচে থাক, মা! তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হোক। এইবার আমি নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাসে যেতে পারব। আমার যাওয়ার সব ঠিক। কর্ত্তার আমলের ছোট বাড়ীখানি ত আছে! তোমার ভাসুর আমার খরচার ব্যবস্থাও করেছেন।"

রামনারায়ণ চিঠিখানা পড়ে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "মাধুরী! সুখ্যাতি ত খুব অর্জ্জন করছ, কিন্তু সেদিন আমার মেজিষ্ট্রেট বলছিলেন—দেখ, তোমার স্ত্রী শহরের মেয়েদের সঙ্গে বড় বেশী মেলা-মেশা করেন।"

মাধুরী লাফিয়ে উঠল, "বেশ করব, আমার যার সঙ্গে ইচ্ছা মিশব! ও পোড়ারমুখোর কি?"

"তা বললে ত চলবে না, ডার্লিং। নিজেদেরও একটা ইজ্জৎ ত আছে!"

"ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া-আসা করলে ইজ্জৎ যায় না কি? আমি ত আর তোমার কোম্পানীর মাইনে-করা চাকর নই!"

পরদিন বিকেলবেলা মাধুরী সামনের বারান্দায় বসে ডেপুটী-গিন্নি ও আর দুজন মহিলার সঙ্গে গ্রাবু খেলছে, এমন সময় মেজিষ্ট্রেট সাহেবের মেম এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে গিন্নীরা সব পলায়ন দিলেন পেছনের বারান্দায়। মেমসাহেব উঠে এসে মাধুরীর হাত ধরে এক ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে ক্লাবে নিয়ে যেতে এসেছি, মিসেস্ চৌধুরী। তুমি অনেকদিন যাও নেই। আচ্ছা, তুমি এই সব অশিক্ষিত অলস পর্দ্দা-মেয়েদের নিয়ে এত সময় কাটাও কি করে?"

"আজ আমাকে মাপ করতে হবে! এঁদের ফেলে ক্লাবে কি করে যাব! তবে আমি বুঝি না, আপনি আমার বন্ধুদের কুঁড়ে, মূর্খ, কি হিসেবে বলেন! ওঁরা ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে কোন রকমে খাটো নন।"

"My dear girl, বিরক্ত হয়ো না। তোমাদের ভালর জন্যই বলছি। তোমার স্বামীই কতবার হ্যারীকে বলেছেন, যে তিনি কিছুতেই এই সব স্ত্রীলোকদের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করতে পারছেন না। মিষ্টার চৌধুরী চমৎকার লোক!"

মাধুরী তখন রাগে গরগর করছে। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "গুড নাইট, আপনার ব্রিজের দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

চৌধুরী সাহেব সেদিন ক্লাব থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে মাধুরী অন্তর্দ্ধান,অনেকদিন পরে আবার বাঁদরীর আবির্ভাব হয়েছে। সে স্বামীকে দেখে গর্জ্জে উঠল, "তুমি তোমার মেজিষ্ট্রেটকে এই সব কথা বলেছ?"

স্বামী আমতা আমতা করতে লাগলেন। মাধুরী আবার বললে, "সাহেবদিকে খুশী করার জন্য তুমি নিজের দেশের মেয়েদের অপমান কর! এত, এত ছোট তোমার মন! আমি কোথায় স্বপ্ন দেখছিলাম যে ধীরে ধীরে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে! তা নয়! তুমি আমাকে ঠকাচ্ছিলে এত দিন! ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার, আমি কালই মায়ের কাছে চলে যাব। আমাকে নিয়ে মেজিষ্ট্রেটের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা কর তুমি!"

"আঃ চট কেন, মাধুরী? তোমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে পারি আমি! আমি সব কথা বুঝিয়ে বললেই—"

"না, আমি কোন কথা শুনব না। আমি বুঝতে চাই না! আমি চলে যাব, ঠিক করেছি।"

"আচ্ছা, তা যেও। কিন্তু দুদিন সবুর কর। আমি ছুটি নিচ্ছি, একসঙ্গে যাব। এই নিয়ে হাটের মাঝে হাঁড়ী ভেঙ্গে লাভ কি?"

মাধুরী শুধু বললে "তাই ভাল।"

হপ্তাখানেক পরে দুজনে চৌধুরী পাড়ায় পৌছল। মাধুরী গাড়ী থেকে নেমে, ছুটে শাশুড়ীর কাছে গেল। তাঁর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। শিবানী শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "কি হয়েছে, মা? ওঠ, ওঠ, আমাকে বল কি হয়েছে!"

মাধুরী মাথা না তুলেই বললে, "মা, আমি পারলাম না আমার কর্ত্তব্য করতে। আমাকে তুমি কাশী নিয়ে চল।"

শিবানী বৌয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "শান্ত হও, মা। অত অধীর হলে চলে কি!" সাবিত্রীকে ডেকে বললেন, "বড় বৌমা, মাধুরীকে নিয়ে যাও ত! মুখে হাতে জল দিয়ে একটু শুয়ে পড়ুক। বড় শ্রান্ত হয়েছে।"

শোবার ঘরে গিয়ে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, ছোট বৌ? আমাকে বল, লক্ষ্মীটী!"

মাধুরী মুখ ঢেকে বললে, "দিদি, বড অপমান বোধ হচ্ছে। এই ছমাস সব ভুলে ছিলাম। যেন স্বপনের মতন আমার দিনগুলো চলে যাচ্ছিল! তোমার দেওর যে আমাকে বোকা পেয়ে ঠকাচ্ছিলেন, তা বুঝতে পারি নেই। আমাকে নিয়ে সাহেব মেমেদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা!"

"ছোট বৌ, পুরুষেরা অমন কত করে! ঐ নিয়ে মন খারাপ করিস না। ওর চেয়ে ঢের বিশ্রী জিনিস আমাকে একদিন সইতে হয়েছে। মেয়েমানুষের মুখ বুজে সওয়া ছাড়া উপায় কি!"

"ভাই দিদি, তুমি সাবিত্রী, তাই সইতে পেরেছ। আমার সে সাধ্য নেই।"

সন্ধ্যাবেলা শিবানী ছোট ছেলেকে কাছে ডেকে খুব কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাম, তুই আমার বৌমাকে কি করেছিস? মা-মরা মেয়ে, ছেলেমানুষ, ওর মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে!"

"মা, তোমার বৌ বদমেজাজী, স্বামীর অবাধ্য। আমি ওকে অনেক চেষ্টা করেও শোধরাতে পারলাম না। হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

"তোর কোন দোষ নেই, বলতে চাস?"

"দোষ কার নেই, মা? সংসারে থাকতে হলেই অনেক দোষ করতে হয়। কিন্তু আমি ওর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহারই করি নেই।"

"বৌমা আমার সঙ্গে কাশী চলে যেতে চাইছে। কি বলব ওকে?"

"কিছুই বোলো না। কাল সকাল নাগাদ ওর মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রামনারায়ণের মেজাজ মোটে ভাল ছিল না। এই রকম একটা hysteric, বায়ুগ্রস্ত, মেয়েকে নিয়ে তার জীবন কাটাতে হবে! বড় অফিসারের কি করতে হয়, না করতে হয়, তা ঐটুকু মেয়ে কি বুঝবে। অথচ নিজেকে মনে করে সব-জানতা! মা বৌদি সবাই আবার ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছে!

খেতে বসে হঠাৎ একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে সাহেবের মাথা একেবারে গরম হয়ে উঠল। সাবিত্রী বসে তাঁকে খাওয়াচ্ছিল। মাধুরী তার পেছনে চুপটী করে বসেছিল। সাহেব গর্জ্জে উঠলেন,

"বৌদি, এই সব মশলা দেওয়া বাঙ্গলা খাবারগুলো খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলবে না কি তোমরা!"

সাবিত্রী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "তোমার সাহেবীর জ্বালায় যে গেলাম, ঠাকুরপো! ভাত, সুক্ত, ঝোল, দাল খেয়ে না কি আবার অসুখ করে!"

"তোমরা কেবল আমার সাহেবীই দেখছ! আচ্ছা, বেশ, আমি সাহেব। তা,আমি যা খেতে চাই, তাই বা পাব না কেন?"

"আচ্ছা ভাই, কাল থেকে তোমাকে সিদ্ধ পোড়াই রেঁধে দেব।"

মাধুরী খুব ধীরে ধীরে বললে, "আজকের মতন দিদি যা দিয়েছে, তাই খাও না! হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন?"

সাহেব মাধুরীর টিপ্পনী বরদাস্ত করতে পারলে না। "এ সব ছাই ভস্ম খাওয়া আমার সাধ্য নয়। লঙ্কার ঝালে মুখ পুড়ে গেল!" বলে রেগে উঠে পড়ল।

সাবিত্রী কত বললে, "ঘরে মিষ্টি করেছি, ঠাকুরপো, একটা খেয়ে যাও!" কিন্তু দেবর কোন উত্তর না দিয়ে গট্‌গট্‌ করে বার-বাড়ী চলে গেল।

সাবিত্রীর চোখ ছল ছল করে উঠল, দেখে মাধুরী বললে, "ছি, দিদি! তুমি এই সামান্য কথা নিয়ে দুঃখ কোরো না। নাই বা খেলেন সাহেব! নিজেরই পেট জ্বলবে।"

দিদি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "তোকে ত সেই বিদেশে রোজ এই সহ্য করতে হয়, ছোট বৌ!"

"তা করতে হয় নেই, দিদি। তবে প্রাণে ভয় ঢুকেছে, এইবার হয়ত করতে হবে। তাই ত পালাবার মতলবে আছি।"

"ছি, ও কথা কি বলতে আছে, বোন!"

সে রাত্রি মাধুরী শাশুড়ীর কাছে শুয়ে রইল। সকালবেলা তার ডাক পড়ল হাকীমের এজলাসে। মেজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হল না তোমার!"

আসামী এক কথায় উত্তর দিলে, "না।"

"আমি কাল চাকরীস্থানে ফিরে যাচ্ছি। তুমিও আসছ ত!"

"আসব, যদি তুমি কালকের ব্যবহারের জন্য দিদির কাছে মাপ চাও। আমি বাঁদরী, বাঁদরামি করি। তুমি হাকীম, মেজাজ ঠিক রাখতে জান না কেন!"

"সে কৈফিয়ৎ ত আর আমি তোমার কাছে দিতে যাব না!"

"তা দিও না। কেন দেবে! তবে কি জান, আমিও একেলে মেয়ে। তুমি যদি কৈফিয়ৎ না দাও, আমিই বা কেন দেব?"

"তোমার মতে স্বামীর আজ্ঞা শোনার দরকার নেই?"

"আজ্ঞা! আজ্ঞা কিসের! আমি ত তোমার বাঁদী নই। আমি চিরদিন আছি বাঁদরী। মাস ছয়েক আমাকে তুমি কি রকম জাদু করেছিলে। কিন্তু সে জাদুর জোর রাখতে পারলে কই! আমি আসি তাহলে? আজ রাত্রেই মা কাশী যাচ্ছেন। আমাকে একটু স্থান দেবেন বলেছেন।" ছোট্ট একটী নমস্কার করে বাঁদরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাবিত্রী লক্ষ্মীনারায়ণকে সব কথা জানিয়ে ধরলে, "ওগো! তুমি একবার ছোট বাবুকে বল না, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাধুরীর কাশী যাওয়াটা বন্ধ করুন।"

লক্ষ্মীনারায়ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার সাহেবকে কিছু বলার সাহস নেই। তুমি পারলে না বৌমাকে বোঝাতে?"

"বলেছিলাম। আমাকে জবাব দিলে—দিদি, জান ত বাঁদরীর স্বভাব! মুখ খেঁচালে উল্টে মুখ ভেঙ্গায়। জগতে সবাই কি আর সাবিত্রী হতে পারে!" ডাক্তার চুপ করে গেলেন।

সেই রাত্রে শিবানী দেবী মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কাশী রওয়ানা হলেন। আর কি ফিরবে না মাধুরী? কে বলতে পারে!

প্রাক্তন

মন্মথ যে বাপের ছেলে, তার সংসারে একটা কেউ-কেটা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রাক্তনকে ত আর এড়ান যায় না! বাপ একজন কৃতী পুরুষ, আর ছেলেটা হল কি না—জানতেই পারবেন ক্রমশঃ।

বাপের নাম প্রমথবাবু—ডাক্তার পি, এন, রে। আজ তিনি শহরের একজন নামজাদা বড়লোক। তাঁর গাড়ী, তাঁর বাড়ী, তাঁর ডিনার পার্টি, সকলের হিংসার জিনিস। চিকিৎসায় তিনি ধন্বন্তরি। অন্ততঃ fashionable circlesএ, অতি-সভ্য সমাজে, তাঁর এই খ্যাতি। গরীব দুঃখী ত আর তাঁকে কোন দিন চোখে দেখে নেই! সাহেব কখন কোন হাঁসপাতালে বেরোন নেই। কেউ বললে জবাব দেন, "আমার ত আর মোড়লী করে পসার জমাতে হবে না। যারা খেতে পায় না, তারা দালালী করুক গে।"

কি উপায়ে ধীরে ধীরে ডাক্তার সাহেব চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেন থেকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সেখান থেকে ভবানীপুর বেলতলা রোড, তার পর বালীগঞ্জ ফার্ণ রোড, আর সব শেষ কেমেক ষ্ট্রীটে চড়ে এসেছেন, তা কলকাতার কে না জানে! তবে, এই ধারাবাহিক উন্নতির পথে মাঝে মাঝে যে সব অন্ধকার স্থান আছে, সে গুলোর কথাও নিন্দুক লোকে কানাঘুসো করতে ছাড়ে না।

মন্মথর মা স্বামীর এই ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন নেই। তাঁর চালচলন, সাজ-পোষাক, সবই ছিল সেকেলে। মনটা ছিল ততোধিক সেকেলে। তাঁর পদ-স্খলন অবশ্যম্ভাবী। ভবানীপুরে বাস করতে এসে প্রমথবাবুর সস্ত্রীক চা-পার্টিতে যাওয়ার প্রসঙ্গ প্রথম উপস্থিত হল। স্ত্রীকে আদেশ করতেই তিনি বেশ প্রসাধন করে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হায়! যেমন বেশ, তেমনি প্রসাধন! গায়ে চায়না কোটের মতন এক জামা, পরনে খড়খড়ে গরদের সাড়ী, পায়ে সাদা কেম্বিসের কেড্ জুতো, এ পরে কি আর সাহেব-সুবোর বাড়ী চা খাওয়া চলে! সস্ত্রীক সমাজ-পরিভ্রমণ ব্যাপারটা মোটে জমল না। তখন দুজনে মিলে একটা কাজ-চলা গোছ রফা করে ফেললেন। তাঁদের মেয়ে নীলাবতী তখন তেরো চোদ্দ বছরের হয়েছে, লোরেটো ইস্কুলে ওপর কেলাসে পড়ে, ইংরেজী ফড় ফড় করে বলতে পারে। বাপ মায়ে স্থির হল যে বছর খানেক, বছর দুই, তাকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব সোসায়টীতে বেরোবেন, গিন্নী চুপ-চাপ বাড়ী বসে থাকবেন। বছর দুই তিন এই ভাবে বেশ কাটল। মেয়ে সঙ্গে থাকাতে সাহেবের সর্ব্বত্র, অর্থাৎ মেয়ে মহলেও, নিমন্ত্রণ জুটতে লাগল। তার পর নীলার বিয়ে হল, তাকে তার শ্বশুর শাশুড়ী ঘর করতে নিয়ে গেলেন বাঁকীপুরে। বাপের অবস্থা যে কে সেই হয়ে গেল। সভ্য সমাজে প্রবেশের পথে আবার একটু বাধা পড়ল।

কিন্তু প্রমথনাথ কি বাধা-বিঘ্ন মানবার মানুষ! বিলেত চলে

গেলেন। সেখানে বছর দুই কাটিয়ে বিবিধ খেতাব সংগ্রহ করে এনে, ব্যবসায়ের রীতিমত ফেলাও করে বসলেন। ক্রমে নিজেই একজন মস্ত বড় সাহেব হয়ে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল সভ্যসমাজে। বালিগঞ্জ ফার্ণ রোডে ডাক্তার সাহেব এক বাগান বাড়ী করলেন। সেখানে শনিবারে রবিবারে তিনিও খুব পার্টি দিতে লাগলেন। অবশ্য, গিন্নী এ সবের বাহিরেই রইলেন। তিনি ছেলেটীকে নিয়ে চুপ চাপ ভবানীপুরে দিন কাটাতেন। কিছুকাল পরে আর এ ব্যবস্থাতেও শানল না। ডাক্তার বেশীর ভাগ সময় বালিগঞ্জেই কাটাতে আরম্ভ করলেন। কচিৎ কখন বেলতলার বাড়ীতে রাত্রিবাস করতেন।

এই সময় স্বামী-স্ত্রীতে আবার একটা নূতন রফা হল। রফার সব সর্ত্ত জানা যায় না। তবে, তার ফলে গিন্নী খোকাকে নিয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পুরানো বাড়ীতে থাকতে চলে গেলেন, আর সাহেব তল্পীতল্পা বেঁধে উঠে গেলেন ফার্ণ রোডে। ভবানীপুরের বাড়ীখানা বিক্রী হয়ে গেল। খোকা মন্মথ তখন আট বছরের।

ছেলে কি তার মা কখনও ফার্ণ রোডে যান নেই। ডাক্তার সাহেব মাঝে মাঝে রবিবারটা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে কাটাতেন। ছেলে বেলায় মন্মথ মাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, "বাবা আলাদা বাড়ীতে থাকেন কেন, মা?" মায়ের বাঁধা জবাব ছিল "ওঁর ডাক্তারখানা ঐ দিকে। কাজকর্ম্মও সব ঐ দিকে, এখানে থাকলে চলবে কেন? আর, কি জানিস, বাবা, ওঁর সাহেবী

ধরণে খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস কি না, সাহেব পাড়াতেই থাকা সুবিধা। তোর মায়ের জবড়জঙ্গ ভাব ত কখন গেল না!”

এ জবাবে মন্মথ সন্তুষ্ট হত কি না, জানি না। তবে একটু বড় হয়ে অবধি আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। করবার বোধ হয় দরকারও আর নেই। ইস্কুল কলেজে বাপ সম্বন্ধে কত কথাই কানে এসেছে। সচরাচর সে সব কথা সে শুনেও শোনে না। তবে দুই একবার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারে নেই, নিন্দুকদের ধরে খুব পিটিয়ে দিয়েছিল। ইদানীং আর পিটিয়ে দেওয়ারও উৎসাহ নেই। কেমন যেন কানে কড়া পড়ে গেছে!

মন্মথ পড়া শুনোতে বেশ ভাল। মেট্রিক, ইণ্টার, দুটোই ফার্ষ্ট ডিবিসনে পাস হয়েছে। মেট্রিকে জলপানিও পেয়েছিল। শরীর চর্চ্চার খুব ঝোঁক। বাড়ীতে কসরৎ বরাবরই করে। বাপ ছোট্ট বেলায় আরম্ভ করিয়ে দিয়েছিলেন। বড় হয়ে শীলের কাছে ঘুষো খেলা শিখেছে। গোবর বাবুর আখড়ায় কমাস যাতায়াত করে দু পাঁচটা কুস্তির পেঁচও রপ্ত করেছে। তবে ছেলেটী কুনো স্বভাব। সম-বয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চায় না বলে ফুটবল, ক্রিকেট তার কখন খেলা হয় নেই। সভা সমিতিতে ত যায়ই না, কারণ বাপের এ বিষয়ে কড়া তাকীদ দেওয়া আছে।

এ দিকে ত বাপ ছেলের উপর খুশী! কিন্তু তাঁর বড় দুঃখ যে ছেলেটা অজ-নেটীব। দিবারাত্র ধুতি চটী পরে বেড়ানই বা কেন, যখন আজ বাদে কাল বিলেত গিয়ে সিবিলিয়ান হয়ে আসবে! বাপ সাহেবী কাপড় পরার কথা বললে মন্মথ কিছু

জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে। কিন্তু মাকে অনেকবার বলেছে, "তুমি বাবাকে এই বেলা থেকে বুঝিয়ে বল, যে আমি বিলেত যাব না। কিছুতেই যাব না। সিবিল সার্ব্বিস কি কোন সার্ব্বিসেই আমার ঢোকবার ইচ্ছা নেই।"

মা যদি জিজ্ঞাসা করেন, "তুই তাহলে করবি কি? বাবু জিজ্ঞেস করলে কি বলব?" ছেলে উত্তর দেয়, "বোলো, এখনও ত বি, এ পাস করি নেই, ও সব ভাববার ঢের সময় আছে।"

মন্মথকে দেখলে সেই মান্ধাতার আমলের গরীব ছাত্র বলে মনে হত। মোটা খাটো ধুতি, আধ-ময়লা টুইলের কামিজ, মাথার চুল কদমফুল ছাঁট, গালে জুলজুলে দাড়ী। সাজ ত এই রকম, কিন্তু খদ্দর কখন পরে না। বলে, "খদ্দর যে কেন পরা উচিত, তাই বুঝি না। তোমরা ত আর সভা সমিতিতে যেতে দেবে না, বুঝব কেমন করে!"

একদিন মা বললেন, "হাঁারে, তুই কি এখনও কচি খোকাটী আছিস, যে আটহাতি ধুতি পরিস? একটু মিহি বড় কাপড় পরলেও ত হয়! আর আজকাল ছেলেরা কত রঙ্গ বেরঙ্গের পিরান পরে, তুই-ই বা অমন একটা বে-ঢপ কামিজ পরে বেড়াস কেন? চুলগুলোকেও এমন মুদী-মালার মতন করে কাটিস!"

ছেলে হেসে জবাব দিলে, "মুদীরা বুঝি এই রকম চুল কাটে! একদিন জানালা হতে নজর করে দেখো না, আমাদের সামনের দোকানের মুদীর কি রকম চুলের কেয়ারী! আর ধুতি পিরানের

কথা নিয়ে আমাকে বকলে কি হবে! যেমন মা, তার তেমনি ছেলে। আমি ত আর সাহেব পাড়ায় থাকি না, মা!"

বাপ তখন কেমেক ষ্ট্রীটে থাকেন। ফার্ণ রোডে ছুটি-ছাটায় হাওয়া খেতে যান। মা ছেলের কথা শুনে মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন, "ছি, মন্মথ! ও সব কথা বলতে নেই। তাঁর যেখানে খুশী, সেখানে থাকবেন। তোর সবটাই বাড়াবাড়ি। যেমন মা তেমনি ছেলে, কথাটার মানে কি? ওঁর মান তোকে রাখতে হবে না?"

"না মা, রাখতে হবে না। তুমি কি জান না যে ওঁর মান রাখা আমার সাধ্য নয়। শুধু বাবুগিরি কাপড় পরলেই ত আর সেটা হবে না। সহরসুদ্ধ লোকের পিটিয়ে মুখ ভেঙ্গে না দিলে ওঁর নিন্দা বন্ধ হবে কি করে? চল মা, আমরা আর কোথাও গিয়ে থাকি। তুই ত মাঝে মাঝে বলিস যে কাশীবাস করবি। তাই চল, মা। আমি সেখানে কলেজে পড়ব।"

মা ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "কি যে পাগলের মত বলিস, তার ঠিক নেই। ওঁর হুকুম না হলে কি আমি কাশী যেতে পারি!"

"হুকুমই বা না দেবেন কেন? তুমি রাগ কোরো না, মা। কিন্তু তুমি যে আলাদা বাড়ীতে থাক, এতেই কি ওঁর মান বেড়েছে না কি!"

মার চোখে জল এল! বললেন, "ছি! চুপ কর, বাবা!"

•

এর কয়েক মাস পরে মন্মথ বি, এ, পাস করলে। হনার্স

ভাল পেলে। বাপ ছেলেকে কেমেক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে চায়ে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। এই মন্মথর প্রথম পিতৃগৃহে পদার্পণ। পৌছান মাত্রই পাগড়ী বাঁধা তকমা-আঁটা বেয়ারা তাকে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। তিনি টেনিস কোর্টে বসেছিলেন। ছুটী ছোট তেপাইয়ের উপর ষোড়শোপচারে জল খাবার সাজান। সাহেব ছেলেকে আদর করে বসালেন। চা আনতে হুকুম করলেন। খাওয়া দাওয়া হলে পর কাজ কর্ম্মের কথা পাড়লেন, "পাস ত ভালয় ভালয় হলি, মন্মথ! এইবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্থির করে ফেলা যাক। তোর নিজের কি ইচ্ছা? কি করবি?"

মন্মথ নীরব। মাথা হেট করে রইল। বাপ তার উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করে আবার বললেন, "আমার ইচ্ছা ত তুই জানিস! আমি চাই যে তুই বিলেত গিয়ে সিবিলিয়ান হয়ে আসবি। কি বলিস? তাই ব্যবস্থা করি?"

ছেলে মাটির দিকে চেয়ে চেয়েই জবাব দিলে, "সে কি করে হবে? মাকে এখানে একলা ফেলে রেখে আমার বিলেত যাওয়া কি করে হতে পারে?"

সাহেব একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "তা কেন হতে পারবে না? সকল ছেলেকেই ত তাই করতে হয়! মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকলে ত আর চলবে না।"

মন্মথ এইবার পিতার মুখের দিকে সোজা তাকালে। তাকিয়ে বললে, "আমার অবস্থা আর অন্য ছেলের অবস্থা ত এক নয়,

বাবা! আপনি দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আমি দেশেই কিছু করে খাব।"

ডাক্তার সাহেব একটু চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, "তুমি হয়ত মনে করেছ যে তুমি বড়লোকের ছেলে, রোজগার না করলেও চলবে। কিন্তু সে তোমার মস্ত ভুল, মন্মথ। আমার বিষয় সম্পত্তির আমি কি ব্যবস্থা করব, তা এখনও স্থির করি নেই।" •

মন্মথ দাঁড়িয়ে উঠে বাপের পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, "আমি তা হলে এখন যাই! যদি ক্ষমা করেন ত একটা কথা বলি, আমি আপনার বিষয়ের প্রত্যাশী নই, বড়লোক হবারও আমার কোন সাধ নেই।"

বাপ সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন। তার পর নীরবে উঠে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। ছেলেও ধীরে ধীরে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে মন্মথ মাকে সব গল্পটা বললে। মা চুপ করে শুনলেন। মন্মথ একটু ব্যগ্র হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "জবাব দিচ্ছিস না কেন, মা? তোর জীবনটা ত গরীবের মতই কাটল। আমি টাকা নিয়ে করব কি?"

মা উত্তর দিলেন, "এইটে তোর মস্ত ভুল, মনু। আমি সাদাসিধে থাকতে ভালবাসি, তাই থাকি। নইলে আমার পয়সার অভাব কি? চাইলেই ত পেতে পারি।"

"সে তুমি বোঝগে যাও, মা! আমি এই জানি যে আমি বড়লোক হতে চাই না। একটা কিছু করে খাওয়া কি এতই কঠিন!"

"তাই যা হয় একটা স্থির করে ফেল না, বাবা। আমি বাবুকে বলব।"

"আচ্ছা, বেশ! আমি সোমবারে ল ক্লাসে নাম লিখিয়ে আসব।"

রবিবার দিন ডাক্তার সাহেব আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এলে গিন্নী তাকে জানালেন যে ছেলে আইন পড়তে রাজী হয়েছে। সাহেব স্ত্রীকে কিছু বললেন না। বাহিরের ঘরে গিয়ে মন্মথকে ডাকলেন। তাকে খুব কড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি নাকি আইন পড়বে বলেছ, মন্মথ?"

"আপনি অনুমতি দিলে তাই পড়ব, মনে করেছি।"

"না, আমি এখানে ল পড়ার অনুমতি দেব না। আমার হুকুম ত তোমায় খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছি, যে বিলেত গিয়ে I.C.S. দিতে হবে। সে হুকুম না মানতে চাও, ত যা খুশী করগে। আমি পড়ার খরচ দিতে পারব না। আর কোথাও জোগাড় কর গিয়ে।"

মন্মথ ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, "যে আজ্ঞে।"

সাহেবের রাগ ক্রমশঃ সপ্তমে চড়তে লাগল। তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন, "আমি তোমাকে সাত দিন সময় দিলাম। আসছে রবিবার আমাকে জানিয়ে আসবে যে তুমি আমার কথামত কাজ করতে রাজী আছ কি না। আমার চিরদিনের নীতি, যে কথা সেই কাজ। নড়-বড়েপনা, namby-pamby sentiment-কে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

ছেলে কোন উত্তর দিলে না। বাপ চলে গেলে পর মায়ের কাছে গিয়ে বললে, "সাত দিন মেয়াদ পেয়েছি, মা! তার পর কথা দিতে হবে, বিলেত গিয়ে হাকীম হব। নইলে তোমার ছেলেকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। এইবার তোমার হুকুমটাও জানিয়ে দাও। তোমাকে একলা ফেলে আমি বিলেত যাব না, এই কথা বাবাকে বলেছিলাম বলেই ত বাবার এত রাগ!"

মা ছেলের দাড়ীতে হাত দিয়ে বললেন, "তুই বিলেত যা না, মন্থু।"

"সে আমি কিছুতেই যাব না, মা। সাহেবীর নামে আমার ন্যাকার আসে। বড় মানুষ ত ঢের দেখলে, আবার ছেলেকেও বড় মানুষ করার সাধ!"

"মন্থু, তুই তোর মাকে এই সব কথা বলছিস! আমি কি সুখ পেয়েছি, কি কষ্ট পেয়েছি, তা নিয়ে তোর মাথা ঘামানর দরকার কি! বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দিন যাই নেই, আজও যাব না।"

মন্মথ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "চল না, মা, দুজনে কাশী চলে যাই।"

"তাতে ফল কি রে, পাগল ছেলে? এখানেও যাঁর খাচ্ছিস, সেখানেও তাঁরই খাবি। তাঁর কথা যদি না রাখবি, ত যেখানেই যাস, তাঁকে অমান্য করা হবে।"

মন্মথ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তা হলে মা, আমার

কোন গতি নেই! তোমাকে একলা ফেলে বাবার হুকুম মত আমাকে বিলেত যেতে হবে, এই তোমারও হুকুম?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"আচ্ছা, সাত দিন মেয়াদ ত তোমরা দিয়েছ, একটু ভেবে দেখি!" বলে মন্মথ গট গট করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আনমনা হয়ে এ রাস্তা ও রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে লালদীঘিতে গিয়ে পৌঁছল। আজ ছুটীর দিন, স্কোয়ারে লোকের ভিড় নেই। এক গাছতলায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগল, "এখন করা যায় কি? আমার দিকটা কেউ ভাবছে না। মাকে একলা কার কাছে রেখে যাব? দিদির বাড়ী গিয়ে থাকতেই বা মা রাজী হবে কেন?

আর, আমার মত লোকের সিবিলিয়ান হওয়ার ত কোন মানে নেই! সাহেবী, বড় মানুষী, বাবুগিরি, এ সব আমার ধাতে সহ্য হবে না। হয়ত, বিলেত থেকে ফিরে এলে আমারও মনের ভাব আর পাঁচ জনের মতনই হয়ে যাবে। নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকব দিবারাত্র। কে জানে!

নাঃ, বিলেত আমি যাব না। না গেলে বাবা কি আর সত্যি বাড়ী থেকে দূর করে দেবে! খুব রাগ করবে, আমার সঙ্গে কথা কবে না দু চার মাস। তার পর আবার সব ভুলে যাবে। আমার জন্য ত বাবার ঘুম হচ্ছে না! নিজের জিদ চেপেছে, তাই রাগা রাগি করছে। মাও আমার দিকটা দেখলে না। আচ্ছা বাবার

কথা আমি কেন শুনব ! যে বাবা—না, ও সব কথা মনেও আনব না। পাপের ভার বাড়িয়ে কাজ কি !"

আবার উঠল মন্মথ। খুব খানিকটে গঙ্গার ধারে চক্কর মারলে। বাড়ী ফেরবার পথে ধর্ম্মতলার মোড়ে তার সহপাঠী সুধীর মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা হল। মোটা খদ্দরের ধুতি পিরান পরা, খালী পা, মাথায় টুপী। সঙ্গে আরও চার পাঁচ জন ছোকরা ! তাদেরও ঐ বেশ। মন্মথর মাথায় হঠাৎ খেয়াল এল, দিনকয়েক ঐ ভেক ধরলে ত হয় ! তাহলে I.C.S.-এর পথ আপনা হতে বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার পরীক্ষা দিতেই দেবে না। একবার হপ্তা খানেক জেল ঘুরে আসতে পারলে ত আর কথাই নেই ! সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে ! কোথা গেছলে সব ?"

"এই ভাই, হাজরা পার্কে আমাদের একটা মিটিং ছিল। আজ বড় মারপিট করেছে হে ! দু তিনটে ছোকরা জখম হয়েছে। তোমাকে এ সব বলেই বা কি ফল ! এততেও ত মন ভেজে না ! দিব্যি বিলেতী কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ !"

মন্মথ মনে মনে হাসলে। "বাবা দোষ দেন দেশী কাপড় পরি বলে, এরা দোষ দেয় বিলেতী কাপড় পরি বলে। কারও মনই পেলাম না !" প্রকাশ্যে বললে, "সুধীর, তোমাদের বক্তৃতা শুনে শুনে আমার মত বদলে গেছে। আর সে দিন নেই। দেশ-মাতাকে চিনেছি। সাদা একটা টুপী থাকে ত দাও না, এখনই পরে নিতে রাজী আছি !"

একটী ছোকরা পকেট থেকে এক খদ্দরের টুপী বের করে

দিলে! মন্মথ খুব আড়ম্বর করে সেটা মাথায় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "গান্ধী মহারাজকী জয়।"

কাছে এক সার্জ্জেণ্ট দাঁড়িয়ে ছিল। সে মন্মথের ঘাড়ে হাত দিয়ে পালটা জবাব দিলে "চুপ রহো, ইউ ফুল! হট্‌ যাও।"

মন্মথর মনের অবস্থা ত ঠিক "অহিংস-অসহযোগীর" মত নয়! তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। কিছু একটা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুধীর তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে সরে গেল। কানে কানে বললে "ছি মন্মথ! গান্ধী টুপী পরে মার খেতে হয়, মারতে নেই!"

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে যেতে যেতে মন্মথ তার বন্ধুকে তাদের খাদি-আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা-পড়া করছিল। বললে, "আমারও ভাই তাঁত বোনা শিখতে ইচ্ছা হয়েছে। শিখলে ওতে কিছু রোজগারের উপায় হয় কি?"

"নিশ্চয়ই উপায় হয়। আজ কাল খদ্দরের চাহিদা এত বেড়ে গেছে, যে তাঁতশাল থেকেই আমাদের আশ্রমের সব খরচ পত্র চলে যাচ্ছে।"

"তোমরা সকলেই কি আশ্রমে থাক? আমি যদি থাকতে চাই, ত আমাকে থাকতে দেবে?"

"আমাদের এই কজনের মধ্যে কেবল আমি আশ্রমে থাকি। ওরা আপন আপন বাড়ীতে থাকে। তুমি যদি সত্যি থাকতে চাও, ত আমি আজই ব্যবস্থা করে দিতে পারি!"

"সে পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন চল ত, একবার চোখে দেখে আসি।"

খানিকটে এগিয়ে গিয়ে সুধীর মন্মথকে নিয়ে এক গলিতে ঢুকল। এ গলি, সে গলি, করে এক প্রকাণ্ড অন্ধকার তেতলা বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াল। কড়া নাড়তেই একটী ছোট ছেলে এসে দোর খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কে আপনারা?" সুধীর জবাব দিলে "আমি সুধীর। সঙ্গে একজন নূতন কর্ম্মীকে এনেছি। তাঁতশালে নিয়ে চল।"

একতলায় একটা মস্ত বড় হলে, দুটো তাঁত, পাঁচ সাতটা চরকা, দুটো মোজা বোনার কল রয়েছে। তিন চারটী ছোকরা বসে কথা কইছে। একটা ভাঙ্গা কেরাসিন বাতি জ্বলছে। এদের দেখে সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। সুধীর বললে, "আমার কলেজের বন্ধু, মন্মথ। ডাক্তার প্রমথ রায় সাহেবের ছেলে। তোমরা যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে এঁকে আশ্রমে ঢোকাতে পার, ত একটা কাজ হয়।"

সকলে গল্প করতে লাগল। মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, দোতলা তেতলায় কি হয়? ওটাও আপনাদের?"

একজন উত্তর দিলে, "না। ওখানে অন্য লোক থাকেন। তবে তাঁরাও দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন।"

হঠাৎ একটা ভীষণ শোর-গোল উঠল। সদর দরজায় কে যেন জোরে লাঠি দিয়ে মারছে! সুধীর সেই ছোট ছেলেটীকে বললে, "পুলিস না কি রে! ওঠ হরেন, দোর খুলে দে। আবার কিছুদিন শ্রীঘর বাস! হুররে! হুররে!"

মন্মথ বললে, "তাঁত-শালে পুলিস! কেন? যাকগে, আমার সাত দিন মেয়াদের ব্যবস্থা হয়ে গেল ফাঁক-তাল্লায়।"

সুধীর চুপি চুপি বললে, "সাত দিন নয় হে! এ সাত বছরের ধাক্কা। তোমাকে না নিয়ে এলেই হ'ত! দাও, সাদা টুপীটা ফেরৎ দাও।"

দেখতে দেখতে পাহারাওয়ালায় ঘর ভরে গেল। শাদাতে কালোতে প্রায় পঞ্চাশ জন হবে। তারা সমস্ত বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। ঘণ্টা দুই পর জনা কুড়িক ছোকরা, আর অনেক কাগজ পত্র, নিয়ে চলে গেল। মন্মথকে ধরতে সুধীর চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে ছাড়ুন, মশায়! ও আমাদের লোক নয়। বেড়াতে এসেছে মাত্র। দেখছেন না, সর্ব্বাঙ্গে বিলেতী কাপড়!"

একজন বাঙ্গালী দারোগা হেসে উত্তর দিলেন, "তোমাদের কত রকম ভেক আছে, আমি কি জানি না, বাপু? এখানে যাকে পাব, ধরে নিয়ে যেতে হবে, এই আমাদের হুকুম।"

থানায় সে রাত্রি মন্মথ এক আলাদা কুঠুরীতে বন্ধ রইল। সকাল বেলা তার ডাক পড়ল সাহেবের সামনে। একজন ইনস্পেক্টর সওয়াল করলেন, "তোমার নাম?" "মন্মথ নাথ রায়।" "বাপের নাম?" "ডাক্তার প্রমথ নাথ রায়।" সাহেব চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে? কেমেক ষ্ট্রীটের ডাক্তার পি, এন রে?" "হ্যাঁ, মশায়।" "তোমার সঙ্গে অন্য ছেলেদের কত দিনের পরিচয়?" "আমি শুধু সুধীর মুখুজ্জেকে চিনি। সে আমার সহপাঠী। তার সঙ্গে কাল তাঁত-শালে গেছলাম।" "কেন

গেছলে ?" "আশ্রমে থাকবার সুবিধা হবে কি না, দেখতে।" "আর কাউকে চেন না ?" "না, কাউকে না।"

"আশা করি তুমি সত্য কথা বলছ। ঐ বাড়ীর দোতলা তেতলা সম্বন্ধে কিছু খবর দিতে পার, ত তোমার ভাল হবে। তোমার বাবা আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু।"

মন্মথ মাথা হেট করে উত্তর দিলে "সাহেব, আমি কিছুই জানি না। কাল প্রথম গেছলাম। পনের মিনিট ছিলাম মাত্র, যখন তোমার পুলিস এল।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন হাজতে, ছেলের কুঠুরীতে। একখানা কাগজ তাকে দিয়ে বললেন, "চট করে সই করে দাও।"

মন্মথ পড়ে দেখলে কাগজে লেখা আছে, "আমাকে ক্ষমা করা হোক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এক সপ্তাহের মধ্যে বিলেত রওয়ানা হব।" বাপকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কোন কসুর করি নেই, মাপ চাইব কেন! তাঁত-শালে কাপড় বোনা শিখব বলে গেছলাম, তাতে কি দোষ হয়েছে? বিলেত যাব বলেই বা আমি কথা দেব কেন ?"

বাপ চোখ রক্তবর্ণ করে বললেন, "দেখ মন্মথ, ও সব মিথ্যা কথা, ইয়ারকী, রেখে দাও। ঐ বোমার আড্ডায় তুমি তাঁত শিখতে গেছলে! এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কেন তুমি I.C.S. এর উপর এত নারাজ। যাক, এখন ভাল চাও, ত কাগজ সই করে দাও। আমার খাতিরে পুলিস তোমাকে ছেড়ে দেবে।

নইলে দশটী বছর জেলে পচতে হবে। এই কলম নাও, সই কর।”

“না বাবা, আমি সই করব না।”

“করবে না! তবে উচ্ছন্ন যাও। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে আমি নিজের নাম খারাপ করতে পারি না। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, মনে রেখো।”

মন্মথ বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে “যে আজ্ঞে।”

মোকদ্দামা শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু সে ছাড়া পেয়ে গেল। সুধীর সরকারী সাক্ষী হয়েছিল। সে স্পষ্ট কবুল করলে, যে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্মথকে দলে আনতে পারে নেই। সেদিন যেই এনেছে তাঁত শাল দেখাতে, কি পুলিসের দল খানাতল্লাশী করতে এসে পড়ল। পুলিসের দারোগারা বললে, আমাদের কানে এই মন্মথ রায়ের নাম আগে কখন আসে নেই। একজন বড় সাহেব বললেন, যে মন্মথ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন বোঝবার ভুল হয়ে থাকবে, কেন না ডাক্তার রের ছেলে বিদ্রোহ করবে, এ অভাবনীয়!

হঠাৎ ছাড়া পেয়ে মন্মথ যখন বাহিরে এল তখন সে নিতান্তই একা, বন্ধুহীন! এক দল হুজুগে ছোকরা বাহিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন মন্মথকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, “গোয়েন্দার বেটা গোয়েন্দাকে দু ঘা কষে দিলে হত না, হে!” মন্মথ কানে আঙ্গুল দিয়ে “ছি, ছি!” বলতে বলতে পালাল। যে দিকে দু চোখ যায়, দৌড়ল। সন্ধ্যা পড়লে পর কম্পিত চরণে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের

বাড়ীর সামনে চোরের মতন এসে দাঁড়াল। দেখলে বাড়ী অন্ধকার। সামনে রোয়াকে এক অচেনা দরওয়ান বসে বসে গান করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলে যে মাজী পশ্চিম চলে গেছেন।

দু হাতে মাথা টিপে ধরে বেচারা বসে পড়ল রোয়াকের উপর। কত ক্ষণ ঐ অবস্থায় রইল সে জানে না। গানের শব্দে জেগে উঠল। চেয়ে দেখলে একদল গেরুয়া পরা লোক গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। তাদের নেতা, একজন সৌম্যমূর্ত্তি আধবয়সী সন্ন্যাসী, রাস্তায় আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি মন্মথকে বললেন, "আমরা অদ্বৈত আশ্রমের সেবক। বেহারে জলপ্লাবনের জন্য ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছি।"

মন্মথ বললে, "মহারাজ, আমি গৃহ-হীন নিঃসম্বল, আমার একটা টাকাও নেই যে আপনাকে দিই। তবে যদি আমাকে আপনাদের সঙ্গে বেহারে নিয়ে যান, ত প্রাণপণে কাজ করব। আমার সংসারে কোন পিছ-টানই নেই।"

সন্ন্যাসী বললেন, "বেশ ত, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। আমরা কালই রওয়ানা হব।"

যেদিন মন্মথ ধরা পড়ল, বাড়ী ফিরল না, তার মা সারারাত ঠাকুর ঘরে কাটালেন। সকালবেলা স্বামীকে খবর পাঠালেন।

তিনি দশটা রাত্রে এলেন। এসে কঠোর স্বরে বললেন, "তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। তার আশা ছেড়ে দাও।"

গিন্নী কেঁদে বললেন, "পুলিসে ধরেছে কি গো! দুধের বাছা, তাকে পুলিসে ধরবে কেন? তুমি যাও, ছাড়িয়ে নিয়ে এস।"

ডাক্তার বললেন, "গিন্নী, শান্ত হও। আমি এই তার কাছ থেকে আসছি। সে যদি একটা সই দিত, তাহলে এখনই তাকে বের করে নিয়ে আসতাম। কিন্তু ছোঁড়াটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে, কিছুতেই কথা শুনলে না। সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করবে! তা সরকারই বা ছেড়ে কথা কইবে কেন?"

"তুমি কি বলছ এ সব? আমার ছেলে কক্ষণ একাজ করে নেই। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর বারই হয় না। না, তুমি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এস। মোকদ্দমা ওঠে ত ভাল উকীল ব্যারিষ্টার দাও।"

"না গিন্নী, আমার দ্বারা ও সব হবে না। যে ছেলে আমার অবাধ্য হয়েছে আমি তার মুখ দেখতে চাই না। গুণ্ডা ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে আমার নিজের নাম আমি খারাপ করতে পারব না।"

গিন্নী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "বেশ, তাই হোক। তুমি তার কিছু করতে যেও না। কিন্তু তাহলে আমাকেও আজ ছুটী দাও। কখন তোমার কথার অবাধ্য হই নেই। আজ আমার এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা কোরো। কাল থেকে আমার মুখ

দেখতে হবে না।" বলে গলবস্ত্র হয়ে তিনি স্বামীর দু পায়ের ধূলো নিলেন।

ডাক্তার সাহেব আশ্চর্য্য হলেন। তিনি সাহেবী করেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তাঁর নেটীব স্ত্রী মেমেদের মতন স্বাধীন চিন্তা করবে! এ যে অসহ্য! চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি! তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুমি ছেলের তরফ নিয়ে আমার সঙ্গে টক্কর দিতে আস! বেশ, যেও তুমি কোথায় যাবে।" এই কথা বলে সাহেব গট গট করে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে বসলেন। গিন্নী আবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর দিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা এক ঠিকে গাড়ী এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। একটী মহিলা নেমে "মা, মা!" করতে করতে দোতলায় উঠে গেলেন। গিন্নী বেরিয়ে এসে মেয়েটীকে বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, "এসেছিস, মা নীলা! চল, এখনই তোর সঙ্গে ইষ্টিশেনে যাই। রাত্তিরে একটা বাঁকীপুরের গাড়ী আছে।"

মেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, মা?"

"মন্নুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।, বাবু তার জন্য কিছু করবেন না। বললেন, অমন ছেলের জেলে যাওয়াই উচিত। আমিও তাই তাঁর পা ছুঁইয়ে বিদায় নিয়েছি। দিন কয়েক মাকে জায়গা দিবি না? বেশী দিন ত বাঁচব না মা, মন্নুকে ছেড়ে!"

মেয়ে মাকে ধরে খাটে বসিয়ে বললে, "মা, তুমি ত হট করে একটা কিছু করবার মানুষ নও। নাই বা আজ গেলে!

তোমার জামাইও এসেছেন। আমরা তোমার কাছে দুচারদিন থাকি। খোকার জন্য যা তদ্বির দরকার, উনি করুন। তার পর ভেবে চিন্তে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

"না, মা। আমাকে আজই যেতে হবে। এ বাড়ী ত আমার নয়, যে আমার মেয়ে জামাইকে রাখব! আমার ছেলের অবধি যেখানে স্থান নেই, সেখানে আমি কি করে থাকব! জামাইকে নামতে বারণ কর, চল হাওড়া যাই। মন্নুর জন্য ভাবিস না। ৺গোপীনাথ তার ভার নিয়েছেন।"

গিন্নী মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে সেই রাত্রেই বাঁকীপুর চলে গেলেন। সাহেবের সরকার এসে পরদিন ঘরদোরে তালা লাগিয়ে বাড়ী দরওয়ানের জিম্মা করে দিয়ে গেল।

আজ দেড় মাস হল মন্মথ বেহারে কাজ করছে। তাদের আশ্রম গঙ্গাতীরে এক আমবাগানে। ছোট ছোট অনেকগুলি পাতার কুঁড়ে ঘর তোলা হয়েছে। কর্ম্মী সবসুদ্ধ কুড়ি জন। তাদের কর্ত্তা স্বামী চিদানন্দ। আশ্রমের নানা বিভাগ। অন্ন-সত্র, কাপড় ও কাঁচা-সিধা বিতরণের ভাণ্ডার, একটী ছোট হাঁসপাতাল। মন্মথ সব বিভাগেই কাজ করে। তার পরিশ্রম করার অসাধারণ ক্ষমতা, অদম্য উৎসাহ ও সুন্দর স্বভাব দেখে স্বামীজী মোহিত হয়েছেন। আদর করে তাকে সদানন্দ বলে ডাকেন।

এখানে এসে মন্মথ মনে এক আশ্চর্য্য শান্তি পেয়েছে। একটু বড় হয়ে অবধি সে শান্তি কাকে বলে জানত না। নরম মন তার,

বাপের ব্যবহারে একেবারে তেতো হয়ে গেছল। তার পর মাও তাকে ত্যাগ করলেন! আপনার বলতে আর তার কেউ রইল না। সেই গভীর নৈরাশ্যের মাঝ থেকে চিদানন্দজী তাকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। কাজ করতে আরম্ভ করে সে বুঝলে যে, নাই বা বাপ মা তাকে চাইলেন, সে ত সত্যি একা নয়! বিশ্বের যত দীন, দরিদ্র, দুঃখী, আতুর, তারা সবাই যে তার মুখ চেয়ে রয়েছে। সমস্ত দেহ প্রাণ মন ঢেলে দিলে সে সেবাশ্রমের কাজে।

চিদানন্দ সিদ্ধ পুরুষ। মন্মথর মনের প্রত্যেকটী ভাব বুঝতে পারতেন। একদিন তাঁর সহকারী বোধানন্দকে বলছিলেন, "কি আশ্চর্য্য শক্তি এই বালকের দেহে ও মনে! সংসারের মাঝে থেকে, এই অল্পবয়সে কোথা থেকে পেলে এত শক্তি! ওকে দীক্ষা দেবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।"

বোধানন্দ বললেন, "মহারাজ, ওর সঙ্গে আমার একদিন কথা হয়েছিল। মার অনুমতি না পেলে ও সন্ন্যাসের দীক্ষা নেবে না। আমাকে বললে, পথ ত ধরিয়ে দিয়েছেন, আবার কিসের দীক্ষা!"

চিদানন্দ উত্তর দিলেন, "নিষ্কাম কর্ম্মের মর্ম্ম এই বালক ভাল করেই জানে। তবু, আমার যা কিছু আছে, তা ওকে না দিলে আমার শান্তি নেই।"

বোধানন্দ বললেন, "সদানন্দ ধন্য! সে ভাগ্যবান পুরুষ।"

দিন কয়েক পরে স্বামী বোধানন্দ পাটনা গেলেন রসদ সং-ক্রান্ত কাজে। ফিরে এসে মন্মথকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,

"ভাই সদানন্দ, তুমি বাঁকীপুরের অনাথ চৌধুরী মহাশয়কে চেন ?"

"চিনি বই কি ! তিনি আমার ভগ্নীপতি। কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?"

"তাঁর সঙ্গে এবার পরিচয় হল। আমার কাছে তোমার কথা শুনে বললেন, এ'নিশ্চয়ই আমাদের মন্মথ ! একবার তাকে যদি পাঠিয়ে দেন এখানে ! বলবেন, মা আমাদের কাছে রয়েছেন, তাঁর শরীর বড় খারাপ।"

মন্মথ সেই দিনই বাঁকীপুর গেল। মার সঙ্গে দু মিনিটের জন্ত সাক্ষাৎ হল। তিনি ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, "বেঁচে থাক, বাবা। ঠিক কাজই নিয়েছিস। তোর মতন ছেলের উপযুক্ত কাজ ! গুরুদেবকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাস।"

পরদিন নীলা ও অনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্মথ ক্যাম্পে ফিরে এল। স্বামীজীর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, "গুরুদেব, মার অনুমতি নিয়ে এসেছি। দয়া করে দীক্ষা দেন।"

নিয়তি

(নাটিকাকারে গল্প)

প্রথম অঙ্ক

(১৯৩০)

(টালিগঞ্জ—ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সুরেন চক্রবর্ত্তীর বাড়ী—ইংরেজী কায়দায় সজ্জিত বৈঠকখানা ঘর—উজ্জ্বল বিজলীর আলো—শীতকাল, বেলা সাড়ে পাঁচটা—ইলা চক্রবর্ত্তী সোফায় আসীন, পাসে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' খোলা পড়ে রয়েছে।)

ইলা—(গুনগুন করে) 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিয়ো ; আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি, তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো'—(হঠাৎ উঠে দুবার দরজা পর্য্যন্ত পায়চারি করে ধপ করে সোফায় বসে গান ধরলেন) 'তুমি চিরদিন মধুপবনে, চিরবিকশিত বন ভবনে, যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া'—(আবার উঠে দাঁড়িয়ে) কত দেরী করছেন আজ ! এমন রাগ করব, কিছুতেই কথা কইব না। (বাইরে মোটরের আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠে) নাঃ, রাগ করা হল না ! (চেঁচিয়ে) ওগো! আমি এখানে, বসবার ঘরে।

(সুরেনের প্রবেশ)

ইলা—(দৌড়ে গিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে) এলে ! আসবার ফুরসৎ হল ! মনে করেছিলাম, আজ এমন মান করব, একটীও কথা কইব না, জব্দ হবে তুমি। কিন্তু পারি না যে ছাই !

সুরেন—(ইলাকে টেনে সোফায় পাসে বসিয়ে, তাকে বুকে চেপে ধরে বার বার মাথায় চুমো খেতে খেতে) কর না রাগ ! কেমন বাহাদুর তুমি, দেখি !

ইলা—মাথাটাকে অমনি করে চিবিয়ে খেলে কি আর মানুষ রাগ মান করতে পারে ! এইবার ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটী ! তোমার চা আনতে বলি। তুমি হাত মুখ ধুইয়ে এস।

সুরেন—আমি যে জিনিস খাচ্ছি তা অতি উপাদেয়, চায়ের চেয়ে অনেক মিষ্টি গো, অনেক মিষ্টি !

ইলা—না, না, ছিঃ। আমাকে ছেড়ে দাও। এখনই বুড়ো বেয়ারা এসে পড়বে। ওকে যে আমার কি লজ্জা করে, কি বলব !

সুরেন—ও বুড়ো কি আর চাকর ! আজ পঁচিশ বছর আমাদের ঘরে রয়েছে।, আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। তোমাকে এরই মধ্যে যে কি ভালবাসে, কি বলব ! তোমাকে মেমসাহেব বলে ডেকে ওর মন ওঠে না। সেদিন আমাকে বলছিল, হুজুরের হুকুম হয় ত মেমসাহেবকে আমি বৌমা বলে ডাকব।

ইলা—বেশ ত ! আমাকে ত বৌমা বলে ডাকবার কেউ নেই !

বেয়ারা যদি বৌমা বলে, তবু আমার মনে হবে শ্বশুরঘর করছি।

সুরেন—My dear girl! আজকালকার মেয়েরা কি শ্বশুর-ঘর করে! তারা বাপের বাড়ী ছেড়ে, একেবারে বড় মেমসাহেব হয়ে নিজের ঘরে গদীয়ান হয়ে বসে।

ইলা—আমি ত আর আজকালকার মেয়ে নই গো! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে ভূত ছিলাম, তোমার পাল্লায় পড়ে শহরে এসে এই ত মাস দুই সবে বাস করছি।

সুরেন—সে কথা বললে কি চলে, Darling! একালের ঝড়ো হাওয়া তোমাদের পাড়াগাঁয়েও যে এখন জোরে বইছে।

ইলা—আচ্ছা, তোমার ফিলজফি তুলে রাখ এখন। ওঠ, মুখ ধুইয়ে এস। আমি চায়ের জোগাড় করি গে।

সুরেন—আমি উঠবও না, মুখও ধোব না, তুমিও উঠতে পাবে না। (চেঁচিয়ে) বেয়ারা! আমাদের চা নিয়ে আয় এখানে, জলদী!

(নেপথ্যে—এখনই আনছি, বাবা!)

সুরেন—ব্যাটা জ্বালাতন করলে! আজও বাবা বলা ছাড়লে না।

ইলা—বেশ করেছে বলেছে! আমি যদি ওর বৌমা হই, ত তুমিও নিশ্চয়ই ওর বাবা। ওগো দেখ, একটা কথা বলি, হেসো না। আমাকে একটু একটু পড়া দেখিয়ে দাও, ত আমি আসছে বার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দিয়ে নিই।

সুরেন—সে ত আর একদিনও বলেছিলে! কিন্তু কি হয়, জান? তোমার কাছে যতক্ষণ বসি, ততক্ষণ এত ভীষণ রকম ব্যস্ত থাকি, যে পড়াশুনোর মত বাজে কথা মনেই আসে না।

ইলা—(মুখে আঁচল ঢেকে) আমারই কি আসে ছাই! তবে, তুমি হচ্ছ একটা মস্ত বড়সাহেব। তোমার ম্যাম হতে গেলে পেটে একটু আধটু বিদ্যা চাই ত! (বেচারা চায়ের ট্রে এনে রেখে সেলাম করে বেরিয়ে গেলে) এই সিঙ্গাড়া কচুরীগুলো বেশ করে খাও। আমি নিজে হাত পা পুড়িয়ে ভেজেছি।

সুরেন—তুমি ভেজেছ, প্রিয়ে! তুমি রান্নাঘরে যাও? গৃহকাজ! জান না, "সংসারের কেহ নহ অন্তরের তুমি"?

ইলা—(স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে) "রাজন্! তোমারই আমি অন্তরে বাহিরে, অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।" শালগ্রাম শিলা রেখে বিয়ে করেছিলে যে! শুধু মেমপুতুলটি সেজে বসে থাকলে চলবে কেন! আমার গৃহকাজ কি আবার আর কেউ এসে করবে না কি! কিন্তু সত্যি কথাটা কবুল করি, শোন তবে! আমি ভাল করে খাবার টাবার করতে জানি না। আজ বেয়ারা বসে বসে সব দেখিয়ে দিয়েছে।

সুরেন—ও ব্যাটার সব বাড়াবাড়ি। দুদিন তর সইল না! কিন্তু জান, খাবার ও সত্যি করে ভাল! আমার মা ওকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন। তুমি নিজে একটা আধটা খাও, কেবল আমাকে গেলালে চলবে কেন!

ইলা—(সিঙ্গাড়া হাতে করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, জানলার কাছে গিয়ে) ওগো, দেখ দেখ, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে ! তুমি খেয়ে নাও, তার পর দুজনে Lawn-এ বেড়ান যাবে।

সুরেন—বেশ ত ! তুমি একটা গরম কিছু পরে নিও। আজ Lawn-এ চাঁদের আলোতে ডিনার খেলেও ত হয়, কি বল ?

ইলা—আমি খুব রাজী। আমার জ্যোৎস্নাতে বসতে যে কি ভাল লাগে ! ছেলে বেলা থেকেই লাগে। আর এখন ত—(মৃদু দীর্ঘশ্বাস)

সুরেন—(ইলার চিবুক ধরে) এখন ত, কি ?

ইলা—(কানে কানে) এই,—তোমার পাশে বসে। কিন্তু খবরদার, বেহায়াপনা কিছু করবে না। ওই পথ দিয়ে চাকরগুলো কেবলই যাওয়া আসা করে।

সুরেন—কুছ পরোয়া নেই। আমি বেয়ারাকে ডেকে ওদের মানা করে দিচ্ছি। বলে দিচ্ছি, তোদের মনিব এখন ফুলের মাঝে বসে প্রেম করবেন, তোরা তফাতে থাকবি, বুঝলি ব্যাটারা !

ইলা—(সুরেনের মুখ চেপে ধরে) না, না, ছিঃ ছিঃ ! কি যে কর ! কিন্তু Lawn-এ খাবার দেওয়ার হুকুমটা তুমি করে দিও। আমার ও বুড়োকে বলতে বড় লজ্জা করবে। হ্যাঁ গা, তোমার বন্ধু কবে আসছেন ? (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তিনি এলে ত এ সব বন্ধ ! সেই রাত্রি বেলা ছাড়া তোমাকে আর একলা পাব না।

সুরেন—কে, বীরেন? তাকে হপ্তাখানেক বাদে আসতে লিখেছি। সে এলে আমাদের কিছুই বন্ধ হবে না, প্রিয়তমে! ভেবে দেখ দেখি, বান্ধব-বান্ধবীর প্রেমের খেলা তার কত মিষ্টি লাগবে!

ইলা—কি যে যা-তা বল তুমি, তার ঠিক নেই। আচ্ছা, কত দিন থাকবেন তিনি?

সুরেন—কেন, বল দেখি?

ইলা—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। গেল মাসে ত এক হপ্তা ছিলেন।

সুরেন—এবার সে যে আমাদের এখানে বাস করতে আসছে, ইলা! তাদের ত কলকাতায় বাড়ী নেই। তার বাপ মা থাকেন চাটগাঁয়ে। এখানে থেকে সে চাকরীর চেষ্টা করবে।

ইলা—তিনি কিছু কাজ কর্ম্ম করেন না, বুঝি?

সুরেন—না, আজও কাজ কিছু পায় নেই। জান, আমরা এক সঙ্গে Leeds-এ পড়তাম। দুজনে বড় ভাব হয়েছিল। আমি নসীবের জোরে পাস হয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বীরেন বেচারা দু-দুবার চেষ্টা করেও পাস হতে পারলে না। তার বাপ রাগ করে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ফিরে এসে অবধি বেচারা যে কত নির্য্যাতন সহ্য করছে, কি বলব! বাড়ীতে সবাই যেন তাকে একঘরে করে রেখেছে। কেউ তার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। যেমন করে হোক, ওর একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে পারলে আমি বাঁচি।

ইলা—কিন্তু উনি ত পাস করেন নেই। ওঁকে ভাল চাকরী দেবে কি কেউ?

সুরেন—তা ত জানি, গো! আমার নিজের আফিসটা আর একটু বাড়াতে পারলে, ওকে আর কোথাও চাকরী করতে যেতে হবে না। আমিও একজন সহযোগী পেলে কাজ কর্ম্ম অনেক বেশী নিতে পারব। বেচারার মনটা বড় নরম। বাড়ীর লোকের হেনস্তায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তুমি ওকে একটু যত্ন আত্তি কোরো, ইলা!

ইলা—এখানে যত্নের ত্রুটী হবে না গো, তোমার ভাবনা নেই। কিন্তু—

সুরেন—কিন্তু কি?

ইলা—বলব তোমাকে? তুমি ঠাট্টা তামাশা করবে। এই, কি জান, উনি এখানে যখন ছিলেন, আমার দিকে কেমন কেমন যেন তাকাতেন আমার বড় লজ্জা করত।

সুরেন—(যেন উদ্বিগ্ন হয়ে) তাই না কি! Really! কি রকম চাহনি, বল ত, Darling!

ইলা—কি রকম আবার! আমি অন্য দিকে মুখ ফেরালে আমার দিকে কেমন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন।

সুরেন—Oh! I see—তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ল না কি ছোকরা! তা কি করবে বল, নিয়তি ত আর এড়ান যায় না! আর, (চিবুক ধরে) সত্য বলতে কি, প্রিয়তমে, তোমার এই চাঁদমুখ দেখে মাথা ঠিক রাখা ত সহজ নয়!

বেচারা বীরেন আদর ভালবাসার কাঙ্গাল, না হয় একটু ভাল বাসলেই তাকে!

ইলা—(কৃত্রিম রোষ ভরে) ছাড় বলছি। কি যে বল, কি যে কর, তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। বেয়ারাটা ট্রে নিতে এসেছিল, তোমার রঙ্গ দেখে লজ্জায় পালাল।

সুরেন—আচ্ছা, তা'হলে চল, আমরাও পালাই। বাগানে Sweet pea-র বেড়ার পেছনে অন্ধকারে যে বেঞ্চটা আছে, সেইখানে বসিগে। (ইলার গলা জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে প্রস্থান)

(যবনিকা)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১৯৩১)

(সুরেনের সেই বৈঠকখানা ঘর—সেই শীতকাল, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা—ঘরে আলো নেই—বেয়ারা চিন্তিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে)

বেয়ারা—(স্বগতঃ) ব্যাপারটা কি, তা ঠিক এখনও বুঝতে পারছি না। বায়স্কোপে যাবে বলে ট্যাক্সী ডাকিয়েছে। অথচ ছোকরা ওবেলা নিজের ও বৌমার—না, না, ছিঃ—মেমসাহেবের বাকস পেটারা নিয়ে কোথায় রেখে এল। কি করি? যেতে দেব? হ্যাঁ যাক্‌গে, চুলোয় যাক্! ওকে

ধরে রাখলে আমার বাবার আর কি সুখ বাড়বে? যাক্ গে দূর হয়ে।

(বীরেন ও ইলা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল—বাইরে বেরোবার পোষাক পরা—গায়ে ওভার কোট)

ইলা—বেয়ারা, ট্যাক্সী এসেছে?

বেয়ারা—(ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে) দেখে আসছি, হুজুর।

(প্রস্থান)

ইলা—বীরেন, ওঁকে না বলে চলে যাওয়াটা আমার ভাল লাগছে না কিন্তু।

বীরেন—(একটু হেসে) কি বলবে? টিকিটের টাকাটাও চেয়ে নেবে না কি? না ইলা, চুপচাপ পালিয়ে যাওয়াই ভাল। গহনা-পত্র সব নিয়েছ ত?

ইলা—(ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ। (বেয়ারার প্রবেশ)

বেয়ারা—ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে রয়েছে, হুজুর।

ইলা—আচ্ছা! বেয়ারা—সাহেব এলে বোলো, আমরা—বায়স্কোপে যাচ্ছি।

বেয়ারা—(সেলাম করে) যে আজ্ঞে, হুজুর। (বীরেন ও ইলার প্রস্থান—ট্যাক্সী বেরিয়ে গেল)

বেয়ারা—(জানালা দিয়ে দেখে) তোমরা কোথায় যাচ্ছ, তা আমি জানি না? কি নেমকহারামী! ওই হতভাগীকে আমি আবার বৌমা বলে ডেকেছিলাম। বাবা ত আমার সদাশিব, সারা জগৎকে মনে করে নিজের মতন! বীরেন,

বীরেন, করে সারা! কত টাকাই না খরচ করছে ওই লক্ষ্মীছাড়ার পেছনে! হা ভগবান, তুমি কেমন করে, কোন প্রাণে, অমন মানুষকে এই রকম দাগা দাও?

(আবার মোটরের আওয়াজ—সুরেনের প্রবেশ—বেয়ারা সেলাম করলে)

সুরেন—বেয়ারা, তোদের বৌমা কোথা রে?

বেয়ারা—হুজুর, মেমসাহেব বায়স্কোপ দেখতে গেছেন ওই বীরেন বাবুর সঙ্গে। আপনার চা নিয়ে আসি, হুজুর?

সুরেন—(অন্যমনস্কভাবে) হ্যাঁ, তা নিয়ে আয়।

(বেয়ারার প্রস্থান)

সুরেন—(সোফায় বসে) আচ্ছা মূর্খ আমি! এতে বিচলিত হবার কি আছে? বীরেনের সঙ্গে ইলা বায়স্কোপে গেছে। প্রায়ই ত যায়! তাতে হয়েছে কি? বেশ করেছে! বীরেনের চেহারা কার্ত্তিকের মতন, কথাবার্ত্তা কয় সুন্দর, ইলার তাকে ভাল লাগা স্বাভাবিক। আমি একটা চোয়াড় মিস্ত্রী বই ত নয়! Hallo! আমি jealous হচ্ছি না কি? আশ্চর্য্য নয়। মানুষ ত! যতই কেন আধুনিকতার মুখোস পরি—(বাইরে মোটর থামার শব্দ—ইলার তাড়াতাড়ি প্রবেশ—উঠে দাঁড়িয়ে) কে, ইলা! কই, তোমরা বায়স্কোপে গেলে না?

ইলা—(মাথা হেঁট করে) না, বায়স্কোপে যাচ্ছি না। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।

সুরেন—আমাকে একটা কথা বলতে এসেছ, ইলা? বীরেন কোথায়?

ইলা—বাইরে গাড়ীতে বসে রয়েছেন।

(চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারার প্রবেশ—ট্রে রেখে ইলার মুখের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হেনে প্রস্থান)

সুরেন—বীরেনকে ডাক না, এক পেয়ালা চা খেয়ে যাক।

ইলা—না, তিনি আসতে চান না। আমি যা বলতে এসেছি, বলে চলে যাই। দেখ আমাদের বায়স্কোপে যাবার কোন মতলব ছিল না। আজকের মেলে আমরা দিল্লী চলে যাচ্ছি।

সুরেন—আজকের মেলে—তোমরা—দিল্লী—চলে যাচ্ছ! বেশ কথা। কতদিনে ফিরবে?

ইলা—তা ত কিছু ঠিক নেই!

সুরেন—তোমাদের ফেরবার কিছু ঠিক নেই? ভাল! বেয়ারাকে ডেকে বলি তোমার কাপড় চোপড় বন্ধ করে দিতে?

ইলা—আমাদের লাগেজ ওবেলা হাওড়ায় রেখে আসা হয়েছে। আমি যাই তা হলে?

সুরেন—আচ্ছা, এস।

(ইলার প্রস্থান—সুরেন জানালা পর্য্যন্ত গিয়ে, চেঁচিয়ে) Good bye, বীরেন!

(ফিরে এসে চা ঢালতে বসল, কিন্তু হাত এত কাঁপছে, যে চা চারিদিকে পড়ে যেতে লাগল। ডাকলে,) বেয়ারা! (বেয়ারার প্রবেশ) ওরে, আমাকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দে ত!

(মোটর বেরিয়ে গেল—সুরেন পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে)
বেয়ারা ! আমি—

বেয়ারা—কি বলছেন, বাবা ?

সুরেন—দেখ্ বেয়ারা, আমি বোম্বাই যাচ্ছি। কালই। তুই সঙ্গে যাবি। সেখানে চাকরী নিয়েছি। এখানকার চাকর-বাকরদের সব ছুটী দিয়ে যেতে হবে। শুধু মালী এক জন থাকবে।

বেয়ারা—যে আজ্ঞে, হুজুর। মেমসাহেব কি—

সুরেন—(তাড়াতাড়ি) হঁ্যা, তিনি আজ রাত্রের মেলে, তাঁর মায়ের কাছে কানপুর যাচ্ছেন।

বেয়ারা—যে আজ্ঞে, হুজুর। (সেলাম করে করুণ দৃষ্টিতে মনিবের পানে তাকাতে তাকাতে বেয়ারার প্রস্থান)।

সুরেন—(স্বগতঃ) Modernismএর অভিনয় মন্দ করলাম না ত ! কিন্তু ভেতরটা যে সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আধুনিক শাস্ত্রমতে বিশ্বাসঘাতকতা কি একটা দোষ, না দোষ নয় ? বেয়ারা ব্যাটা সব বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে যে রকম করে তাকালে ! আচ্ছা, ওর code অনুসারে ত ইলা পাপীয়সী, অসতী। আমার codeও কি তাই ? হতে পারে না ! একদম না ! তাহলে এত লেখাপড়া শিখেছি কিসের জন্য ? যাই হোক, Bombayতে টেলিগ্রামখানা করে দিই। ভাগ্যিস্ দরখাস্ত করেছিলাম ! (টেলিগ্রাম লিখে) I accept your offer, leaving tomorrow.

(যবনিকা)

তৃতীয় অঙ্ক

(১৯৩২)

(সেই টালিগঞ্জের বৈঠকখানা ঘর—সেই শীতকালের সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা—আধ-অন্ধকার—বৃদ্ধ বেয়ারা ও এক মেমসাহেব-বেশী নার্সের প্রবেশ)।

নার্স—বেয়ারা, সাহেবকে এতেলা দাও যে ডাক্তার সাহেব একজন নার্স পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বেয়ারা—(চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) আপনি বসুন, আমি সাহেবকে জানাচ্ছি। (আলো জেলে) কে?—আপনি?—তুমি! মেমসাহেব!—এখানে কি করতে এসেছ আবার? বেরোও এক্ষণই এ বাড়ী থেকে। তুমি কি আমার বাবাকে মেরে ফেলতে এসেছ? (দাঁত কিড়িমিড়ি করে) শয়তানী!

নার্স—(জোড় হাত করে) দোহাই তোমার, বেয়ারা, দোহাই তোমার, চেঁচিও না। সাহেব শুনতে পাবেন। তোমার পায়ে পড়ি, সাহেবকে কিছু বোলো না। একবার তাঁকে দেখতে দাও। তার পর, বল ত তখনই চলে যাব।

বেয়ারা—বহুৎ আচ্ছা, মেমসাহেব। এক বার মাত্র আমার বাবাকে তুমি দেখতে পাবে। তার পর চলে যেতে হবে। কিন্তু বল, কবুল হও, যে সাহেবকে তুমি জানতে দেবে না, তুমি কে।

নার্স—হ্যাঁ বেয়ারা, আমি জানতে দেব না। আমি কবুল হলাম। একটী কথা আমাকে বল, সাহেব কি মোটে দেখতে পান না?

বেয়ারা—না, পান না। আচ্ছা, তুমি বস, মেমসাহেব। আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। কিন্তু যা বলে দিয়েছি, ভুলো না। খবরদার! (প্রস্থান)

নার্স—(স্বগতঃ) আমি ত থাকতে আসি নেই! চলে যাব। নিশ্চয় চলে যাব। একবার শুধু তাঁকে চোখে দেখব, একবার পায়ে ধরে নীরবে ক্ষমা চাইব। তার পর, বহু দূরে চলে যাব। (বেয়ারার হাত ধরে টলতে টলতে সুরেনের প্রবেশ। চোখে কালো চশমা)

নার্স—গুড ইভ্‌নিং, স্যার।

সুরেন—(বেয়ারার সাহায্যে ধীরে ধীরে বসে) গুড্ ইভ্‌নিং। তোমার নাম কি, নার্স?

নার্স—(ইংরেজীতে) আমার নাম এলেন্, স্যার, মিসেস্ এলেন ব্রাউন।

সুরেন—বাঙ্গলা বলতে পার, নার্স এলেন?

নার্স—(আস্তে আস্তে) আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি একটু একটু।

সুরেন—তোমার স্বামী বেঁচে আছেন?

নার্স—(চোখ মুছতে মুছতে, কাঁপা গলায়) আমার—আমার স্বামী—আজ্ঞে, হ্যাঁ—ভগবানের কৃপায় তিনি বেঁচে আছেন।

সুরেন—(আনমনা) তোমার গলা কেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে?

কি মিঠে আওয়াজ! যেন দূরাগত বাঁশীর মতন—কি নাম তোমার বললে, নার্স?

নার্স—এলেন ব্রাউন, স্যার!

সুরেন—(উত্তেজিত হয়ে, উঠে বসে) না, না, তোমার নাম এলেন নয়। সত্যি কথা বল। কি নাম তোমার? তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে—

(বেয়ারা এগিয়ে এসে ইশারা করলে,—খবরদার!)

নার্স—I am an Anglo-Indian, Sir!

সুরেন—(দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীণ স্বরে) আমাকে একটু ধর ত, নার্স। সোফাতে শুইয়ে দাও।

(নার্স হাত ধরতেই সুরেন চেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আবার চেয়ারে বসে পড়ল)

সুরেন—আমি কি স্বপন দেখছি? কার হাত? কার গলা?

(বলতে বলতে সর্ব্বশরীর কেঁপে কেমন এলিয়ে পড়ল)

নার্স—(হাঁটু গেড়ে বসে দু পা জড়িয়ে ধরে) ওগো! আমি—

বেয়ারা—(তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নার্সের হাত ধরে টেনে তুলে, কানে কানে) আর না, চল মেমসাহেব, বাহিরে চল, এখনই। আর তোমাকে এখানে থাকতে দিতে পারি না।

(নার্স দুহাতে মুখ ঢেকে বেয়ারার সঙ্গে বেরিয়ে গেল)

সুরেন—(আস্তে আস্তে একটু নড়ে) কে? কে এসেছিল? (চেঁচিয়ে) বেয়ারা! বেয়ারা!

(বেয়ারার প্রবেশ)

বেয়'রা—হুজুর ডাকছিলেন ?

সুরেন—আমার কাছে কে এসেছিল, বেয়ারা ?

বেয়ারা—কোথায়, হুজুর ! কেউ ত আসে নেই ! আপনি কখন বিছানা থেকে উঠে এলেন ? আসুন, আবার শুইয়ে দিই। ডাক্তার সাহেব যে উঠতে একদম বারণ করে গেছেন, হুজুর !

সুরেন—বেশ, চল বেয়ারা। আমাকে নিয়ে চল শোবার ঘরে। কিন্তু—নার্স কে একজন এসেছিল, না ?

বেয়ারা—নার্স ? না হুজুর, নার্স ত কেউ আসে নেই। এখানে নার্সের কি দরকার ? আমি ত সর্ব্বদাই আপনার কাছে হাজির রয়েছি, হুজুর। (সুরেনকে অতি সন্তর্পণে জড়িয়ে ধরে বেয়ারা ধীরে ধীরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল)।

(যবনিকা)